প্রকাশক :
বি. সরকার
বি. সরকার এণ্ড কোম্পানী
১৫, কলেজ স্কোয়্যার
কলিকাতা-১২

সন ১৩৫৬ সাল

মুদ্রক :
শ্রীসত্যচরণ ঘোষ
মিহির প্রেস
৯এ, সরকার বাই লেন
কলিকাতা-৭

পরিচায়িকা

বি. সরকার ও অধ্যাপক এস. আর. দাস সম্পাদিত "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস" (প্রশ্নোত্তরে) গ্রন্থখানি নানা দিক থেকে বেশ উল্লেখযোগ্য হয়েছে। সংক্ষিপ্ত পরিবেশের মধ্যে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির এমন তথ্যবহুল আলোচনা আর চোখে পড়ে নি। ছাত্রপাঠ্য এইজাতীয় যে দু'চারখানা বই দেখেছি তাতে যেমন তথ্যগত ত্রুটি, তেমনি বিচার-বিভ্রাট চোখে পড়েছে। এই গ্রন্থখানি সেদিক থেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং সাহিত্যের ইতিহাস-শিক্ষার্থীর পক্ষে আদর্শস্থল। এই বই পড়লে পরীক্ষার প্রয়োজন ত মিটবেই, তা ছাড়া বিগত দু'শ বছর ধরে বাঙালীর সাহিত্য-ভাবনা কোন্ বিচিত্র পথ ধরে বারবার বাঁক ফিরেছে তার সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা হবে। এই ধারণাটা দৃঢ় হলেই সাহিত্যের ইতিহাস-সম্বন্ধীয় জ্ঞান হয় পাকা। একটি ক্ষুদ্রায়তন পুস্তকের মধ্যে জ্ঞানের এই ভিত্তি রচনার চেষ্টায় লেখক সার্থক হয়েছেন। আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

চারিটি পর্বে ভাগ করে লেখক সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাস আলোচনা করেছেন। প্রথম পর্বে রেনেসাঁসের কথা, তারপর বাঙালীর মননশীলতার আধাররূপে বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশধারার স্তর-পরম্পরা নির্দেশ। বিষয়গুলি প্রশ্নভঙ্গিতে উপস্থাপিত হলেও ঐতিহাসিক ক্রমটি সযত্নে রক্ষা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক আলোচনায় প্রতিভাধর সাহিত্যিকদের মূল্যায়ন-প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। বাগ্‌বাহুল্য, পাণ্ডিত্য-প্রকাশের উৎকট অধ্যবসায় নেই, সহজ ভঙ্গিতে সরল ভাষায় লেখক প্রয়োজনীয় তথ্য-সমাবেশ করে সাহিত্যিকদের সাহিত্যকৃতির স্বরূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। তৃতীয় পর্বে বাংলা কাব্য ও কবিতার ধারায় মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য এবং গীতিকাব্য-ধারার যে প্রসার হয়েছে তার নিপুণ বিশ্লেষণ আছে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও

সাম্প্রতিক কালের কাব্যের উপর যে আলোকসম্পাত হয়েছে তাও উল্লেখযোগ্য। চতুর্থ পর্বে রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর প্রতিভার দ্যুতি কয়েকখানি পৃষ্ঠার মধ্যে সংহত সৌন্দর্যে প্রকাশ করার ক্ষমতায় লেখক বিস্ময়কর শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়কে এমন সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করার কৃতিত্ব সকলেই স্বীকার করবেন।

গ্রন্থখানি সুলিখিত ; বিষয়গুলি সুবিন্যস্ত, মন্তব্যগুলি প্রণিধানযোগ্য ; ভাষা প্রাঞ্জল, সুখপাঠ্য, সহজবোধ্য ; তথ্যগুলি যথাসম্ভব নির্ভুল এবং সাহিত্য-বিচারে বিজ্ঞতার পরিচয় আছে। বি.এ., অনার্স এবং এম. এ. পরীক্ষার্থীদের সর্বপ্রকার প্রয়োজন মিটাবার দাবী এই গ্রন্থখানি করতে পারে। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু সাধারণ পাঠকও গ্রন্থখানি পড়ে আনন্দ পাবেন।

শ্রীহেরম্ব চক্রবর্তী
অধ্যাপক
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,
কলিকাতা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

বিষয়-বিন্যাস

বিষয় | পৃষ্ঠাসংখ্যা

তৃতীয় খণ্ড ঃ কাব্য ও সাহিত্য

চতুর্থ খণ্ড ঃ রবীন্দ্র-সাহিত্য

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

সূচনা-পর্ব

প্রশ্ন ১। বাংলা সাহিত্যের নবযুগ কাহাকে বলে? এই যুগের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর।

উত্তর। বাংলা সাহিত্যের নবযুগ প্রকৃতপক্ষে ইংরাজ আগমনের পর হইতে সূচিত হয়। এককথায় বলা যাইতে পারে যে, ইয়োরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ভাবধারাদ্বারাই নবযুগের বনিয়াদ গঠিত হইয়াছে। কেহ কেহ ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসের অনুকরণে এই যুগকে 'ভিক্টোরিয়া যুগ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালীতে যে নব-জাগৃতি বা Renaissance সৃষ্ট হইয়াছিল তাহারই প্রভাব ইংরাজী সাহিত্যকে নূতন পথে প্রবর্তনা দেয়। বাংলাদেশ সচেতন ভাবে পাশ্চাত্ত্য রেনেসান্স দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে বলা যায় না। কিন্তু ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা, শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা এবং তাহারও কিছুদিন পর হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ঘটনার পর শিক্ষিত বাঙ্গালীর যে মানস-পরিবর্তন ঘটে তাহারই প্রতিফলনে বাংলা সাহিত্যে নবযুগের প্রতিষ্ঠা। প্রাচীন যুগের সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধের তিন বৎসর পর লোকান্তরিত হন। তাহার পর ইংরাজ-বণিকদের প্রভুত্বে বঙ্গদেশ একটি চঞ্চল অনুভূতির মধ্য দিয়া কাটাইতে থাকে। ঠিক সেই মুহূর্তেই নবযুগের সূচনা হয় নাই। ঐতিহাসিক আলোচনার সুবিধার জন্য সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই নবযুগের কাল-নির্দেশ করিয়াছেন। কবি-ওয়ালাদের গানে, ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায়, খ্রীষ্টান মিশনারীদের গদ্যরচনার প্রয়াসে নবযুগের প্রকৃত অভ্যাগম হইয়াছে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখর মধ্যাহ্নে যখন মহাত্মা রামমোহনের বিস্ময়কর প্রতিভা বাংলাদেশের সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম ও সাহিত্যকে নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়াছে। হিন্দুকলেজের ছাত্রদল

যুগের কাল-নির্দেশ

'ইয়ং বেঙ্গল' নামে বিস্ময়কর বিদ্রোহ সূচনা করায় যে ভাবদ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় সেই দ্বন্দ্বের পরম লগ্নেই বাংলা সাহিত্যে নবযুগের প্রথম প্রতিষ্ঠা।

নবযুগের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছিল। পুরাতন দেববিশ্বাস, অন্ধ সংস্কার এবং নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্য পরিহারের পথ ধরিয়াই নবযুগের প্রাথমিক অভিযাত্রা। রাজা রামমোহন রায় পৌত্তলিক ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদির পুনর্বিচার এবং নবতর ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করিলেন। ঈশ্বরগুপ্ত সমাজ-সংস্কার ও যুক্তিবাদের ভিত্তিতে চিন্তাশীল বাঙ্গালীকে আত্মস্থ হইবার উপদেশ দিলেন এবং প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন করিলেন। খ্রীষ্টান পাদরীদের চেষ্টায় এবং তাঁহাদের অনুসরণে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা দিক আলোচনার সূত্রপাত হইল। সংবাদপত্রের মাধ্যমে যুক্তি ও বিচারমূলক গদ্যরচনার প্রসার ঘটিল এবং জাতীয়তাবোধের জলন্ত অনুভূতিতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সাহিত্যের আঙ্গিকরচনায় তীব্র সংস্কার-কামিতা প্রকাশ পাইল। কাব্যে, গদ্যরচনায়, নাটকে, নাট্যাভিনয়ে এবং সঙ্গীতবৈচিত্র্যে বাংলা-সাহিত্যে যেন 'কোটালের বান' ডাকিয়া গেল। ইহার ফলে এই যুগের সাহিত্যে কিছু উল্লেখযোগ্য লক্ষণ ফুটিয়া উঠে।

নবযুগের লক্ষণ

মানবমহিমায় বিশ্বাস ও মানবতাবোধ এই যুগের প্রধান লক্ষণ। মানুষ দেবতার হাতের ক্রীড়নক নয়, মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মহিমাবোধ আছে—এইরূপ একটি বিশ্বাসের বশে নবযুগের সাহিত্যে মানুষের প্রাধান্য। ভারত-চন্দ্রের আন্নদামঙ্গলে এবং রোসাঙ্ রাজসভার সাহিত্যে মানুষকে মুখ্য স্থান দিবার অভিপ্রায় প্রকটিত হয়। এই যুগে মানুষের ঐহিক ও নৈতিক শক্তি আহরণের জন্য জ্ঞানবিজ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচন করা হইয়াছিল।

মানবতা

এই যুগের দ্বিতীয় অথচ বিশেষ উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হইল প্রখর জাতীয়তাবোধ। বাঙ্গালীর মধ্যে স্বদেশচৈতন্য সঞ্চারিত হওয়ায় একদিকে যেমন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা স্পৃহা জাগে, অপরদিকে তেমনি প্রাচীন ঐতিহ্যের গৌরবময় অধ্যায় বাঙ্গালীর কাছে তুলিয়া ধরিয়া জাতি হিসাবে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠার আয়োজন হয়। ঈশ্বরগুপ্ত, রামমোহন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, হেম-মধু-নবীন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীরা জাতীয়তাবোধের উল্লেখযোগ্য পরিচয় তাঁহাদের রচনায় ফুটাইয়া তোলেন।

জাতীয়তাবোধ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু এবং নবগোপাল মিত্র প্রভৃতির চেষ্টা এবং ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকাও নিতান্ত কম নয়।

বিজ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তিনির্ভরতা এই যুগে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইয়া দেখা দিয়াছিল। গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি এবং ধর্মীয় বাদানুবাদের সূত্রে এই যুগ বিশিষ্ট। মানুষ অন্ধ বিশ্বাসে কিছুই মানিয়া লইবে না, যুক্তির কষ্টি-পাথরে যাচাই করিয়া লইবে—এই প্রকার মনোভাব এই যুগেই গড়িয়া উঠে। ইহার ফলে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার-মূলক বহু রচনায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইতে থাকে। একদিকে যেমন বহু প্রবন্ধ রচিত হয়, অপর দিকে নাট্যসাহিত্যে ও কথাসাহিত্যের স্বর্ণদিগন্ত খুলিয়া যায়। অন্ধসংস্কারের যবনিকা উন্মোচিত হওয়ায় মানুষের মনে যে প্রবল জীবন-জিজ্ঞাসা জাগে তাহারই চমৎকার প্রতিফলন ঘটিয়াছে এই যুগের সাহিত্যে।

বিজ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তিবাদ

প্রশ্ন ২। বাংলা নবযুগের সাহিত্য কোন্ কোন্ দিকে কি ভাবে প্রসারলাভ করিয়াছিল তাহা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া নির্দেশ কর।

উত্তর। ইংরাজ আগমনের পর হইতেই বাংলা সাহিত্যে নবযুগের সূচনা। বাংলাদেশে ইংরাজ শাসন গদ্যসাহিত্যের আবির্ভাব ত্বরান্বিত করিয়াছিল, পদ্য-সাহিত্যের নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করিয়াছিল এবং রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নাট্যসাহিত্যের গতিবৃদ্ধি করিয়াছিল। ইংরাজ শাসন-বিধির প্রত্যক্ষ প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই, হইতে পারেও না। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব বাঙ্গালী জাতির জীবনে এমনভাবে অনুক্রমিত হইয়াছিল যে, বাঙ্গালীর মনীষায় নূতন ভাবপ্রেরণা জাগে এবং সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গ ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করিতে থাকে। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন যুগের শেষ ঘণ্টাধ্বনি স্তব্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তখনও নূতন যুগের ভেরী বাজিয়া উঠে নাই। ইংরাজী শিক্ষা-সভ্যতা কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমপ্রসার লাভ করিতে থাকায় দেববাদনির্ভর সাহিত্যরচনার অবসান ঘটে। চিন্তা ও মননশীলতার পরিচয় লইয়া গদ্যসাহিত্য গড়িয়া উঠে। অতঃপর ঈশ্বরগুপ্তের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় নূতন যুগের কাব্যবাণী এবং কলিকাতার সংস্কৃতিবান্ লোকেরা নাট্যসাহিত্যের অনুরাগী হইয়া উঠেন। ইহার ফলে গদ্যে, পদ্যে ও নাটকে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিসূচনা দেখা দিল।

নবযুগের সূচনা ও সাহিত্যবিকাশ

বাংলা গদ্যসাহিত্যকেই নূতন যুগের প্রথম অবদান বলা যাইতে পারে। পূর্বে বাংলা গদ্যের ব্যবহার ছিল না। চিঠিপত্র ও দলিলদস্তাবেজে কিছু কিছু বাংলা গদ্য ব্যবহার করা হইত। খ্রীষ্টান মিশনারীরা বিশেষ উদ্দেশ্যে গদ্যচর্চা করিয়াছিলেন। ইংরাজ কর্মচারীদের বাংলা শিখাইবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সৃষ্টি। ঐ উপলক্ষে অনেকগুলি গদ্যগ্রন্থ রচিত হয়। তাহাতে এমন একটি গদ্যরীতি গড়িয়া উঠে যে, বাঙ্গালীর ভাবকল্পনা ও মননশীলতা প্রকাশের একটি অভিনব মাধ্যম আবিষ্কৃত হইল। জ্ঞানমূলক সাহিত্য রচনার প্রেরণায় গদ্যসাহিত্যের বিকাশ। এই সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিবার উপায়রূপে দেখা দিল সাময়িক পত্র। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষিবর্গ জাতীয় ভাবের অনুপ্রেরণায় সমৃদ্ধ গদ্যসাহিত্য গড়িয়া তুলিলেন।

গদ্যসাহিত্যের বিকাশ

গদ্যসাহিত্য শুধু মননশীলতার সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রহিল না। হৃদয়ের সুকুমার ভাব এবং কল্পনাসমৃদ্ধি প্রকাশের বাহনরূপেও গদ্যভাষার উপযোগিতা অনুভূত হইল। বাংলা গদ্যরীতি সুনিয়ন্ত্রিত রূপ পরিগ্রহ করায় কল্পনামূলক কথাসাহিত্য সৃষ্টির অপূর্ব সুযোগ উপস্থিত হইল। টেকচাঁদ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ গল্প, উপন্যাস, নক্সাচিত্র এবং রসরচনায় বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিলেন। নূতন যুগ বাংলা গদ্যসাহিত্যের জন্য নূতন দিগন্তের স্বর্ণদ্বার খুলিয়া দিল।

কথাসাহিত্যের বিকাশ

বাংলা পদ্যসাহিত্যের নূতন দিগন্তও নবযুগের সূচনায় নূতন আলোকরশ্মি লইয়া অভ্যুদিত হয়। ঈশ্বরগুপ্তের মধ্যে আভাসে ইঙ্গিতে যাহার সূচনা, মহাকবি মধুসূদনের মধ্যে তাহার পূর্ণ ঔজ্জ্বল্য প্রকটিত হইয়া উঠিল। পুরাতন কাব্যের দেবদেবীরা দল বাঁধিয়া বিদায় না নিলেও নূতন যুগের কবিদের কল্পনায় দেবচরিত্র নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিল। একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে এবং পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর অনাস্থায় পৌরাণিক দেবতারা নূতন রূপ পরিগ্রহ করিলেন। মধুসূদনের রাবণ নরখাদক বীভৎস রাক্ষস নহেন, বীর্যবান সম্রাট, কর্তব্যনিষ্ঠ প্রজাপালক। দেবতারা ষড়যন্ত্রকারী। বিদেশী কর্তৃক আক্রান্ত রাজ্য রক্ষার জন্য

কাব্যসাহিত্যের বিকাশ

স্বদেশপ্রেমিক রাক্ষসেরা প্রকাশ্য যুদ্ধে বীরের সদ্গতি লাভ করিয়াছিল। হেমচন্দ্রের দেবতারা জন্মভূমি শত্রুকবলিত হওয়ায় পাতালে ষড়যন্ত্র করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং মাতৃভূমি উদ্ধারের জন্য সর্বস্ব পণ করে। নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ গ্যারিবল্ডি, কাভুর, বিসমার্কের মত এক ধর্ম, এক রাজ্য, এক সিংহাসন স্থাপন করিতে উদ্যত। এইভাবে নূতন যুগ পৌরাণিক কালের নূতন তাৎপর্য উদ্ভাবন করিয়াছিল। গীতিকাব্যের বিকাশেও আত্মনিষ্ঠ মন্ময়তা এবং রোমান্টিক আবেগ প্রকাশ পাইতে থাকে। ঈশ্বর গুপ্ত গীতিকাব্যের দ্বার উন্মোচন করিয়া দিলেন। গীতিকাব্যের বিষয়ব্যাপকতা সৃষ্টি হইল। মানব, প্রকৃতি, স্বদেশপ্রেম, সামাজিক প্রথা প্রভৃতি বহু বিষয় গীতি-কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী আত্মনিষ্ঠ রোমান্টিক গীতি-কবিতার মাধ্যমে কবিমনের সূক্ষ্ম সুকুমার অনুভূতিগুলি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গীতিকাব্যধারা উচ্ছলিত হইয়া উঠিল।

নূতন যুগে বাংলা সাহিত্যে আর একটি অভিনব সৃষ্টি হইল নাটক। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে পয়ার ত্রিপদীর একটানা স্রোতে জীবনধর্মী নাট্যসাহিত্যের উন্মেষ-সম্ভাবনা ছিল না। ইংরেজী প্রভাব বাংলা নাট্যসাহিত্যকেও ত্বরান্বিত করিয়াছিল।

নাট্যসাহিত্যের বিকাশ

হেরাসিম লেবেডেফ নামক একজন রুশীয় ব্যক্তির চেষ্টায় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেশীয় নটনটীর সাহায্যে নাট্যাভিনয় হইতে থাকে। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া বাঙ্গালী লেখকেরা প্রথমতঃ ইংরাজী ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিতে থাকেন। ইয়োরোপীয় নাট্যাদর্শে মৌলিক নাটক রচনারও প্রয়াস দেখা যায়। যোগেন্দ্র গুপ্তের ‘কীর্তি-বিলাস’ এবং তারাচরণের ‘ভদ্রার্জুন’ নাটক এই দিকের প্রথম প্রচেষ্টা। হরচন্দ্র ঘোষ সেক্সপীয়রের নাটকগুলির অনুবাদ করিতে থাকেন এবং রামনারায়ণ তর্করত্ন সখের থিয়েটারের চাহিদা অনুযায়ী সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহও একজন উৎসাহদাতা ছিলেন। এই সূত্রে বাংলায় বাস্তবধর্মী নাটকেরও সূত্রপাত হয়। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা প্রভৃতি সামাজিক বিষয় অবলম্বনে বাস্তবধর্মী নাটকের পদক্ষেপে বাংলা রঙ্গমঞ্চ সচকিত হইয়া উঠে।

নবযুগের চেতনা এইভাবে কাব্যে, গদ্যশিল্পে, নাটকে নানা ভাবে ও ভঙ্গিতে প্রকাশ পাইতে থাকে। চিন্তার ক্ষেত্রে যেমন বিপ্লব দেখা দেয়, আঙ্গিক উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেও নানা অভিনবত্ব প্রকাশ পাইতে থাকে।

দ্বিতীয় খণ্ড

গদ্য-সাহিত্যের বিবরণ

প্রশ্ন ১। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেকার বাংলা গদ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। বাংলা গদ্যের সৃষ্টিকে বিদেশীদের কৃতিত্বরূপে নির্দেশ করা সঙ্গত কিনা আলোচনা কর।

উত্তর। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর জ্ঞান ও কর্মের মহান প্রকাশ ঘটিয়াছিল বাংলা গদ্যের মাধ্যমে। বাংলা গদ্য গঠনের সৌন্দর্যে, ভাব প্রকাশের উপযোগিতায় এবং সাহিত্যিক গৌরবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাহার পূর্বেও, এমন কি ষোড়শ শতাব্দী হইতেই, বাংলা গদ্য রচনার কিছু কিছু নিদর্শন গবেষকদের হস্তগত হইয়াছে। পয়ার ছন্দে সর্বপ্রকার ভাব প্রকাশের উপযোগিতার সুযোগ লইয়া সকলেই ছন্দে রচনা করিতেন, গদ্য নিবন্ধ রচনায় কাহারও উৎসাহ ছিল না। তবু চিঠিপত্র, দলিলদস্তাবেজ, সহজিয়া বৈষ্ণবদের কড়চা, পাদ্রীদের নিবন্ধ প্রভৃতি নানা উপকরণ গদ্য রচনার নিদর্শনরূপে পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীন গদ্যের নিদর্শনরূপে কিছু চিঠিপত্রের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। সম্পত্তি দান ও হস্তান্তরের দলিলগুলি গদ্য ভাষায় লেখা হইত। প্রাচীন চিঠির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কুচবিহারের রাজার পত্র। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা নরনারায়ণ যে পত্র লেখেন তাহার ভাষায় প্রাঞ্জলতাগুণ ছিল। বৈষয়িক প্রয়োজনে লিখিত গদ্যভাষার প্রকাশ-যোগ্যতার দিকেই লেখকেরা বেশি নজর দিতেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় আত্মবিক্রয়মূলক চারখানি দলিল পাওয়া গিয়াছে। উহাদের ভাষাও খুব স্পষ্ট।

কুচবিহারের রাজার পত্র

"এগার রূপাইয়া পাইয়া স্ব-ইচ্ছাপূর্বক আত্মবিক্রয় করিলাম।" —এইরূপ ভাষা-গঠন নিন্দনীয় নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কারারুদ্ধ মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার পুত্রকে যে পত্র লেখেন তাহাও আদি যুগের গদ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। "মুখ-প্রক্ষালনাদি কিছুই

অন্যান্য দলিল ও পত্র

করিতে পারি নাই। নাসাগ্রে প্রাণ হইল। ফলীহৎ যত যত পাইলাম তাহা কত লিখিব।" নন্দকুমারের এই পত্রখানিতে কিছু ফার্সী শব্দ থাকিলেও বাংলা গদ্যের প্রাচীন নিদর্শনরূপে আদর্শস্থল। ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাটের কাছে যে দরখাস্ত দেন তাহাতেও উৎকৃষ্ট বাংলা গদ্য ব্যবহার করা হয়।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব সহজিয়া সাধকেরা গদ্য-পদ্য মিশ্রিত প্রশ্নোত্তর-মূলক একপ্রকার কড়চা লিখিতেন। নরোত্তম দাসের 'দেহকড়চা' গ্রন্থে কিছু গদ্যের নিদর্শন আছে। নাথযোগী ও বৈষ্ণব-বৈরাগীরাই কড়চা রচনা করেন। খ্রীষ্টান পাদরীরাও এই পন্থার অনুসরণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে গদ্যের সঙ্গে ছড়া মিশিয়া গিয়াছিল। লেখকেরা কর্তা কর্ম ক্রিয়া ঠিক করিয়া রীতিসিদ্ধ গদ্য রচনা করিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রয়োজনসিদ্ধি ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে বাংলা গদ্যের উপযোগিতা প্রমাণিত করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব নিবন্ধে গদ্য

খ্রীষ্টান পাদরীদের গদ্য রচনার চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে পাদরীরা বিশেষ আগ্রহ লইয়া গদ্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের স্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেও বাংলা গদ্যসাহিত্য ইহাতে বিশেষ প্রেরণা লাভ করে। পর্তুগীজ পাদরীদের মধ্যে দোমিঙ্গো দে সোসা-ই বোধ হয় প্রথম গদ্য লেখক। ফার্ণান্দেজ নামক শ্রীপুরের একজন কর্মচারী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে একখানি পত্রে (১৫৯৯, জানুয়ারী) জানান যে, তিনি ধর্মবিষয়ক একখানি কড়চা লিখিয়া পাদরী সোসাকে দিয়া বাংলায় অনুবাদ করাইয়াছেন। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে বোধহয় গ্রন্থখানি অনূদিত হয়।

দোমিঙ্গো দে সোসা

পর্তুগীজ পাদরীরা কিছু কিছু ব্যাকরণ ও অভিধানগ্রন্থ রচনা করিয়া বিদেশীদের বাংলা শিক্ষার পথ প্রস্তুত করেন। ধর্ম-মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য এবং হিন্দুধর্মকে ছোট করিবার জন্য গদ্যগ্রন্থ রচনা করা হয়। দোম আন্তোনিও দে রোজারিও নামে একজন পাদরী "ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ" নামে একখানি গ্রন্থ লেখেন। গ্রন্থখানির বিষয়—'জনৈক খ্রীষ্টান অথবা রোমান ক্যাথলিক ও জনৈক ব্রাহ্মণ বা হিন্দুদিগের আচার্যের মধ্যে শাস্ত্র সম্পর্কীয় তর্ক ও বিচার'। লেখক ছিলেন বাঙ্গালী রাজকুমার।

দোম আন্তোনিও দে রোজারিও

বাল্যে মগদস্যুদের দ্বারা অপহৃত হন এবং পর্তুগীজ পাদরীর কাছে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া হিন্দুধর্মের মুণ্ডপাত করিতে থাকেন। সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রোমান হরফে (ইংরাজী বর্ণমালায়) গ্রন্থখানি রচিত হয়। গ্রন্থখানি লিসবনে আছে এবং অনুমান করা হয় যে, সেখানে মুদ্রিত হইয়াছিল। বইখানির উদ্দেশ্য অত্যন্ত হীন হইলেও বাঙ্গালীর রচনার বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়াছিল।

আর একজন পর্তুগীজ পাদরী খ্রীষ্টধর্মের মহিমাপ্রচারক গ্রন্থ লেখেন সম্ভবত ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার নাম মানোএল দ্য আসসুম্পসাঁউ। তাঁহার গ্রন্থের নাম "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"। লিসবন সহরে বইখানি রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। এইখানিই প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বইখানির মুদ্রণকার্য সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থে লেখক যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে দেশীয় লোকের সহযোগিতা ছিল। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ গ্রন্থের ভাষায় বিদেশীর জড়তা আছে, তবু ব্যাকরণের নিয়মে ভাষাকে বাঁধিবার চেষ্টা প্রশংসনীয়।

মানোএল দ্য আসসুম্পসাঁউ

আরও দুই একজন পাদরী কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সরকারী কাজের প্রয়োজনেও কিছু গদ্যানুশীলন করেন। কিন্তু তাহার কোন সাহিত্যিক মূল্য নাই। এই প্রসঙ্গে হ্যালহেডের ব্যাকরণের উল্লেখ করা যায়। ইংরাজী ভাষায় লেখা ব্যাকরণের উদাহরণগুলি সব বাংলা। বাংলা হরফে মুদ্রিত ইহাই প্রথম গ্রন্থ। কোম্পানীর কয়েকটি আইনের অনুবাদগ্রন্থও প্রাচীন গদ্যের নিদর্শন। ডানকান-কৃত ইম্পে কোড্ (১৭৮৫), এডমনস্টোন কৃত কার্যবিধির অনুবাদ (১৭৯১), ফরস্টারের কর্ণওয়ালিস কোড্ (১৭৯৩) প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

অন্যান্য নিদর্শন

বাংলা গদ্যের সৃষ্টিতে বিদেশীদের উদ্যম আমাদের উপকারে আসিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু গদ্যভাষার গঠনশিল্পে বিদেশীদের কৃতিত্ব সর্বথা স্বীকার্য নয়। বিদেশীরা অর্থ ও প্রতিপত্তিবলে দেশীয় লেখকদের দ্বারা লিখাইয়া লইতেন সন্দেহ নাই। কৃপার শাস্ত্রের তুলনায় ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক ভাষাশিল্পে উন্নততর। অনুবাদকদের অনেকেই উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন। তাঁহারা অধীনস্থ লোকেদের দ্বারা লিখাইতেন। নন্দকুমারের পত্র এবং দলিলের ভাষা পাদরী লেখকদের ভাষা

দেশীয় লেখকদের কৃতিত্ব

অপেক্ষা অনেক প্রাঞ্জল। গদ্য-শিল্পরচনায় বাঙ্গালীর দানই স্বাভাবিক ও সঙ্গত মনে হয়।

প্রশ্ন ২। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশে শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনের দানের পরিমাণ নিরূপণ কর।

উত্তর। বাংলা গদ্য রচনার সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরম্ভ হইলেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হইবার পরই বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক রূপ ফুটিয়া উঠে এবং প্রতিভাবান সাহিত্যিকেরা গদ্য রচনায় আকৃষ্ট হন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য প্রোটেস্টান্ট মিশন কলিকাতায় একটি প্রচারকেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে উইলিয়ম কেরী এবং টমাসকে নিযুক্ত করেন। কেরী ছিলেন ধর্মযাজক এবং টমাস ছিলেন জাহাজের ডাক্তার। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের প্রতিকূলতায় কলিকাতায় ইহাদের স্থান হইল না। অতঃপর তাঁহারা দিনেমার-কেন্দ্র শ্রীরামপুরে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারী মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। ওয়ার্ড, বার্ণস্‌ডন এবং মার্শম্যান প্রভৃতি প্রচারকগণ কেরীর সহিত যোগ দিলেন এবং সোৎসাহে মিশনের কাজ আরম্ভ হইল।

শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা

বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া শ্রীরামপুর মিশন প্রথম কার্যারম্ভ করে। গদ্যরচনার এই চেষ্টা বাংলা গদ্যের বিকাশের পথে অনেক সহায়ক হইয়াছিল। শ্রীরামপুর মিশনে যোগ দিবার পূর্বেই কেরী বাইবেল অনুবাদে হাত দেন। তাঁহার মুন্সী রামরাম বসু হয়ত এই কাজে তাঁহার সহায়ক ছিলেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে St. Mathew's Gospel অনুবাদ করিয়া "মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত" নামে প্রকাশ করা হয়। কেরীর উদ্যোগে, টমাস, মার্শম্যান প্রভৃতির উৎসাহে এবং রামরাম বসু প্রভৃতি বাঙ্গালী শিক্ষকদের সহায়তায় New Testament সম্পূর্ণ এবং Old Testament-এর খানিকটা অংশের অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। পরে সমগ্র বাইবেল ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে 'ধর্ম পুস্তক' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ বাংলা গদ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন নয়, গদ্য-রচনার উৎসাহ মাত্র।

বাইবেল অনুবাদ

শ্রীরামপুরের মিশন বাংলা গদ্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিল সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া। মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ফলেই সংবাদপত্র প্রকাশের চমৎকার সুযোগ

ঘটে। মিশনের মুদ্রাযন্ত্রে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, নানাবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ, বাইবেলের অনুবাদ এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকগোষ্ঠীর রচনাবলী মুদ্রিত হওয়ায় গ্রন্থ রচনার আবহাওয়া গঠিত হয়। মিশনের ছাপাখানা হইতেই প্রথম সংবাদপত্র ছাপা হয়। ১৮০১ হইতে একাদিক্রমে তেত্রিশ বৎসর শ্রীরামপুর মিশন প্রেস বহু গ্রন্থ প্রকাশ করে। মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করিয়া জাতীয় জীবনে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে মার্শম্যানের সম্পাদনায় 'দিগ্‌দর্শন' নামে সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসরই মে মাসে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সমাচারদর্পণ' প্রকাশ করা হয়। এই সব পত্রিকার সম্পাদনায় জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, তারিণীচরণ শিরোমণি প্রভৃতি বাঙ্গালী পণ্ডিতেরা বিলক্ষণ সহায়তা করিতেন।

মুদ্রাযন্ত্র-প্রতিষ্ঠা ও সংবাদপত্র

শ্রীরামপুরের মিশন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের স্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া সক্রিয় ছিল। মিশনারীগণ কর্তৃক বাংলা গদ্যের অনুশীলনে কোন সাংস্কৃতিক উন্নতিকামিতা বা বিজিত জাতির ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক উন্নতির অভিপ্রায় ছিল না। তাঁহাদের রচিত বাংলা গদ্য 'বাইবেলী বাংলা' বা 'খ্রীষ্টানী বাংলা' নামে নিন্দিতও হইয়াছে। তথাপি ইতিহাসের সাক্ষ্যে একথা অস্বীকার করা যাইবে না যে, খ্রীষ্টান পাদরীরা বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থাদি প্রচার করিয়া বাঙ্গালীকে আত্মসচেতন করিয়াছিলেন এবং সেই সচেতনতা প্রকাশের উপযোগী ভাষাপথের সন্ধানও দিয়াছিলেন।

উপসংহার

প্রশ্ন ৩। বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশমুখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

উত্তর। ঊনবিংশ শতাব্দীর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বাংলা গদ্যের বিকাশপথে প্রভূত শক্তি সঞ্চার করিয়াছিল। বস্তুতঃ গদ্যভাষার সাহিত্যিক রূপনিমিতির প্রাথমিক কারুকার্য এই কলেজের পণ্ডিতবর্গের হাতের দান। এই কলেজ সৃষ্টির একটি ইতিহাস আছে। সরকারী কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা ও রীতিনীতি শিখাইবার জন্য লর্ড ওয়েলেসলি কলেজ সৃষ্টির পরিকল্পনা করিলেন এবং ঘোষণা করিলেন যে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারীর মধ্যে দেশীয় ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় না দিতে পারিলে ইংরাজ কর্মচারীদের

কলেজের প্রতিষ্ঠা

চাকুরী থাকিবে না। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা মে তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ২৪শে নবেম্বর সোমবার হইতে যথারীতি পঠন-পাঠন আরম্ভ হইল। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে পাদরী কেরী সাহেব প্রাচ্য বিভাগের কর্ণধার নিযুক্ত হইলেন। কেরীর সহকারী রূপে নিযুক্ত হইলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, রাজীবলোচন, কাশীনাথ, রামরাম বসু প্রভৃতি। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কলেজটি উঠিয়া যায়। কিন্তু ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই কলেজে সোৎসাহে বাংলা পাঠন চলে এবং কেরীর পৃষ্ঠপোষকতায় অনেকগুলি বাংলা গ্রন্থ রচিত হয়।

বাঙ্গালীর সাহিত্যিক কৃতিত্ব ও ভাবজীবনের সূচনার পরিচয় পাইতে হইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রকাশিত রচনাবলীর পরিচয় জানা প্রয়োজন। তের বছরের ইতিহাসই খুব গৌরবময়; তবে একুশ বছর পর্যন্ত একটানা অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ রচয়িতাদের মধ্যে কেরী, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয়, গোলোক শর্মা, তারিণীচরণ, চণ্ডীচরণ এবং রাজীবলোচনই খুব উল্লেখযোগ্য। স্বয়ং কেরী এই সমস্ত শিক্ষকদের প্রেরণা দিয়াছেন, পথ দেখাইয়াছেন। কেরীর নামে প্রকাশিত দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। একখানি 'কথোপকথন' (১৮০১) এবং অপরখানি 'ইতিহাস-মালা' (১৮১২)। 'কথোপকথন' কেরীর রচনা কিনা খুবই সন্দেহ। তাঁহার সহকারী মৃত্যুঞ্জয়ের সহায়তায় কথোপকথনের ভাষা গড়া হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলের জীবনযাত্রা ও

পণ্ডিত-মুন্সীদের রচনা

কথ্যভাষা গ্রন্থখানির উপজীব্য। প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে উত্তর-প্রত্যুত্তর-ভঙ্গিতে ইহা রচিত। "ওলো তোর ভাতার কারে কেমন ভালবাসে তাহা বল শুনি।"—এই রকম ভাষায় গ্রন্থখানি আদ্যন্ত লেখা হইয়াছে। বাংলা গদ্যের চলিতরূপ প্রবর্তনের প্রথম সূচনা এই গ্রন্থেই দেখা যায়। কেরীর 'ইতিহাসমালা' পৌরাণিক ও কাল্পনিক গল্পের সমষ্টি। এখানিও কেরীর রচনা কিনা সন্দেহ। তিনি হয়ত সম্পাদক ছিলেন। দেবতার প্রসঙ্গ ছাড়া লৌকিক জীবন সম্বন্ধে গল্পকৌতূহল সৃষ্টির প্রথম প্রচেষ্টারূপে এই রচনা অভিনন্দনযোগ্য।

উইলিয়ম কেরী

কেরী সাহেবের মুন্সী রামরাম বসু পর পর দুইখানি গ্রন্থ লেখেন। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' প্রকাশিত হয় ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে এবং পর বৎসর প্রকাশিত হয়

'লিপিমালা'। এই গ্রন্থ দুইখানি রামরাম বসুর মৌলিক রচনা। কথকতা ধরণের ভাষায় ইনি লিখিয়াছেন। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে লেখা গ্রন্থখানিতে আর্বী-ফার্সী শব্দের প্রাচুর্য সম্ভবতঃ কেরী অনুমোদন করেন নাই। তাই দ্বিতীয় গ্রন্থখানির ভাষায় অনেকটা সাবলীল ভাব লক্ষ্য করা যায়। পত্রলেখার পদ্ধতি এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু হইলেও লেখক বেশ সরস ভঙ্গিতে নানা গল্প ও উপাখ্যান জুড়িয়া দিয়া কথাসাহিত্যের প্রথম সূচনার ইঙ্গিত দিয়াছেন।

রামরাম বসু

ফোর্ট উইলিয়মের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। তিনি প্রথমে বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২) ও হিতোপদেশ (১৮০৮) নামে দুইখানি অনুবাদমূলক গ্রন্থ লেখেন। তাঁহার মৌলিক রচনা রাজাবলি (১৮০৮) এবং প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮১৩ সালে রচিত, ১৮৩৩ সালে মুদ্রিত) তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। মৃত্যুঞ্জয় সমসাময়িক লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার প্রথম তিনখানি গ্রন্থে তিনি অলঙ্কারবহুল গুরুগম্ভীর রচনাদর্শ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবোধচন্দ্রিকার ভাষায় তিনি গদ্যরীতির নানা ভঙ্গি লইয়া পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়াছেন। বাংলা চলিত রীতির অতি উৎকৃষ্ট ব্যবহার মৃত্যুঞ্জয়ের রচনায় পাওয়া যায়। ইনি যথার্থই প্রতিভাবান্ পণ্ডিতব্যক্তি এবং উন্নত স্তরের বাণীশিল্পী ছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অন্যান্য লেখকদেরও কীর্তি নগণ্য নয়। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' (১৮০৫)। ছেদ-চিহ্নাদি না থাকায় গ্রন্থখানি কিঞ্চিৎ দুষ্পাঠ্য, নতুবা লেখক চমৎকার অন্বয়বোধের পরিচয় দিয়াছেন। গোলোকনাথ শর্মা 'হিতোপদেশ' প্রকাশ করেন ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থের ভাষাও প্রাঞ্জল। তারিণীচরণ মিত্র 'ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট' (১৮০৩) লেখেন ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ-রূপে। তাই এই গ্রন্থের ভাষা খুব আড়ষ্ট। চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫) ফার্সী আদিরসাত্মক কেচ্ছার অনুবাদ। গল্প-উপকথা জাতীয় এইসব রচনা বেশ সমাদর লাভ করিয়াছিল। তোতা ইতিহাসে অবৈধ প্রণয়কাহিনীগুলি মানবিক রসের আস্বাদনবৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহাকে আদিরসাত্মক উপন্যাসের প্রাগ্‌রূপ বলা যায়।

অন্যান্য লেখকবর্গ

কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীরা যে গ্রন্থাদি রচনা করিলেন তাহা অনেকটা পাঠ্যপুস্তক

জাতীয় এবং পরবর্তীকালে গদ্যরীতির নির্দেশক। মিশনারীদের মত কোন গূঢ় উদ্দেশ্য গদ্যচর্চার মধ্যে ছিল না। গল্প-উপকথা-ইতিহাস ও দর্শন বিষয় অবলম্বনে নানাজাতীয় গ্রন্থ রচিত হয়। ইহার কিছুটা অনুবাদ, কিছুটা অন্য রচনা দ্বারা প্রভাবিত এবং কিছুটা মৌলিক রচনা। যে ভাষারীতি ইহারা ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে প্রধানতঃ কথকতামূলক বর্ণনাত্মক ভাষায় আত্মপ্রকাশের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। কোন রীতিতে ইসলামী শব্দবাহুল্য, কোন রীতিতে সংস্কৃত শব্দাধিক্য ও গাম্ভীর্য এবং কোন রীতিতে ছিল চলিত ভাষার কথোপকথন ভঙ্গি। এই রীতিগুলিই পরে পরিমার্জিত হইয়া বাংলা গদ্যের সাধু ও চলিত এই দুইটি ব্যবহার্য রীতিতে পর্যবসিত হইয়াছিল।

রচনায় সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য

প্রশ্ন ৪। বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশে খ্রীষ্টান মিশনারী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দানের তুলনামূলক আলোচনা কর।

উত্তর। বাংলা গদ্যের যৎকিঞ্চিৎ নমুনা ইসলাম শাসনকালে সূচিত হইলেও ইংরাজ আমলেই প্রকৃতপক্ষে বাংলা গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব। এই সাহিত্যের বিকাশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় সূচনা হইতেই মিশনারীরা ধর্মপ্রচারের জন্য এবং বিদেশীকে বাংলা শিখাইবার জন্য গদ্যের অনুশীলন আরম্ভ করেন। ইহার কিছুকাল পরে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই বিদেশাগত তরুণ রাজকর্মচারীদের দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতিতে ব্যুৎপন্ন করিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সৃষ্টি হয় এবং বাংলা গদ্যের ব্যাপক চর্চা হয়। বাংলা গদ্যের বিকাশের ক্ষেত্রে এই দুইটি প্রতিষ্ঠানই খুব উল্লেখযোগ্য।

ভূমিকা

মিশনারীদের মধ্যে পর্তুগীজ রোমান ক্যাথলিকরাই প্রথম গদ্য ভাষার অনুশীলন করেন। পরে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালী খ্রীষ্টান দোম আন্তোনিও "ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ" লেখেন। পর্তুগীজ পাদরী আস্সুম্প-সাঁউ "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" লেখেন এবং পর্তুগীজ-বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রচনা করেন। তাঁহারা বাইবেলের অনুবাদও প্রকাশ করেন। শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনারীরা মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া 'মঙ্গল সমাচার' (Gospel of St. Mathew) প্রকাশ করেন। 'ধর্মপুস্তক'

মিশনারীদের দান

নামে বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করেন। 'খ্রীষ্ট বিবরণামৃত' নামে খ্রীষ্ট-জীবনী প্রকাশ করা হয়। ধর্মপ্রচারের জন্য এবং হিন্দুধর্মের অসারতা প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুকে খ্রীষ্টানুরাগী করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা 'দিগ দর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এইসব পত্রিকায় সরল গদ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা বিষয় প্রকাশ করা হইত। ইহাদের কার্যকলাপে শিক্ষিত হিন্দুরা উত্তেজিত হন এবং ধর্মীয় বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তাহাতেও গদ্যচর্চার প্রসার ঘটে। এইভাবে গদ্যচর্চার একটা উন্নত মান সৃষ্টি হইতে থাকে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দান

বাংলা গদ্যের ভিত্তি গঠনে আর একটি প্রতিষ্ঠানের দানও সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সৃষ্ট হইলে কেরী সাহেবের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ঐ কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীরা গদ্যগ্রন্থ রচনা করিতে থাকেন। স্বয়ং কেরীর নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কথোপকথন (১৮০১) এবং ইতিহাসমালা (১৮১২) বিষয়-বৈশিষ্ট্যে এবং ভাষা-ভঙ্গিতে অভিনব সন্দেহ নাই। চৌদ্দ পনের বছরের চেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠানটি বহু রকমের গ্রন্থ রচনা করিয়া বাংলা গদ্যরীতির নানা আদর্শের সন্ধান দেয়। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত, লিপিমালা; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বত্রিশ সিংহাসন, রাজাবলি, হিতোপদেশ ও প্রবোধচন্দ্রিকা; গোলোকনাথ শর্মার হিতোপদেশ; তারিণীচরণ মিত্রের ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট; চণ্ডীচরণ মুন্সীর তোতা ইতিহাস এবং রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্ প্রভৃতি গ্রন্থ অনুবাদে, মৌলিক রচনায় এবং গদ্যরীতির নানা বৈচিত্র্যে বাংলা গদ্য সাহিত্যের গৌরবময় ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিয়াছিল। সাহিত্যবিচারে পণ্ডিত-মুন্সীদের কাজ উচ্চস্তরের নয়। একমাত্র মৃত্যুঞ্জয় ছাড়া অন্য কাহাকেও যথার্থ গদ্যশিল্পী আখ্যা দেওয়া যায় না। তথাপি তাঁহাদের কৃত কার্যে বাংলা গদ্যানুশীলনের পথ যে প্রশস্ত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

তুলনা

মিশনারী ও কলেজ উভয়েরই দান উল্লেখযোগ্য। তথাপি উভয়ের দানের তুলনাগত স্বাতন্ত্র্য আছে। প্রতিষ্ঠান দুইটির পৃথক উদ্দেশ্য এবং রচয়িতাদের স্বাতন্ত্র্যের জন্যই এই দুই প্রতিষ্ঠানের দানের তারতম্য ঘটিয়াছে। ফোর্ট উইলিয়মের গ্রন্থরাজিতে দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় নাই সত্য, তবু এখানকার গদ্যগ্রন্থগুলিতে উন্নত গদ্যশিল্পের সম্ভাবনা সূচিত হইয়াছিল। মিশনারীরা প্রচারের উদ্দেশ্যে

সাংবাদিকতার ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সাহিত্যিক সুষমার দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। বিতর্কমূলক প্রবন্ধ রচনার উপযোগী গদ্যরীতি তাঁহাদের আবিষ্কার। কিন্তু হৃদয়ের সুকুমার অনুভূতি ও কল্পনাশক্তিকে প্রকাশের উপযোগী গদ্যরীতির সন্ধান তাঁহারা করেন নাই।

মিশনারী গদ্যে প্রচারধর্মিতা ; কলেজীয় গদ্যে বিষয়গত ও রীতিগত বৈচিত্র্য

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রকাশিত গ্রন্থগুলি ছিল নানাবিষয়ক। গল্প, উপকথা, ইতিহাস, দর্শন, জীবনচরিত প্রভৃতি বহু বিষয় অবলম্বনে বিভিন্ন শ্রেণীর লেখকেরা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কল্পনাসুন্দর কাহিনী রচনায়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনায়, গার্হস্থ্য জীবনের বাস্তবানুগ চিত্ররচনায় কলেজের অধ্যাপকগণ যথাসম্ভব কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বত্রিশ সিংহাসন ও তোতা ইতিহাস মানবজীবনরসে নিষিক্ত চিত্তাকর্ষক রচনা। লিপিমালা ও ইতিহাসমালার কাহিনী অনৈতিহাসিক হইলেও কৌতূহলোদ্দীপক। সর্বোপরি, গদ্যশিল্পে চলিত রীতির উপযোগিতা এই কলেজেই প্রমাণিত হয়। মৃত্যুঞ্জয়ের রাজাবলি ও বত্রিশ সিংহাসনে সাধুরীতির উৎকৃষ্ট প্রয়োগ। তুলনায় মিশনারীদের বাইবেল অনুবাদের ভাষা নিঃসংশয়ে নিকৃষ্ট। দৈনন্দিন জীবনে প্রযুক্ত চলিত কথাকে কেরী ব্যবহার করিয়াছেন ; কিন্তু উহার মান উচ্চ নয়। তুলনায় মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধচন্দ্রিকার ভাষা গদ্যরীতি উদ্ভাবনের একটি সুন্দর চেষ্টা। এই কলেজের সৃষ্ট গদ্যরীতিই কালক্রমে 'আলালী' ও 'সাগরী' রীতির পথ বাহিয়া বঙ্কিমী রীতিতে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। সব রকম ভাবই যে গদ্য ভাষায় সুন্দর করিয়া প্রকাশ করা চলে এই প্রত্যয় সৃষ্টির মূল্যও নিতান্ত কম নয়। ফোর্ট উইলিয়মের ভাষা উৎকৃষ্ট গদ্যরীতি না হইলেও প্রত্যয় সৃষ্টির জন্যও চিরকাল সমাদৃত হইবে।

প্রশ্ন ৫। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সংবাদপত্রের উদ্ভব ও বিকাশের পরিচয় দাও। এই প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সহিত ইহার সংযোগসূত্র নির্দেশ কর।

উত্তর। (ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের বিকাশে সাময়িক পত্রগুলির দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।) খ্রীষ্টান মিশনারী এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকবৃন্দ বাংলা গদ্যের জন্য প্রভূত পরিশ্রমে ভূমিকর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই

কর্ষিত ভূমিতে ফসল সৃষ্টির উপযোগী আলো-হাওয়া এবং বারিসিঞ্চনের ব্যবস্থা করিয়াছিল সংবাদপত্র। বাংলা গদ্য এত দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করিত না এবং সর্বপ্রকার ভাব প্রকাশের উপযোগিতা লাভ করিত না, যদি যথাকালে সাময়িক পত্র আসিয়া গদ্যভাষার বাহন না হইত। সুতরাং গদ্যরীতি গঠনে এবং গদ্য রচনার প্রসঙ্গ বিস্তারে সংবাদপত্রের দান কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার্য। বিভিন্ন পত্রিকাগোষ্ঠীকে অবলম্বন করিয়াই প্রতিভাবান সাহিত্যিকেরা জাতীয় সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

বাংলা সাহিত্যের বিকাশে সংবাদপত্র

আমাদের দেশে সাময়িক পত্রের ইতিহাস খুব সুপ্রাচীন নহে। প্রাচীনকালে হয়ত ভাট কবিরাই সাংবাদিকের কাজ করিতেন। মোগল যুগে 'ওয়াকেয়া-নবীশ' নামে সাংবাদিক ছিলেন। ইহাদের বিবরণ প্রকাশিত হইত না এবং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ থাকিত। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে হিকি সাহেব ইংরাজী ভাষায় 'বেঙ্গল গেজেট' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় সাময়িক পত্র প্রথম প্রকাশ করেন শ্রীরামপুর মিশন হইতে জন মার্শম্যান ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যও ঐ সময় 'বাঙ্গাল গেজেটি' নাম দিয়া একখানি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। মিশনারীদের পত্রিকার নাম ছিল 'দিগ্‌দর্শন'। উহার উদ্দেশ্য ছিল, "যুব লোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ প্রদান।" 'দিগ্‌দর্শন' বেশি দিন চলে নাই। অনতিবিলম্বে মার্শম্যানের সম্পাদনায় 'সমাচারদর্পণ' প্রকাশিত হইল। এই পত্রিকা অনেকখানি স্পষ্ট ভাষায় তৎকালীন সামাজিক রীতিনীতির সমালোচনা করিত, কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ পরিবেষণ করিত এবং হিন্দুধর্ম ও সমাজের নানা প্রকার কুৎসা রটনা করিত। দেশীয় লোকেরা ইহার প্রতিকারের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। রামমোহনের নেতৃত্বে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে 'সংবাদকৌমুদী' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়া ভারতীয় হিন্দুধর্মের সমর্থন করা হইল। এই পত্রিকায় খ্রীষ্টধর্মের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিও নির্দেশ করিয়া মিশনারীদের কর্মপ্রচেষ্টার বিরোধিতা করা হইল। ধর্মসম্বন্ধীয় এই তর্কযুদ্ধের ফলে বাংলা গদ্যের প্রকাশভঙ্গি সুষ্ঠুতর হইয়াছিল।

সংবাদপত্রের সূচনা

মিশনারী প্রচেষ্টা

সম্বাদকৌমুদী

রামমোহনের সহিত ভবানীচরণের মতভেদ হওয়ার ফলে ভবানীচরণ 'সমাচার-

চন্দ্রিকা' নামে স্বতন্ত্র পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং রামমোহন 'ব্রাহ্মণ সেবধি' নামক পত্রে ঔপনিষদিক ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য লেখনী পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই ধর্ম, সমাজ, ঐতিহাসিক গবেষণা, বিজ্ঞানালোচনা এবং কল্পনামূলক মৌলিক রচনা সাময়িক পত্রকে বাহন করিয়া বিপুল বেগে প্রকাশিত হইতে লাগিল। 'পশ্বাবলী', 'সংবাদ-তিমিরনাশক', 'বঙ্গদূত', 'জ্ঞানান্বেষণ', 'জ্ঞানাঙ্কুর', 'প্রতিবিম্ব', প্রভৃতি বহু পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইহার ফলে বাংলা সাহিত্যের বিষয়বিস্তার ঘটিতে থাকে, বাংলা গদ্যের সরলীকরণ ঘটে, মনীষা ও লিপিকুশলতা প্রকাশের অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়। সাংবাদিকতার সূত্র ধরিয়াই সাহিত্যিক প্রতিভা উন্মেষিত হয়। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা সকলেই সাময়িক পত্র অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব প্রতিভা প্রকাশের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন।

অপরাপর পত্রপত্রিকা

সাহিত্য রচনার প্রেরণারূপে সাময়িক পত্রের ইতিহাসে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হইল ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'। ঈশ্বরগুপ্ত উচ্চশিক্ষিত না হইলেও উচ্চশ্রেণীর সাংবাদিক। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে মাসিকপত্রিকারূপে 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয়তার ফলে ক্রমে সাপ্তাহিক, দ্বি-সাপ্তাহিক এবং দৈনিক পত্রিকা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত ইহাই সর্বপ্রথম দৈনিক পত্রিকা। নানা প্রগতিশীল রচনা ইহাতে প্রকাশিত হইত। বহু জ্ঞানতপস্বী ও সাহিত্যসেবী এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যত্ব শিরোধার্য করিয়াছিলেন। আরও অনেক পত্রিকা তখন প্রকাশিত হয়। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪), প্রগতিবাদী 'ইয়ং বেঙ্গল'দের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বিজ্ঞান সেবধি' প্রভৃতি পত্রিকা বিদ্যানুশীলন, সাহিত্যসৃষ্টি এবং গবেষণার কাজে বাংলা গদ্যের উপযোগিতা প্রমাণ করিয়াছিল। সংবাদপত্রগুলি পরস্পর প্রতিযোগিতায় বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইত। 'সংবাদ ভাস্কর' ও 'সংবাদ রসরাজ' গালাগালি ও কুৎসা রটনায় অদ্বিতীয় ছিল। এই উপলক্ষে বিদ্রূপাত্মক ব্যঙ্গ রচনার সৃষ্টি হয়। প্রহসন ও ব্যঙ্গ উপন্যাস রচনায় যোগ্য গদ্য-ভাষাসৃষ্টি সাংবাদিকতার মাধ্যমেই ঘটে।

সংবাদ প্রভাকর ও অন্যান্য পত্র

বাংলা গদ্যের ভাষায় সৌন্দর্য, শালীনতা ও গাম্ভীর্য সৃষ্টি হয় তত্ত্ববোধিনী

পত্রিকার মাধ্যমে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতিষ্ঠা। এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীতে ভাষাশিল্প ছিল সমুন্নত। শ্রুতিমধুর ও ওজস্বী গদ্য যে জ্ঞানবিজ্ঞান মূলক রচনার কত উপযোগী তত্ত্ববোধিনী তাহা প্রমাণ করিয়াছিল। রাজনারায়ণ বসু এবং অক্ষয়কুমার দত্ত জ্ঞানমূলক গদ্য-সাহিত্য সৃষ্টির পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫৮) প্রকাশ করিয়া জ্ঞানমূলক সাহিত্যের বনিয়াদ দৃঢ় করিয়াছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্র

বাংলা গদ্যসাহিত্যের স্বর্ণযুগ সূচিত হয় বঙ্কিমপ্রবর্তিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সাহায্যে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদর্শনের প্রতিষ্ঠা। 'বিদ্যোৎসাহিনী' (১৮৫৫), 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮), 'অবোধবন্ধু' (১৮৬৩) প্রভৃতি পত্রিকা ছাড়াও বালক, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গদর্শনের মত বিস্ময়কর ঔজ্জ্বল্য কাহারও ছিল না। বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি বঙ্গদর্শনেই প্রকাশিত হয়। প্রতিভাবান একদল লেখক এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া গোষ্ঠী রচনা করেন। 'নবপর্যায়' নাম দিয়া রবীন্দ্রনাথ এক সময় এই পত্রিকার সম্পাদনা করেন। বঙ্গদর্শনই ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাময়িকপত্র। তবে সাংবাদিকতা অপেক্ষা সাহিত্যিকতাই ছিল এই পত্রিকাখানির প্রধান লক্ষ্য। তাই সাহিত্যের সহিত সংযোগ সাধনে এই পত্রিকাখানির দানের মূল্য অপরিসীম।

বঙ্গদর্শন

৬। বাংলা সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাংলা গদ্যের বিকাশধারা নির্ণয় কর।

উত্তর। বাংলা গদ্যের বিকাশধারায় সংবাদপত্রের দান অনন্যসাধারণ। গদ্যভাষাকে সুশৃঙ্খল, সুসংযত এবং সর্বপ্রকার ভাব-বাহনের উপযোগী করিয়া তুলিবার পক্ষে সংবাদপত্রগুলির প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিসীম। খ্রীষ্টান মিশনারীদের দিগ্‌দর্শন, সমাচার দর্পণ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালের আনন্দবাজার, যুগান্তর প্রভৃতি সংবাদপত্রগুলি বাংলা গদ্যকে মার্জিত, শ্রুতিমধুর, সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য করিবার কাজ নিপুণ ভাবে সম্পাদন করিয়াছে ও করিতেছে। গদ্য ভাষায় শক্তিসঞ্চারের কার্যে সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা নিতান্ত তুচ্ছ নয়। সংবাদপত্র

গদ্যের শক্তি ও প্রকাশ-যোগ্যতা

প্রকাশের পূর্বে মিশনারীরা বাইবেলের অনুবাদে এবং খ্রীষ্ট-মাহাত্ম্য প্রচারের কাজে যে গদ্যভাষা ব্যবহার করিতেন তাহাতে শক্তি-সৌন্দর্য ত দূরের কথা, গুরুতর অন্বয়গত ত্রুটির জন্য সে-গদ্য ভাষা ভাল করিয়া বক্তব্যকে প্রকাশ করিতেও পারে নাই। গদ্য-ভাষার সে আড়ষ্টতা কাটিয়া যায় এবং ভাষার প্রবাহ স্বচ্ছ ও সাবলীল হইয়া উঠে সংবাদপত্র-সেবীদের হাতে। সাংবাদিকেরাই বাংলা গদ্যের বনিয়াদ গড়িয়া তোলেন।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাংলা ভাষায় সাময়িক পত্রের প্রথম সূচনা। সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকায় সংবাদ পরিবেষণ এবং ধর্মীয় বিতর্ক হইত। সমাজ-সংস্কার মূলক নানা প্রস্তাব এবং পরস্পরের দোষ দর্শনে গদ্যভাষাকে কিঞ্চিৎ বাঁকিয়া চুরিয়া লইতে হইত। মিশনারীদের 'সমাচারদর্পণ', রামমোহনের 'সম্বাদকৌমুদী' এবং ভবানীচরণের 'সমাচারচন্দ্রিকা' নানা মতবাদের ভিত্তিতে পরস্পর বিবদমান হইয়া বাংলা গদ্যের প্রকাশভঙ্গিকে ক্রমশঃ উন্নত করিয়া তোলে। ক্রমে এই সমস্ত পত্রপত্রিকায় জ্ঞানগর্ভ নানা বিষয় ও মৌলিক রচনা প্রকাশিত হইতে থাকে। পশ্বাবলী, বঙ্গদূত, সংবাদ-তিমিরনাশক, জ্ঞানান্বেষণ, বিজ্ঞান সেবধি প্রভৃতি নানা শ্রেণীর সংবাদপত্র বাংলা গদ্যের অনুশীলন করিয়া স্পষ্টই প্রমাণ করিয়া তোলে যে বাংলা গদ্যের মধ্যে প্রভূত শক্তি অন্তর্নিহিত হইয়া আছে এবং যোগ্য লোকের হাতে বাংলা গদ্য শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরচনার প্রমাণ দিতে পারিবে। ক্রমে সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে এবং মৌলিক সাহিত্য রচনার অভিনব উপকরণে বাংলা গদ্যের সম্ভার পূর্ণ হইতে থাকে। ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা প্রকাশের পরই সাহিত্যিক-গোষ্ঠী গদ্য সাহিত্য রচনায় তৎপর হন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাংলা দৈনিক পত্রের প্রকাশ। সেই পত্রের নাম 'সংবাদ প্রভাকর'। সম্পাদক কবি ঈশ্বর গুপ্তই একাধারে সাহিত্যসেবী এবং সাংবাদিকরূপে বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করিলেন।

ধর্মীয় বিতর্কে ও জ্ঞান-বিতরণে বাংলা গদ্য

সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাংলা গদ্যের বিভিন্ন রীতি এবং বিষয়-বিস্তার ঘটিতে থাকে। প্রবন্ধ-সাহিত্য, গল্প-উপন্যাস, রসরচনা, তত্ত্বালোচনা এবং সাহিত্যিক গবেষণার নানা দিক সাংবাদিকেরা তুলিয়া ধরেন। ঈশ্বরগুপ্ত সংবাদ পরিবেষণের সঙ্গে রাজনৈতিক সমালোচনা, সমাজ-সংস্কার, সাহিত্যচর্চা ও শিক্ষাপ্রসারে মনোযোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাকে কেন্দ্র

সংবাদ প্রভাকর

করিয়া রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত প্রতিভা সক্রিয় হইতে পারিয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা গদ্যের একটি গম্ভীর ভঙ্গি, যাহাকে সাধুভাষার ছাঁচ বলা যায় তাহা গড়িয়া উঠে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই তত্ত্ববোধিনীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তত্ত্ববোধিনীর স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। দার্শনিক চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক মননক্রিয়া বাংলা গদ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া অক্ষয়কুমার গদ্যশিল্পকে মর্যাদার আসনে তুলিয়া ধরেন। রম্যরচনার হালকা চালের ভক্তেরা অক্ষয়কুমারকে উপেক্ষা করেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী গোষ্ঠীতে রাজনারায়ণ ও অক্ষয়কুমার বাংলা গদ্যকে শালীনতা ও সৌষ্ঠবে মণ্ডিত করেন। বাংলা চলিত রীতিতে গদ্য ভাষার প্রবর্তন এবং কল্পনামূলক রচনায় বাংলা গদ্যের ব্যবহারকৌশল দেখাইলেন "মাসিকপত্রিকা" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র। 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে তিনি 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখিয়া বাংলা গদ্যকে নূতন পথে প্রবর্তিত করেন। বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' লিখিয়া বাংলা গদ্যের চলিত রীতির সাহিত্যিক উপযোগিতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

তত্ত্ববোধিনী

মাসিক পত্রিকা

বাংলা গদ্যের সমুন্নত মহিমা প্রকটিত হইয়া উঠে বঙ্কিমচন্দ্রের বিস্ময়কর প্রতিভার দিব্য জ্যোতিতে। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং ঐ পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া একদল সাহিত্যিক লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যসাহিত্যকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করিয়া দিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমের অনুপ্রাণনায় সঞ্জীবচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিক গোষ্ঠী বাংলা গদ্যকে উন্নতির শীর্ষস্তরে তুলিয়া লইয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রের 'সাধারণী', 'নবজীবন', 'প্রচার' প্রভৃতি পত্রিকায় বাংলা গদ্য শোভনসুন্দর রূপ লাভ করে।

বঙ্গদর্শন গোষ্ঠী

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি উৎকৃষ্ট সাময়িক পত্রের উদ্ভব ঘটে এবং গদ্যসাহিত্য আত্মনিষ্ঠ রচনায় কাব্যগুণান্বিত গদ্যরীতি উদ্ভাবিত করে। সাধনা, ভারতী, বালক প্রভৃতি পত্রিকার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অপর দিকে সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, সাহিত্য প্রভৃতি পত্রিকা, রবীন্দ্রনাথের

সম্পাদনায় নবপর্যায় বঙ্গদর্শন এবং আরও অনেক পত্রিকার দান উল্লেখযোগ্য। স্বল্প পরিসরে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান সম্ভব নয়। সর্বশেষে প্রথম চৌধুরী 'সবুজ পত্র' প্রতিষ্ঠা করিয়া চলিত গদ্যরীতির মাধ্যমে উচ্চতর মানসিকতা প্রকাশের পথ সুগম করিয়া দিলেন। সাময়িক পত্রের বিপুল ইতিহাস বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের প্রত্যেকটি স্তরে সংবাদপত্রই শক্তিশালী উপকরণ।

৭। মাসিক পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া সাধারণতঃ এক একটি লেখক-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গদর্শন, সাধনা ও ভারতী পত্রিকা অবলম্বনে যে লেখকগোষ্ঠী উদ্ভূত হয় তাঁহাদের পরিচয় দাও।

উত্তর। সাহিত্যে গোষ্ঠীচেতনা নিতান্ত আধুনিক কালের ব্যাপার নহে। সকল দেশেই সাহিত্য-সৃষ্টিতে দলগঠনের প্রবণতা আছে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ গোষ্ঠীচেতনা অতীতে ছিল এবং বর্তমানেও আছে। চর্যাপদ, বৈষ্ণবপদ, শাক্তপদ এবং বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য রচনায় গোষ্ঠী-গঠন হইত। তখন গোষ্ঠীবোধ জাগিত ধর্মসম্প্রদায়ের ভিত্তিতে। আধুনিক কালে সাহিত্যাদর্শ বা দার্শনিক মতবাদের পরিপ্রেক্ষায় দল গড়ে। সাম্প্রতিক কালে সাহিত্য রচনায় রাজনৈতিক চেতনাও দলবদ্ধ করে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ধারায় সাময়িক পত্রকে কেন্দ্র করিয়া লেখকগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল। সাংবাদিকতার মুখপত্রেই লেখকগোষ্ঠী তাঁহাদের মনোভাব ও মতবাদ প্রকাশ করিতেন। এইভাবে সেই যুগে সংবাদ প্রভাকর, বিদ্যোৎসাহিনী, জ্ঞানাঙ্কুর, বিবিধার্থসংগ্রহ, তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গদর্শন, বান্ধব, অবোধবন্ধু প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। এখানে কয়েকটি পত্রিকা-গোষ্ঠীর বিবরণ আলোচনা করা যাইতে পারে।

সাহিত্যে গোষ্ঠী-চেতনা

'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ। ইহার সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত এবং পৃষ্ঠপোষক এবং উপদেষ্টা ছিলেন মহর্ষি স্বয়ং এবং তাঁহার সহকারী রাজনারায়ণ বসু। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারই এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। মহর্ষি এবং রাজনারায়ণের ধর্মীয় বক্তৃতাগুলি ইহাতে প্রকাশিত হইত এবং অক্ষয়কুমার জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক নানাপ্রকার নিবন্ধ রচনা করিতেন। বাঙ্গালীর মনের সংকীর্ণতা দূর করিয়া বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্ববোধ জাগ্রত করিবার জন্য অক্ষয়কুমার ও তাঁহার অনুবর্তীরা

তত্ত্ববোধিনী-গোষ্ঠী

প্রভৃত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া একটি শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী গড়িয়া উঠে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি লেখকেরা বাংলা গদ্যের জড়তা দূর করিয়া, রচনায় বিষয়-বৈচিত্র্য আনিয়া রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্যসমালোচনা, রম্যরচনা প্রভৃতির প্রকাশে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মানসবিস্তৃতির পথ করিয়া দিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনীর সহিত সংশ্লিষ্ট রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিলাতী "পেনি"-ম্যাগাজিনের আদর্শে বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র মাসিকপত্র প্রবর্তন করেন। এই গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

বঙ্গদর্শন-গোষ্ঠী

তত্ত্ববোধিনীর দীর্ঘকাল পর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য সম্পাদনায় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গদর্শন বাঙ্গালীর হৃদয় লুঠ করিয়া লইয়াছিল। বাংলা গদ্যের একটি সুন্দর ছাঁদ গড়িয়া লইয়া বঙ্গদর্শনের লেখকগোষ্ঠী বিষয়বৈচিত্র্যে ও রসবৈচিত্র্যে বাঙ্গালী পাঠককে মুগ্ধ করে। বঙ্কিমচন্দ্র স্বনামে উপন্যাস ও কমলাকান্ত ছদ্মনামে রসরচনা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার অনুবর্তী লেখকগোষ্ঠী নানাবিষয়ক রচনাসম্ভারে বঙ্গদর্শনের কলেবরশোভা বর্ধন করিতেন। দেশের অতীত ইতিহাস ও প্রাচীন গৌরবের আলোচনায় যাহাতে বাঙ্গালীর আত্মসম্মানবোধ জাগে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বঙ্কিম লেখকগোষ্ঠীর চালনা করিতেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামদাস সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই ছিলেন শক্তিশালী লেখক। রাজকৃষ্ণ ও প্রফুল্লচন্দ্র সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিতেন। পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিতেন রামদাস সেন ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। অনেকে সাহিত্যসমালোচনাও করিতেন। প্রবন্ধসাহিত্যে বাংলা গদ্যের সমুন্নতি বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করিয়াই সম্ভাবিত হইয়াছিল। বঙ্কিমের অসুস্থতায় তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র কিছুদিন বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথ যখন সম্পাদনার ভার গ্রহণ করিলেন তখন পত্রিকাটির নাম হইল "নবপর্যায় বঙ্গদর্শন"। আধুনিক কালের সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্গদর্শন একটি বিরাট স্তম্ভস্বরূপ।

"ভারতী" পত্রিকার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ইহার প্রকাশ। ইহার লেখকগোষ্ঠীতে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, যতীন্দ্র বাগচি, শরৎকুমারী, কেশব সেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি। বাংলা কাব্যের স্বর্ণযুগ এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়াই গড়ে। এই পত্রিকার অনুষঙ্গী রূপে প্রকাশ করা হয় 'সাধনা' পত্রিকা। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় পত্রিকাটির প্রকাশ হয়। পরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ইহার সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির পথে যে মূল্যবান উপকরণগুলি জোগাইয়াছে তাহা উপচিত হইয়াছিল এই দুইটি পত্রিকাকে অবলম্বন করিয়াই। রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'কে তাঁহার নিজের "হাতের কুঠার" বলিতেন। সাহিত্যের কমনীয় মূর্তি তিনি ইহা দিয়াই গড়িয়াছিলেন। 'ভারতী' ও 'সাধনা' বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। বাংলা সাহিত্যে যত বিচিত্র প্রকাশকলা উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই এই পত্রিকাদ্বয়কে অবলম্বন করিয়া সূচিত হইয়াছিল। তাই আধুনিক সাহিত্যযুগের পর্যালোচনায় ভারতী ও সাধনা-গোষ্ঠীর প্রসঙ্গ অপরিহার্য।

ভারতী ও সাধনা গোষ্ঠী

৮। বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশধারায় রাজা রামমোহন রায়ের কৃতিত্বের পরিমাণ আলোচনা কর।

উত্তর। (বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশে খ্রীষ্টান মিশনারী এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।) তাঁহাদের রচিত ভিত্তিভূমিতেই বাংলা গদ্যের প্রতিষ্ঠা। (ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক অভ্যুদয়। তাহার পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই দেখা গেল যে গল্পে, উপন্যাসে, রসসাহিত্যে, সমালোচনায়, জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনায় বাংলা গদ্যসাহিত্য এত উন্নতি করিয়াছে যে সেইজাতীয় উন্নতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে ঘটে নাই। বিদেশীয়দের চেষ্টায় ও বিদেশীয় স্বার্থে যে গদ্যভাষার বিকাশ ঘটিল তাহা স্বদেশীয় মনীষীদের চেষ্টায় সৌষ্ঠবের ক্রান্তিলগ্নে উপনীত হয়। সেই চেষ্টায় যাঁহারা মনোযোগী হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন রাজা রামমোহন রায়।

রামমোহনের পূর্ববর্তী বাংলা গদ্য

মহাত্মা রামমোহন ছিলেন এক যুগন্ধর পুরুষ। ইনি বাঙ্গালী জাতির জন্য অনাগত কালের জয়বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর আত্মবিকাশের সমস্ত পথগুলি তিনি নিজের হাতে নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম ও সমাজসংস্কার

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একটানা বিশ বৎসর তিনি বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একাধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। দেশে তখন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-শোষণ, দেশ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, খ্রীষ্টান পাদরীরা হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে অগ্রণী। এমন সময় পুরুষ-সিংহ রামমোহনের আবির্ভাব। তিনি সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া, বিচারবিতর্ক-মূলক বহু প্রস্তাব রচনা করিয়া এবং শাস্ত্রগ্রন্থাদির অনুবাদ ও ভাবার্থ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালীকে আত্মস্থ ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

রামমোহন বস্তুতঃ সাহিত্যিক ছিলেন না। তিনি কালজয়ী সাহিত্য রচনা করিয়া অমরত্ব লাভের জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই। তাঁহার রচনাদি সমস্তই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সমাজকল্যাণ ও লোকহিতৈষণার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি গদ্যগ্রন্থ ও নিবন্ধাদি রচনা করেন। অনুবাদমূলক গ্রন্থ

গ্রন্থরচনা

বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫), বেদান্ত সার (১৮১৫), উপনিষদের অনুবাদ (১৮১৯) প্রকাশিত হইবার পর ধর্মীয় বিতর্কের জন্য তাঁহাকে স্বাধীনভাবে নিবন্ধাদি রচনা করিতে হয়। "উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার", "গোস্বামীর সহিত বিচার", "ভট্টাচার্যের সহিত বিচার", "সহমরণ-বিষয়ক-প্রবর্তক নিবর্তক সম্বাদ", "কবিতাকারের সহিত বিচার", "পথ্যপ্রদান", "সহমরণ বিষয়ক" প্রভৃতি কতকগুলি গদ্যরচনা প্রকাশ করেন। 'সম্বাদ কৌমুদী' ও 'ব্রাহ্মণ সেবধি' নামে দুইখানি সংবাদপত্রের সম্পাদকতাও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক। তিনি গায়ত্রী মন্ত্রের ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-মিশনারী-সম্বাদ, পাদ্রী শিষ্য-সম্বাদ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা দ্বারা তিনি বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম করেন। কিছু গান রচনা করিয়া তিনি ব্রহ্মসঙ্গীত (১৮২৮) প্রকাশ করেন। কিন্তু বাংলা গদ্যরীতি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বলিয়া ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

অনুবাদে, আলোচনায়, বিতর্কে ও মীমাংসায় বাংলা গদ্যের প্রয়োগ করিয়া রামমোহন বাংলা গদ্যকে আড়ষ্টতামুক্ত করিয়াছিলেন। গদ্যভাষার শিল্প-সৌন্দর্য অপেক্ষা ঋজুতা, সহজবোধ্যতা ও যুক্তিযুক্ততার দিকেই তিনি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া-

ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন, "দেওয়ানজী জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন। কিন্তু সে লেখায় শব্দের বিশেষ পারিপাট্য ও তাদৃশ মিষ্টত্ব ছিল না।" বস্তুতঃ সরলতা ও স্পষ্টতাই রামমোহনের গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য।

রামমোহনের গদ্যরীতি

এইজন্য অনেকে রামমোহনকে গদ্যভাষার জনক বলিয়া থাকেন। তাঁহার রচনাগুলি বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, বাকৃশিল্পের চমৎকৃতি অথবা কল্পনা-সৌন্দর্যের রমণীয়তার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বিষয়বস্তুর গভীরতা এবং প্রকাশের স্পষ্টতার দিকেই তিনি বেশি মনোযোগী হইয়াছেন। বাক্যগুলিকে তিনি নিরাভরণ ও পরিমিত করিয়াছেন। রচনার গুণগত উৎকর্ষ না থাকায় রামমোহন প্রথম শ্রেণীর প্রাবন্ধিকের গৌরব লাভ করেন নাই। কিন্তু সাহিত্যকর্মে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিলে তিনি যে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক হইতে পারিতেন তাহার সম্ভাবনাবীজ তাঁহার রচনায় দুষ্প্রাপ্য নহে।

ভাষার প্রধান গুণ সহজবোধ্যতা ও প্রকাশের সাবলীল প্রাঞ্জলতা। এই গুণ রামমোহনের রচনায় প্রচুর পরিমাণে ছিল বলিয়া তিনি পরবর্তী বাংলা গদ্যশিল্পে অপরিমেয় প্রভাব রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমকালীন লেখকদের মধ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় "কলিকাতা কমলালয়" লেখেন এবং গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার "স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক" লেখেন। ইহা ছাড়া উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের "পাষণ্ডপীড়ন"। এই সব গদ্যগ্রন্থের ভাষা অনেক মার্জিত এবং সাহিত্যগুণযুক্ত। রামমোহনের সুস্পষ্ট প্রভাবে তত্ত্ববোধিনীর সাহিত্যিকগোষ্ঠীর ভাষা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। তাহাতে বুঝা যায় যে এই রামমোহন বাংলা গদ্যের এমন একটি 'গ্রানিট স্তর' নির্মাণ করিয়াছিলেন যে পরবর্তী প্রতিভাবানেরা অনায়াসে বা অল্পায়াসে দিব্য সৌধ নির্মাণ করিতে পারিয়াছিলেন।

গদ্যশিল্পে রামমোহনের প্রভাব

৯। বাংলা গদ্যসাহিত্যে অক্ষয়কুমার দত্তের দানের পরিমাণ আলোচনা কর।

উত্তর। বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশধারায় অক্ষয়কুমার দত্তের দান অনন্যসাধারণ। বাংলা গদ্যকে সংযত, গম্ভীর এবং যুক্তিনিষ্ঠ করিবার উপযোগী উপকরণে

সজ্জিত করিয়া ইনি সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমারের জন্ম। ইনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমবয়সী। বাল্যকাল হইতেই আবেগবর্জিত জ্ঞানপিপাসায় যুক্তিনিষ্ঠ অক্ষয়কুমার কেবল বুদ্ধিকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান ও দর্শনে ছিল তাঁহার গভীর অনুরাগ। তরল ভক্তিবাদে তাঁহার আস্থা ছিল না। বেদকে তিনি অপৌরুষেয় এবং অভ্রান্ত মনে করিতেন না, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার উপযোগিতা বোধ করিতেন না। সেইজন্য কেহ কেহ তাঁহাকে অজ্ঞেয়তাবাদী বা নিরীশ্বরবাদীও বলিতেন। প্রথম যৌবনে তিনি জেফ্রয় নামক একজন জার্মান শিক্ষকের কাছে গণিত, বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনাদি পাঠ করেন। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন।

অক্ষয়কুমারের ব্যক্তি-পরিচয়

অক্ষয়কুমার ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর শিক্ষকতা করিতেন। ঈশ্বর গুপ্ত এই অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়া অক্ষয়কুমার ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর তিনি গভীর নিষ্ঠার সহিত তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিতে থাকেন। পত্রিকাটির উন্নতির জন্য অক্ষয়কুমার তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, শ্রম ও মনোযোগ সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। সংশ্লিষ্ট সকলেই তাঁহার অক্লান্ত কর্মনিষ্ঠার অজস্র প্রশংসা করিতেন। ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা, চিন্তার স্বাধীনতা ও বুদ্ধিবাদের প্রতিষ্ঠা দ্বারা অক্ষয়কুমার তরুণ সমাজের মহৎ উপকার করিয়াছিলেন এবং সংবাদ-পত্র পরিচালনার একটি নিখুঁত আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন।

তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদকতা

অক্ষয়কুমার বিশুদ্ধ রসসাহিত্য রচনা করেন নাই। তাঁহার রচনা শিক্ষামূলক এবং জ্ঞান প্রচারের স্পষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া লেখা। তিনি অনেকগুলি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। তিনি 'ভূগোল' গ্রন্থ লেখেন ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে। ইহাই তাঁহার প্রথম গ্রন্থ। অবশ্য 'অনঙ্গমোহন' নামে আদিরসাত্মক একখানি কাব্য প্রথম তারুণ্যে লিখিয়া পরবর্তীকালে লজ্জাবশে উহার প্রচার বন্ধ করেন। তিন খণ্ডে প্রকাশিত 'চারুপাঠ' এবং 'পদার্থবিদ্যা' জ্ঞানমূলক বিষয় অবলম্বনে লেখা ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ। অক্ষয়কুমারের মনীষা, জ্ঞান-

সাহিত্য-রচনা

পিপাসা এবং ভাষাশিল্পের পরিচয় ফুটিয়াছে তাঁহার পরবর্তী অনুবাদমূলক গ্রন্থাবলীতে। কুম্বের লেখা Constitution of Man গ্রন্থাবলম্বনে তিনি ১৮৫১ এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে দুই খণ্ডে "বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" নামক গ্রন্থ লেখেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ধর্মনীতি' নামক গ্রন্থখানিও কুম্বের Moral Philosophy গ্রন্থের অনুসরণে লেখা। তাহার পর প্রকাশিত হয় অক্ষয়কুমারের বিখ্যাত গ্রন্থ "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়"। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৩ তে। এই গ্রন্থখানি রচনায় তিনি আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন উইলসন সাহেবের The Religious Sects of the Hindoos. উইলসন ৪৫টি ভারতীয় ধর্ম সম্প্রদায়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার শ্রমসাধ্য গবেষণা ও ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৮২টি সম্প্রদায়ের ও উপসম্প্রদায়ের সাধন তত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়াছেন।

অক্ষয়কুমার-রচিত বহু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনীর পৃষ্ঠায় সংগুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বহু লিখিত প্রবন্ধ অমুদ্রিত অবস্থায় পাণ্ডুলিপি আকারেও পড়িয়া ছিল। সারবান্ সাহিত্যের প্রতি বাঙ্গালীর অনাগ্রহ এবং অক্ষয়কুমারের ভাষায় সরল লালিত্যের অভাব থাকায় তাঁহার রচনা বহুল প্রচারিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র "প্রাচীন হিন্দুদের নৌযাত্রা" নামে একখানি পুস্তকে কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া হিন্দুদের বহির্বাণিজ্য এবং সম্প্রসারণশীলতার অনেক তথ্য প্রকাশ করেন। সঙ্কীর্ণতা ও কূপমণ্ডূকতায় বিশীর্ণ হিন্দুসমাজের পক্ষে ঐ তথ্যগুলি বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

প্রবন্ধাবলী

অক্ষয়কুমারের রচনাবলী আয়তনে ব্যাপক নয়, বিশুদ্ধ সাহিত্যিক প্রেরণায়ও ঐগুলি রচিত হয় নাই। তাই তিনি ভাষাশিল্পে বাঞ্ছিত সাবলীলতা অর্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভাষা ছিল অতিরিক্ত সমাসবদ্ধ এবং তৎসম শব্দের সমারোহে পূর্ণ। যুক্তিনিষ্ঠতার জন্য তিনি ভাষায় আবেগমূলক রস সঞ্চার করিতে পারেন নাই। প্রাঞ্জলতা, সরলতা এবং সুখ-উচ্চার্যতায় ভাষার মধ্যে তিনি নমনীয় সৌন্দর্য ফুটাইতে পারেন নাই; হয়ত চেষ্টাও করেন নাই। অজিতকুমার চক্রবর্তী বলিয়াছেন, "অক্ষয়বাবু 'বাহ্যবস্তু ও তাহার সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' লিখিবার সময় 'জিগীষা, জুগুপ্সা, জিজীবিষা' প্রভৃতি বিভীষিকাপূর্ণ শব্দের সৃষ্টি করিতেছিলেন। তখন শুনা যায়

গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য

যে কলিকাতার শিক্ষিত লোকের বাড়ীতে ঐ সব শব্দের সঙ্গে 'চিড্‌টীমিষা' প্রভৃতি শব্দ যোগ করিয়া হাসাহাসি হইত।" ইহাতে বুঝা যায় যে অক্ষয়কুমারের ভাষায় সংস্কৃত বাক্যভঙ্গি ও ব্যাকরণানুগ শব্দ প্রযোগের প্রাবল্যে রচনায় সৌন্দর্য ও সুষমার সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞানগর্ভ রচনা প্রকাশের জন্য ভাষায় যে শক্তি প্রয়োজন অক্ষয়কুমার গদ্য ভাষায় সেই শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন।

১০। বাংলা গদ্যের বিকাশে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দানের বৈশিষ্ট্য কি? তাঁহাকে 'বাংলা গদ্যের জনক' কি অর্থে বলা হইয়াছে?

উত্তর। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলাদেশের সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষা-বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি সাহিত্যিক খ্যাতি লাভ করার জন্য লেখনী ধারণ করেন নাই। তবু তিনি বাংলা সাহিত্যের একটি দিক্‌পাল এবং বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে একটি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁহার জন্ম। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর পূর্বকাল পর্যন্ত তিনি একনিষ্ঠ সাধনায় বাঙ্গালী জাতির হিতকর কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়া ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের বিশেষত্ব

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসাধারণ মেধা এবং অপূর্ব কর্মনিষ্ঠা বলে তিনি জাতির জীবনে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র গোড়ামি ছিল না। তিনি তৎকালীন সর্বপ্রকার প্রগতিমূলক আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। জাতীয় কল্যাণের জন্য তাঁহার কৃত কার্যগুলির মাধ্যমে তি ন বাংলা গদ্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন এবং পরবর্তী ইতিহাসে 'বাংলা গদ্যের জনক' আখ্যা পাইয়াছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের রচনাসম্ভার নিতান্ত কম নয়। তাঁহার অধিকাংশ রচনাই শিক্ষামূলক, শিশুপাঠ্য এবং সংস্কৃত, ইংরাজী ও হিন্দুস্থানী হইতে অনুবাদ। শোনা যায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকরূপে তিনি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাগবতের কৃষ্ণলীলা অবলম্বনে 'বাসুদেব চরিত' নামে গ্রন্থ লেখেন। ঐ বৎসরই হিন্দী 'বৈতাল পচ্চীসী' অবলম্বনে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' রচনা করেন। নিজের হিন্দী ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষার জন্যই তিনি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুসরণ করেন নাই।

রচনাসম্ভার অনুবাদমূলক

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 'শকুন্তলা', ১৮৬০-এ 'সীতার বনবাস' এবং ১৮৬৯ সালে

সেকস্‌পীয়রের Comedy of Errors অবলম্বনে 'ভ্রান্তিবিলাস' রচনা তাঁহার শ্রেষ্ঠ অনুবাদসাহিত্য রচনা। ভবভূতির নাটক 'উত্তররামচরিত' এবং বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে লেখা 'সীতার বনবাস' বিদ্যাসাগরের বিস্ময়কর কীর্তি। ইহা ছাড়া তিনি মার্শম্যানের অনুসরণে 'বাংলার ইতিহাস', চেম্বার্সের অনুসরণে 'জীবন চরিত' এবং 'বোধোদয়' রচনা করেন। তাঁহার 'কথামালা' রচিত হয় ঈশপের গল্পের অনুকরণে। সাহিত্যের বনিয়াদ গঠনের জন্য এবং গদ্যভাষার শক্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্যাসাগর অনুবাদকর্মকেই তৎকালের পক্ষে হিতকর মনে করিয়াছিলেন। এই কার্যে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসংস্কারের প্রয়োজনে কিছু মৌলিক সাহিত্যও রচনা করেন। সেই রচনাগুলি প্রধানতঃ প্রবন্ধ জাতীয় এবং সাধু গদ্যভাষায় সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার সূচনা বলা যাইতে পারে। ১৮৫৩ সালে তিনি সাহিত্যের ইতিহাস লেখায় সূচনা করেন "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থ রচনা দ্বারা। পর পর দুইটি খণ্ডে লেখেন "বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" এবং "বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার।" রচনাগুলির লম্বা শিরোনাম বক্তব্যকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দেয়। প্রবন্ধ সাহিত্যে ভাষার স্পষ্টতা যে কত প্রয়োজন বিদ্যাসাগরের এই রচনা তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। মননশীল প্রবন্ধ ছাড়া তিনি অনুভূতিপ্রবণ আবেগময় রচনায় এবং ব্যঙ্গকৌতুকের রচনা-শিল্পেও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। শেষ জীবনে তিনি 'আত্মচরিত' রচনা করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। বন্ধুর বালিকা কন্যা প্রভাবতীর অকালমৃতুতে ব্যথিত হইয়া 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' লিখিয়াছিলেন। ইহা হৃদয়-ভাবমূলক মৌলিক রচনা। সামাজিক ব্যাপারে বিতর্ক উপস্থিত হওয়ায় তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে তিনি ছদ্মনামে লেখনী ধারণ করেন। 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয় "অতি অল্প হইল", "আবার অতি অল্প হইল" এবং "ব্রজবিলাস"। "রত্নপরীক্ষা" নামে যে কৌতুক রচনা প্রকাশিত হয় তাহার লেখক 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্য'। রচনাগুলির নামেই বুঝা যায় যে ইহা লঘু কৌতুকে পূর্ণ সরস রচনা। এই ব্যঙ্গরচনাগুলি সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলিয়াছেন, "এরূপ উচ্চ অঙ্গের রসিকতা বাংলা ভাষায় অতি অল্পই আছে।"

মৌলিক রচনা

বিদ্যাসাগরের রচনারীতির সর্বাপেক্ষা বড় গুণ অন্বয়-সৌন্দর্য ও প্রাঞ্জলতা। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের রচনারীতির অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত করিয়া সুষমাময় করিয়াছেন বলিয়া বিদ্যাসাগরকে রবীন্দ্রনাথ সাধুবাদ দিয়াছেন। গদ্যের মধ্যেও যে ছন্দ থাকে, বাক্যাংশ বিন্যাসের কৌশলে এবং যথাস্থানে যতি দিয়া পাঠ করিলে বাংলা গদ্য যে ধ্বনিঝঙ্কারে সুশ্রাব্য এবং সহজবোধ্যতায় হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে, বিদ্যাসাগর তাহা মর্ম দিয়া বুঝিয়াছিলেন। তাই তিনি গদ্য-রচনাকে শুধু মননশীলতার ক্ষেত্রে আবদ্ধ না রাখিয়া হৃদয়ের সুকুমার অনুভূতি প্রকাশের উপযোগিতা দিয়াছিলেন। বাংলা কথাসাহিত্যের সৃষ্টি ও রসরচনার বিকাশ বাংলা গদ্যরীতিতে সম্ভাবিত করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন।

গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য

বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনকত্বের গৌরব দান করা হইয়া থাকে। তিনি গদ্যভাষার সৃষ্টি করেন নাই, একথা সত্য। তাঁহার বহু পূর্বেই খ্রীষ্টান মিশনারী, ফোর্ট উইলিয়মের অধ্যাপকবৃন্দ এবং রামমোহন রায় বাংলা গদ্যসাহিত্যের ভিত্তি রচনা করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই বাংলা গদ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাসাগরের রচনাকাল উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। সুতরাং ঐতিহাসিক বিচারে জনকত্বের দাবী তাঁহার নয়। তবু তিনি নৈতিক অর্থে বাংলা গদ্যরীতির জনক। তাঁহার উদ্ভাবিত গদ্যরীতি বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পর্যন্ত অনুসৃত। বাংলা গদ্যের সাধুরীতিতে উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সৃষ্টির সম্ভাবনা সূচিত করিয়াছিলেন বলিয়া ইনি বাংলা গদ্যের জনকত্বের দাবী করিতে পারেন। জন্মদান ও প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াই জনকত্ব লাভ হয়। বিদ্যাসাগর পরম স্নেহে বাংলা গদ্যকে লালন করিয়াছেন এবং ইহার মধ্যে যৌবনশক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। তাই তাঁহাকে জনকের সম্মান অর্পণ করা কোনক্রমেই অযৌক্তিক নয়।

বাংলা গদ্যের জনকত্ব

১১। রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে গদ্য-সাহিত্যের ভিত্তি রচনায় কাঁহার কৃতিত্ব কতটুকু তাহা, আলোচনা কর।

উত্তর। বাংলা গদ্যসাহিত্য উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেই চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজের মধ্যে সূচিত হয়। তাহার পর খ্রীষ্টান মিশনারী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকগোষ্ঠীর হাতে বাংলা গদ্যের প্রাথমিক বনিয়াদ গড়িয়া উঠে।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় যে ভিত্তি রচিত হয়, পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তাহার অদ্ভুত সমুন্নতি ঐতিহাসিককে বিস্মিত করিয়া তোলে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে, সমালোচনায় ও রসসাহিত্যে বাংলা গদ্য এত উন্নতস্তরে উন্নীত হইয়াছিল যে এইরূপ উন্নতির দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অপরাপর ভাষার গদ্যসাহিত্যে দেখা যায় না। এত অল্প সময়ে এত উন্নতি খুবই বিস্ময়কর। যাঁহাদের প্রতিভার দানে বাংলা গদ্যের সাহিত্যিক সৌষ্ঠব ক্রান্তিলগ্নে উপনীত হইয়াছিল রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। এই মনীষিত্রয় বিভিন্ন দিক হইতে বাংলা গদ্যকে সম্পূর্ণতার পথে প্রবর্তনা দিয়াছিলেন।

বাংলা গদ্যের প্রাথমিক ভিত্তি

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন যুগন্ধর পুরুষ। তিনি বিশ বৎসরের সাধনায় বাঙ্গালী জাতির জন্য অনাগত কালের বিজয়মুকুট আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রামমোহন অভূতপূর্ব বিপ্লব আনয়ন করেন। তখন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল। খ্রীষ্টান মিশনারীরা হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে তৎপর। এমন সময় রামমোহন দৃঢ় হস্তে লেখনী ধারণ করিয়া প্রবন্ধ-পুস্তিকা ও সংবাদপত্রের সাহায্যে বাঙ্গালী জাতিকে আত্মস্থ হইবার পথ দেখাইয়াছিলেন। রামমোহন সাহিত্যরচনার জন্য বাংলা গদ্যের সেবা করেন নাই। তাই গদ্য ভাষার শিল্প-সৌন্দর্য বিধান অপেক্ষা ঋজুতা ও প্রাঞ্জলতার দিকেই মনোযোগ দিয়াছিলেন। বাংলা গদ্যে সরলতা ও সহজবোধ্যতা আনিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে তাঁহাকে বাংলা গদ্যের জনক বলিয়াছেন। কিন্তু গদ্যের শিল্পিত ও প্রসাধিত রূপায়ণ অপেক্ষা বলিষ্ঠতা ও বিষয়নিষ্ঠতার দিকেই তাঁহার অনুরাগ ছিল বেশী। বেদান্তগ্রন্থ, গায়ত্রীর ব্যাখ্যা, ভট্টাচার্য-গোস্বামী-শাস্ত্রীর সহিত বিচার প্রভৃতি রচনায় তিনি নিরাভরণ গদ্যের বলিষ্ঠ সৌন্দর্য প্রকটিত করিয়াছেন। বাগ্‌বাহুল্যবর্জন এবং পরিমিতিবোধ তাঁহার রচনার উল্লেখযোগ্য গুণ। তিনি বাংলা গদ্যকে গ্রানিট স্তরের উপর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার প্রভাবে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গদ্যশিল্পীরা গদ্য-সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন।

রামমোহনের দান

রামমোহনের অব্যবহিত পরেই বাঙ্গলা গদ্যকে শিল্পসম্মত রূপ দিবার দায়িত্ব যিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর.

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম রূপে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে গৌরবের আসনে বসাইয়া জাতির আত্মপ্রকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় বুদ্ধির প্রাখর্য ও মনীষার দীপ্তি অপেক্ষা হৃদয়ধর্মের কোমলতা বেশী। তিনি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের সম্মুখে রাখিয়াই গদ্যসাহিত্য রচনায় হাত দিয়াছিলেন। ছাত্রপাঠ্যরূপেই তিনি বাসুদেবচরিত এবং বেতাল পঞ্চবিংশতি লিখিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ রচনাই অনুবাদ। সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্য হইতে হৃদয়-ধর্মের অনুকূল গ্রন্থই তিনি অনুবাদের জন্য নির্বাচন করেন। গদ্যভাষাকেও তিনি হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য শিল্পসুন্দর মূর্তি দিবার চেষ্টা করেন। ভাষাকে ভাবানুগত করিবার জন্য যথাস্থানে যতিবিন্যাস করিতেন। তাহাতে ভাষায় সুষমা সঞ্চার হইত। সেই ভাষা শুধু বিতর্কমূলক গদ্য-প্রবন্ধেই নয়, হৃদয়ভাব প্রকাশক রস-সাহিত্য রচনারও উপযোগী হইয়াছিল। আসল কথা, গল্প লেখার ভাষা তিনি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। 'শকুন্তলার' ভাষা যেমন লঘুভার, সংলাপগুলিও বেশ নাটকীয়। 'সীতার বনবাসে' তৎসম শব্দের শ্রুতিমধুর সমাবেশ, সাধুরীতির চরমোৎকর্ষ। পরবর্তীকালে কথাসাহিত্যের সমৃদ্ধির মূলে বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির দান অনেকখানি। এইজন্য তিনি গদ্যরীতির জনকত্বের দাবী করিতে পারেন।

বিদ্যাসাগরের দান

বিদ্যাসাগরেরই সমসাময়িক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। ইনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইনি ছিলেন বুদ্ধিজীবি, যুক্তিবাদী জ্ঞানতপস্বী। চিন্তাগত চপলতা ও ভাবালুতাকে তিনি কখনও প্রশ্রয় দেন নাই, যুক্তি ও মননশীলতাকে অন্তরের অন্তস্তলে ধ্রুব আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানব-জীবনে তিনি জ্ঞানার্জন বৃত্তিকেই প্রাধান্য দিতেন। তাঁহার গদ্যরচনায় তাই জ্ঞানগম্ভীরতার ওজঃগুণ। বাংলা গদ্যে শব্দগত জৌলুস সৃষ্টি করিয়া ভাষাকে গম্ভীর ও মহৎ ভাব প্রকাশের উপযোগী করিতে চাহিয়াছিলেন। ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, ধর্মনীতি, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রভৃতি গ্রন্থে এবং তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধে তিনি ভাষাকে কোথাও তরল বা লঘু হইতে দেন নাই। প্রচুর তৎসম শব্দ, সমাসবদ্ধ পদ এবং মিশ্র বা জটিল বাক্যের বেড়াজাল রচনা করিয়া পাণ্ডিত্যের ব্যাপকতা দেখাইতেন। অক্ষয়কুমার শ্রুতিমধুর ও সুখোচ্চার্য ভাষা ব্যবহার করিতেন না। কিন্তু তাঁহার ভাষার বনিয়াদ ছিল

অক্ষয়কুমার দত্তের দান

সুদৃঢ়। ঐ বনিয়াদের উপর জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসাদ নির্ভয়ে নির্মান করা যাইত।

রামমোহন বাংলা গদ্যে আনিয়াছেন সাবলীলতা। অক্ষয়কুমার দিয়াছেন সৌষ্ঠব, গাম্ভীর্য ও ধ্বনি-বৈচিত্র্য। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলা গদ্যে দিয়াছেন ছন্দোলালিত্য, সুষমা ও মাধুর্য। মতবাদ প্রতিষ্ঠায় ও জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে রামমোহন ও অক্ষয়কুমারের ভাষা আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছিল। পরবর্তীকালের প্রবন্ধকারেরা অক্ষয়কুমারের ভাষার কাঠামো অবলম্বন করিয়াছিলেন। কথাসাহিত্যের রচনায় সাগরী-ভাষারই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই তিনজন বাঙ্গালী জাতির জন্য গদ্য সাহিত্যের ভূমি কর্ষণ করিয়াছেন, আবর্জনা উৎসাদন করিয়াছেন, জলসেচন ও বীজবপন করিয়াছেন। তাই বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয় ত্বরান্বিত হইয়াছে। আজ আমরা যে সাহিত্যসৌধে বাস করিতেছি তাহার ভিত্তি গড়িয়াছিলেন এই মনীষিত্রয়।

ত্রয়ীর ত্রিবিধ দান

১২। বাংলা গদ্যভাষার উন্নতিকল্পে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃতকার্য কতটা হিতকর হইয়াছিল তাহা মহর্ষির কর্ম ও রচনার উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দাও।

উত্তর। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা প্রিন্স দ্বারকানাথ বিখ্যাত ধনী ছিলেন। প্রচুর ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রতি পালিত হইলেও দেবেন্দ্রনাথ আবাল্য ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তাঁহার মনের গঠনে বিশুদ্ধ ভক্তিবাদ ও যুক্তিবাদের সার্থক সমন্বয় হয়। তাই তিনি রামমোহনের পথ ধরিয়া বেদোক্ত হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠায় এবং সমাজ সংস্কারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত রচনাবলী এই জন্যই ধর্ম সম্বন্ধীয়। তিনি শিক্ষা বিস্তারে অগ্রসর হইয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায়ও তিনি অগ্রণী হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের কাজে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। ধর্মের মূল তত্ত্ব সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ধার করিয়া সহজ বাংলায় প্রকাশ করিবার জন্য তিনি প্রভূত চেষ্টা করেন। বেদ অভ্রান্ত কিনা তাহা প্রমাণের প্রচেষ্টা করেন এবং ঋগ্বেদের অনুবাদ আরম্ভ করেন। পরে এই কাজে তিনি আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার

মহর্ষির কর্মজীবন

প্রতিষ্ঠা। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি অক্ষয়কুমার দত্তকে সম্পাদক নিযুক্ত করেন। তত্ত্ববোধিনীর লেখকগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া বাংলা গদ্যের একটি সাধু ছাঁদ নির্মানের কাজে তাঁহার দান অপরিসীম। ব্রাহ্মধর্মের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য প্রতিপাদনে লেখনী ও মনোযোগকে নিত্যব্যস্ত রাখিতেন বলিয়া তিনি সাহিত্যিক খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার পুত্রগণ সাহিত্যের দিকপালরূপে বাঙ্গালী জাতি ও বাংলা দেশকে গৌরাবান্বিত করিয়াছিল।

মহর্ষির সাহিত্যকৃতিকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করিয়াছে তাঁহার আত্মজীবনী। ১৮ বৎসর হইতে ৪১ বৎসর পর্যন্ত নিজের জীবনকথা লিখিয়া প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে দান করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশ করিতে নির্দেশ দেন। গদ্য ভাষা-রীতির অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আত্মজীবনীর পাতায় পাতায় ছড়াইয়া আছে।

মহর্ষির সাহিত্য-কৃতি

সাত্ত্বিক ভাব ও সাত্ত্বিক মন লইয়া ধর্ম সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনাগুলি করিয়াছেন ভাষাশিল্পের ইতিহাসে তাহাও উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। তাঁহার রচিত ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ (১৮৫০), আত্মতত্ত্ববিদ্যা (১৮৫২), ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস (১৮৬০), কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা (১৮৬২), ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান (১৮৬৬), জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি (১৮৯৩) প্রভৃতি পুস্তকগুলি তাঁহার সাহিত্যিক কৃতিত্বের অপূর্ব নিদর্শন। ধর্মীয় বিতর্ক এবং ধর্মান্দোলনের মধ্য দিয়া তিনি বাংলাভাষার প্রকাশযোগ্যতাকে শতগুণে বর্ধিত করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথকে লইয়া তিনি যে সাহিত্যিকগোষ্ঠী গড়িয়াছিলেন তাহা বঙ্গদর্শনগোষ্ঠী অপেক্ষা কম শক্তিশালী ছিল না। শিল্পসম্মত বাংলাগদ্যের জনয়িতারূপে মহর্ষির কৃত কার্য চিরকাল ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।

১৩। বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশধারায় মনস্বী রাজনারায়ণ বসুর দানের পরিমাণ নির্ণয় কর।

উত্তর। মনস্বী রাজনারায়ণ ব্রাহ্মধর্মের একজন নেতা ছিলেন এবং আজীবন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুবর্তীরূপে এই অসাধারণ মেধাবী ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে বোড়াল গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও মধুসূদনের সমসাময়িক কালে তিনি হিন্দুকলেজের সেরা ছাত্র ছিলেন এবং পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইংরাজী সাহিত্যে কৃতবিদ্য

হইয়াছিলেন। কিন্তু বিলাতী শিক্ষা রাজনারায়ণের জাতীয়তাবোধকে তীব্রতর করিয়াছিল। তৎকালে তাঁহার মত জাতীয়তাবাদী স্বদেশপ্রাণ খাঁটি বাঙ্গালী খুব বেশি ছিল না। বাঙ্গালীর ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য ইনি নিজের সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে জাতীয়ভাব উদ্দীপন করিবার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দুমেলা স্থাপন, জাতীয়ভাব সঞ্চারিণী সভা প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান তাঁহার আদর্শ দ্বারা উদ্বোধিত। ঠাকুরবাড়ীর সর্বপ্রকার সংস্কৃতিমূলক কর্মে তিনি প্রাণপুরুষের মত বিরাজ করিতেন। প্রথম অবস্থায় মহর্ষির নিয়োজিত কর্ম করেন, পরে সরকারী শিক্ষকতা কাজ গ্রহণ করিয়া মেদিনীপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ধর্মভাব ও জাতীয়তা প্রচারের জন্য তিনি আজীবন লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন। সাহিত্য-সমালোচনায়ও তিনি দক্ষ ছিলেন। তৎকালীন শিক্ষিত সমাজে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া তিনি শেষ জীবন বৈদ্যনাথধামে যাপন করেন।

রাজনারায়ণের কর্মজীবন ও আদর্শ

রাজনারায়ণ উৎকৃষ্ট গদ্যশিল্পী ছিলেন। মননশীল প্রবন্ধ রচনায় এবং আত্মনিষ্ঠ রসরচনায় তিনি সমান দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার গদ্যরীতি তাঁহার ব্যক্তিত্বের স্পর্শে সমুজ্জ্বল। তাঁহার ধর্মীয় বক্তৃতাদিতে চমৎকার ভক্তিভাব প্রকটিত হইয়াছে, জাতীয়ভাব উদ্দীপক প্রবন্ধাবলীতে সমাজকল্যাণের ইচ্ছা ও মানবপ্রীতি অভিব্যক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধীয় তাঁহার বক্তৃতাবলী 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' (১৮৭৩) তাঁহার বিখ্যাত রচনা। 'আত্মীয়-সভার বিবরণ' অতি উপাদেয় সাহিত্য—অবশ্য পাশ্চাত্ত্য আদর্শে লেখা। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৬) নামক গ্রন্থে তিনি বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়া সাহিত্যানুরাগ ও রসবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' গ্রন্থে জাতীয়তার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থে ভাষার লালিত্য এবং যুগের বিচার এমনই চমৎকার যে তৎকালীন মনীষীরা সকলেই সাগ্রহে ইহা পাঠ করিয়াছেন। আজিও ভাষাশিল্পের নিদর্শনরূপে গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য। 'গ্রাম্য উপাখ্যান' নামে একটি গ্রন্থে তিনি ছদ্মভাবে নিজের গ্রাম ও গ্রাম্য পরিবেশের বাস্তবচিত্র আঁকিয়াছেন। তাঁহার 'আত্মচরিত' তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত অপূর্ব গ্রন্থ। তিনি 'জ্যাঠামি' এবং 'জীবনপ্রান্তোপনীতের জীবন' নামে দুইটি রসরচনা

সাহিত্য-ভাণ্ডারে রাজনারায়ণের দান

প্রকাশ করিয়া রম্যরচনার সূত্রপাত করেন। তিনি একান্তভাবে সাহিত্যসেবী ছিলেন না। তবু তাঁহার দানে বাংলা গদ্যসাহিত্যের ভাণ্ডারে রত্নসমাবেশ ঘটিয়াছে।

১৪। বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের রচনার মূল্য নিরূপণ কর।

উত্তর। হিন্দু কলেজের খ্যাতিমান ছাত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায় ইয়োরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক বিস্ময়কর দান। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম এবং তিনি মধুসূদন দত্তের সহপাঠীরূপে হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াও ভারতীয় ধর্ম ও সামাজিক আদর্শ হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নাই। দুই বিপরীতমুখী আদর্শকে ব্যক্তিচরিত্রের মধ্যে সংহত করিয়া ভূদেব তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে জাতীয় জীবনের উন্নতির পথ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমসাময়িক ফিরিঙ্গি আদর্শ ও আর্যামি দুই প্রান্তসীমায় থাকিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্তে প্রবল ভাবদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। স্থিতধী ভূদেব জাতীয় জীবনের এই সংকটমুহূর্তে দৃঢ় হস্তে লেখনী ধারণ করিয়া জাতিকে আত্মস্থ হইবার পথ দেখাইয়াছিলেন। তিনি রসসাহিত্য ও রম্যরচনা দ্বারা সাহিত্যভাণ্ডারের গৌরব বৃদ্ধি করেন নাই সত্য, কিন্তু জাতির মানসলোকে বুদ্ধির বিচার ও মননের গভীরতা সঞ্চার করিয়া সামাজিক কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে থাকিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষায় কৃতবিদ্য হইয়া ভূদেব সংযম ও যুক্তিনিষ্ঠার পরিচয় যেমন দিয়াছেন ব্যক্তিচরিত্রে, তেমন দিয়াছেন গদ্যরীতিতে। আবেগহীন যুক্তি এবং নির্ভুল তথ্যের পরিবেষণ দ্বারা প্রবন্ধ রচনার প্রবর্তয়িতারূপে ভূদেব চিরকাল সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

ব্যক্তি-পরিচয়

বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতির প্রতি ভূদেবের অনুরাগ ছিল গভীর। তিনি মনে করিতেন যে ব্যক্তিচরিত্রের শুদ্ধতাসাধন এবং সামাজিক জীবনে কল্যাণবোধ মানুষের মনুষ্যত্বের প্রাথমিক বিষয়। জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সমাজ ও পরিবার গঠন করা আবশ্যক। ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে যুক্তিসম্মত উপায়ে তিনি তাঁহার বক্তব্য বিষয়গুলিকে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা উল্লেখযোগ্য হইয়া রহিয়াছে। প্রথমতঃ তিনি ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল শিক্ষাবিভাগের কার্যে নিযুক্ত থাকায় দেশের শিক্ষাগত

পাঠ্যগ্রন্থ রচনা

ক্রটির দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, পুরাবৃত্তসার, ইংলণ্ডের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস, ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থগুলি মৌলিক বা স্বাধীন রচনা নহে, ছাত্রদের জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রচনা। ইহাদের মধ্যে ভূদেবের সাহিত্যিক কৃতিত্বের কোন স্পষ্ট পরিচয় প্রকাশ পায় নাই।

মনস্বী ভূদেবের চিন্তার গভীরতা, ভাষাশিল্পের কারুকার্য এবং প্রকাশভঙ্গির ঋজুতা প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার 'পারিবারিক প্রবন্ধ' প্রকাশিত হয়। ১০ বৎসর পর 'সামাজিক প্রবন্ধ' এবং 'আচার প্রবন্ধ' মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধগ্রন্থসমূহে সাহিত্যরসের সন্ধান পাওয়া যায় না, হৃদয়ের দ্বারে ইহাদের কোন আবেদন নাই। বুদ্ধিমান মানুষের চিন্তাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিয়া মানুষকে ঐহিক কর্তব্যের পথে অনুপ্রেরিত করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। প্রবন্ধগুলির নাম হইতেই বুঝা যায় যে ভূদেব রসানন্দ দান করিতে চাহেন নাই। পরিবার ও সমাজের সহিত ব্যক্তিমানুষের সম্পর্ক নির্দেশ করিয়া আচার আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দিয়াছেন।

প্রবন্ধ-রচনা

ভূদেব মুখোপাধ্যায় সমাজ ও ধর্মনীতি অবলম্বনে উপদেশাত্মক প্রবন্ধ রচনা করিলেও তিনি সাহিত্যরসিক এবং তত্ত্বজ্ঞ সমালোচক ছিলেন। রসশিল্পী-রূপেও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার দান উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত সাহিত্যের তিনি একজন নিপুণ সমালোচক ছিলেন। তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধে'র দুই খণ্ডে সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক সমালোচনাগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি ভূদেবের মৃত্যুর পর ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদির তিনি যে নিপুণ সমালোচনা করেন তাহাতে তাঁহার রসজ্ঞান ও বিশ্লেষণবুদ্ধির সুন্দর পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। তরুণ বয়সে ভূদেব ইতিহাসের রহস্যে আকৃষ্ট হইয়া রোমান্টিক কাহিনী রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কণ্টারের লেখা Romance of History—India গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থে 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামে দুইটি কাহিনী আছে। 'সফল স্বপ্ন' একটি প্রবাদমূলক রোমান্টিক কাহিনী এবং 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' ইতিহাসের ঘটনা। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কন্যা রোসিনারার সহিত শিবাজীর প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে লিখিত এই রচনাটি

সমালোচনা ও রস-রচনা

ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণযুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র প্রভাব আছে। চরিত্রসৃষ্টি ও ঘটনাবিন্যাসে ভূদেব শিল্পি-সুলভ দক্ষতা দেখাইতে পারিলে গ্রন্থখানি প্রথম সার্থক উপন্যাসের মর্যাদা পাইত। ভূদেবের "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" গ্রন্থখানিও উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধে মারাঠাশক্তি বিজয়ী হইলে ভারতবর্ষ কী রূপ ধারণ করিত তাহার একটি স্বপ্নিল কল্পনা দিয়া গ্রন্থখানি গড়া। কিন্তু শিল্পীর সাধনা ভূদেবের ছিল না। তাই গ্রন্থখানি সার্থক সাহিত্য হয় নাই। 'পুষ্পাঞ্জলি' নামে তিনি একখানি গল্পপুস্তক লেখেন। হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রদর্শনরে সচেতন চেষ্টায় গল্পরস জমিতে পারে নাই। আসল কথা ভূদেব কল্পনাপ্রবণ রোমাণ্টির প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন কাজের মানুষ, 'বাজেকথা'র ফুলের চাষ করিতে জানিতেন না। যাহা কিছু মানুষের হিতকর, যাহা নিতান্তই প্রয়োজন, তিনি তাহা লইয়া কারবার করিয়াছেন। ব্যক্তিচরিত্রে তিনি যেমন ছিলেন নিষ্ঠাবান্, সরল ও বাহুল্য-বর্জিত, সাহিত্য রচনায়ও সেইরূপ আবেগবাহুল্য সর্বথা বর্জন করিয়া সুসংযত, যুক্তিপূর্ণ ও মননশীল সাহিত্য রচনাদ্বারা বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন।

রচনা-বৈশিষ্ট্য

১৫। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের বিকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের দানের পরিমাণ নির্ণয় কর।

উত্তর। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, সভ্যতা ও মননশীলতার প্রভাবে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের জন্ম। জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, ধর্ম প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে চিন্তা ও বিতর্কমূলক গদ্যরচনাকে প্রবন্ধ বলা হয়। ইংরেজী Essay সাহিত্যের সাদৃশ্যেই আমাদের দেশে গদ্যনিবন্ধের সূচনা হয়। ফরাসী সাহিত্যিক মিচেল মঁতেঁই ষোডশ শতাব্দীর শেষভাগে Essais নামে কিছু গদ্যরচনা প্রকাশ করেন। ইংরাজ গদ্য লেখকগণ ঐ আদর্শ অনুসরণ করিয়া বিষয়নিষ্ঠ রচনার মধ্যে ব্যক্তিগত রুচি-প্রবৃত্তির স্পর্শ সঞ্চার করিলেন। ইহাতে প্রবন্ধসাহিত্য বস্তুভার পরিহার করিয়া রচনা সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইল। ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী লেখকেরা অ্যাডিসন, স্টীল, হ্যাজলিট, ল্যাম্ব, বেকন, বার্ক প্রভৃতি গদ্যশিল্পীদের অনুসরণে বাংলাসাহিত্যের প্রবন্ধসম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। প্রবন্ধরচয়িতাদের শিরোমণি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

প্রবন্ধ-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক রূপেই পরিচিত। কিন্তু পরিমাণগত এবং গুণগত উৎকর্ষে তাঁহার প্রবন্ধগুলিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। প্রবন্ধ রচনায় মনীষার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখাইয়া তিনি নব্যবাংলার বাঙ্গালীকে সচেতন করিয়াছিলেন, জাতীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, প্রতিষ্ঠার পথে প্রথম দীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার এই দান উপন্যাস-দান অপেক্ষা নিঃসন্দেহে মহত্তর। তাই জাতির ইতিহাসে প্রাবন্ধিক বঙ্কিম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। বাংলার ইতিহাস, ধর্ম, সমাজ-ব্যবস্থা, বিজ্ঞান-দর্শন বিষয়ক আলোচনা এবং সাহিত্য-সমালোচনার নবতর আদর্শ স্থাপন করিয়া তিনি জাতীয় সাহিত্যের বনিয়াদ সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শন প্রতিষ্ঠা করিয়া একদল প্রতিভাবান্ লেখককে তিনি আকৃষ্ট করেন এবং বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের উন্নতির পথ সুগম করিয়া দেন।

প্রাবন্ধিক বঙ্কিম

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলী বিভিন্ন বিষয়ক ছিল এবং বিষয়ানুসারে প্রবন্ধ রচনার ভঙ্গিও ছিল স্বতন্ত্র। বাংলা গদ্যভাষার অন্তর্নিহিত শক্তিকে আবিষ্কার করিয়া লইয়া তিনি জ্ঞানমূলক, বিচারমূলক এবং রস-ব্যঞ্জনামূলক বিভিন্ন ধরণের প্রবন্ধ রচনা করেন। জ্ঞানমূলক প্রবন্ধাবলীতে তথ্য ও তত্ত্বের প্রাধান্য গম্ভীর নিরাসক্ত ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হইয়াছে। বিচারমূলক প্রবন্ধাবলীতে সাহিত্য সমালোচনা, প্রাচ্যপাশ্চাত্ত্যের তুলনা, প্রচলিত মতবাদের নিপুণ বিচার, বিভিন্ন দার্শনিকদের মতবাদের সমীক্ষা করা হইয়াছে। এই জাতীয় প্রবন্ধের ভাষায় প্রাঞ্জলতার সহিত তীক্ষ্ণতা ও ব্যক্তিত্বের স্পষ্ট ছাপ আছে। রস-ব্যঞ্জনামূলক প্রবন্ধে বঙ্কিম লঘু ভঙ্গিতে কৌতুক ও ব্যঙ্গের চমৎকারিত্ব প্রকাশ করিয়া গুরুতর বিষয়সমূহকে আকর্ষণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক করিয়া তুলিয়াছেন। প্রবন্ধ রচনায়ও তিনি ছিলেন সব্যসাচী। জ্ঞান পরিবেষণের সঙ্গে রচনা-রসের মাধুর্য সঞ্চার করিয়া তিনি এমন উন্নত প্রণালীর রচনাশিল্প উদ্ভাবন করিয়াছিলেন যাহার নিদর্শন একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোন লেখকের রচনায় দেখা যায় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ-বৈচিত্র্য

বঙ্কিমের প্রবন্ধসাহিত্যে জ্ঞানমূলক রচনার পরিমাণই বেশী। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রবন্ধ রচনায় তাঁহার হাতেখড়ি। বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হইবার পূর্বে ইংরাজী ভাষায় স্বনামে ও ছদ্মনামে কিছু প্রবন্ধ লেখেন। বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইবার পরও নবজীবন, প্রচার, সাধারণী প্রভৃতি পত্রিকায় ধর্ম,

সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ঐগুলি পরে বিভিন্ন গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। বিজ্ঞান রহস্য (১৮৭৫), প্রবন্ধ পুস্তক (১৮৭৯), বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ভাগ ১৮৮৭, ২য় ভাগ ১৮৯২), ধর্মতত্ত্ব (১৮৮৮) প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে অধিকাংশ প্রবন্ধই জ্ঞানমূলক। 'সাম্য' পুস্তকটি ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। যে যুগে পাশ্চাত্ত্য সমাজেও সাম্যবাদ ভীতিমূলক ছিল সেই যুগে বঙ্কিম মানবসভ্যতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া শ্রেণীবিদ্বেষে জর্জরিত সমাজের আমূল সংশোধনের ইঙ্গিত এই গ্রন্থে দিয়াছিলেন। অবহেলিত কৃষকদের প্রতি সমবেদনামূলক এই জাতীয় প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে আর নাই। ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ভিত্তিতে ভারতীয় ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বঙ্কিমচন্দ্রের বিচিত্র প্রতিভার পরিচায়ক। জ্ঞানমূলক প্রবন্ধে বঙ্কিমের যুক্তিনিষ্ঠা, তথ্যপ্রিয়তা, বৈজ্ঞানিকতা ও জ্ঞানগভীরতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

জ্ঞানমূলক প্রবন্ধ

বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারমূলক প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই 'বিবধ প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থের দুইটি ভাগে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বিবিধ সমালোচনা' এবং ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত 'কৃষ্ণচরিত্র' বঙ্কিম-প্রতিভার বিস্ময়কর স্বাক্ষর। বিবিধ সমালোচনায় তিনি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক মতবাদগুলির বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়াছেন। কোঁৎ, মিল, বেন্থাম প্রভৃতি বস্তুবাদী দার্শনিকদের যুক্তি খণ্ডন করিয়া দর্শন-তত্ত্বের নূতন দিগন্তের ইঙ্গিত দিয়াছেন। কৃষ্ণচরিত্র চিত্রণে তিনি বিচারমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণকে পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। অন্ধবিশ্বাসের স্থলে প্রামাণ্য যুক্তির প্রতিষ্ঠা বঙ্কিমের প্রবন্ধগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ধর্মতত্ত্বে গুরুশিষ্যের সংলাপের মাধ্যমে মানবধর্মই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং মানবিক বৃত্তিগুলির সম্যক অনুশীলনই যে শ্রেষ্ঠ সাধনা তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ধর্ম ও দর্শন ছাড়া সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনায়ও বঙ্কিম অসাধারণ রসবুদ্ধি ও বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্গদর্শনে একটি সমালোচনা বিভাগই ছিল। তিনি ঈশ্বরগুপ্ত, দীনবন্ধু, প্যারীচাঁদ প্রভৃতি সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মের যথাযোগ্য বিচার করিয়াছেন। জয়দেব, বিদ্যাপতি, উত্তররামচরিত, শকুন্তলা-মিরান্দা-দেসদিমনা প্রভৃতি নামে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়া সমালোচনা সাহিত্যের দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন।

বিচারমূলক প্রবন্ধ

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ-সাহিত্যে আর এক জাতীয় রচনা ছিল যাহা তথ্যমূলক নীরস গদ্যপ্রবন্ধ নয়, রস-ব্যঞ্জনামূলক ও হাস্যরসাত্মক। বঙ্কিম-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ এই জাতীয় রচনার মধ্যেই সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই জাতীয় রচনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ "কমলাকান্তের দপ্তর"। বঙ্কিম কমলাকান্ত চক্রবর্তীর ছদ্ম পরিচয়ে নিজের জীবনের চরম অভিজ্ঞতাকে অনন্যসাধারণ শিল্পাঙ্গিকের সহায়তায় প্রকাশ করিয়াছেন। ডি-কুইন্সি নামক একজন ইংরাজ লেখকের "Confessions of an English Opium Eater" নামক গ্রন্থের অনুসরণে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে "কমলাকান্তের দপ্তর" প্রকাশিত হয়। অহিফেনসেবী কমলাকান্তের জবানীতে বঙ্কিম ব্যঙ্গকৌতুকের সহায়তায় আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। দপ্তরে বঙ্কিমের স্বদেশপ্রাণতা, অধঃপতিত বাঙ্গালীর প্রতি দরদ এবং সামাজিক দুর্গতির প্রতিকার প্রচেষ্টার মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। স্বয়ং বঙ্কিম তাঁহার এই রচনাটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। কমলাকান্ত রচনার পুর্বে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যঙ্গরচনা 'লোকরহস্য' প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থে 'ব্যাঘ্রাচার্য-বৃহল্লাঙ্গুল', বাবু, গর্দভ, হনমদ্বাবু সংবাদ প্রভৃতি বিদ্রূপাত্মক রচনায় বঙ্কিম আদর্শভ্রষ্ট বাঙ্গালীকে ব্যঙ্গের কশাঘাত করিয়াছেন এবং উন্নত স্তরের হাস্যরসের সমাবেশ করিয়াছেন। 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' (১৮৮৪) নামক গ্রন্থখানিতেও ব্যঙ্গচ্ছলে বঙ্কিম বাঙ্গালী জীবনের নানা অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বঙ্কিমের দেশপ্রেম, ঐতিহ্যপ্রীতি, নীতিবোধ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি পরিহাসপ্রিয়তা ও সূক্ষ্ম রসবোধের সহিত মিশ্রিত হইয়া এই জাতীয় রচনাগুলিকে অপূর্ব রসপুর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

রস-ব্যঞ্জনামূলক প্রবন্ধ

প্রবন্ধ-সাহিত্যে বঙ্কিমের দান বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। সরকারী-কর্মরত একটি ব্যক্তি প্রতিভার কত বড় দীপ্তির অধিকারী হইয়া বাংলা গদ্য সাহিত্যের মোড় ফিরাইয়া দিলেন! তিনি জ্ঞানের দিব্য ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছিলেন। যুক্তিবাদ, নির্ভুল তথ্য, সুগভীর তত্ত্ব, সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিকতা প্রভৃতি মস্তিষ্কপ্রসূত বিষয়গুলিকে হৃদয়রসে জারিত করিয়া তিনি গদ্যপ্রবন্ধের মধ্যেও শিল্পসুষমার সমৃদ্ধি আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার উপন্যাস তাঁহাকে দিব্যলোকে লইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রবন্ধ রচনার গুণে তিনি চিরকালের জন্য ধ্রুবলোকের অধিবাসী হইয়াছেন।

উপসংহার

১৬। বাংলা প্রবন্ধ-রচনায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহিত তুলনায় বঙ্কিমের কোন উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা আছে কি না, তাহা উভয়ের রচনার উল্লেখ করিয়া আলোচনা কর।

উত্তর। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি। পূর্বে প্রকৃষ্ট বন্ধন-যুক্ত যে-কোন রচনাকে প্রবন্ধ বলা হইত। গদ্য-প্রবন্ধ, পদ্য-প্রবন্ধ, নাট্য-প্রবন্ধ—এই সমস্ত নাম প্রচলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে পয়ার প্রবন্ধ, লাচারী প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের পর প্রবন্ধ শব্দটি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইতে থাকে। ইংরাজী discourse, treaties ও essay জাতীয় গদ্য-রচনাকে প্রবন্ধ বলে। তত্ত্ব ও তথ্যমূলক আবেগহীন গদ্যরচনা যাহাতে বুদ্ধিমত্তা, বিচারপ্রবণতা এবং সিদ্ধান্তমুখিতা আছে সেই রচনাগুলিকে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সন্দর্ভ, প্রস্তাব প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়।

প্রবন্ধের সংজ্ঞা

প্রবন্ধসাহিত্যের প্রথম সূচনা হয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে ধর্মীয় কলহকে ভিত্তি করিয়া। বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব, সহমরণ সম্বন্ধীয় আলোচনা, খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার, হিন্দুধর্মের মহিমা ঘোষণা প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার জন্য গদ্য ভাষায় বুদ্ধির কাছে আবেদন করা হইত। রামমোহন, ভবানীচরণ, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, খ্রীষ্টান পাদ্রীরা ইহার সূত্রপাত করেন। তাঁহাদের পথ ধরিয়া বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মনস্বী লেখকেরা প্রবন্ধসাহিত্যের পুষ্টিবিধান করিতে থাকেন। জ্ঞানানুশীলন, তত্ত্বব্যাখ্যা এবং তথ্য-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে কেহ কেহ সাহিত্য-রসের যোগান দিয়া প্রবন্ধকে হৃদয়গ্রাহী করিয়াছিলেন। জ্ঞানের বিষয়কে রসের পর্যায়ে আনা, বুদ্ধির বিষয়কে হৃদয়ধর্মের অনুকূল করিয়া তোলা বিশেষ প্রতিভার কাজ। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে প্রতিভার সেই দীপ্তি ছিল। ভূদেব ও বঙ্কিম সাহিত্যের এই দুইজন দিক্‌পাল স্ব স্ব ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্কিমের প্রবন্ধাবলীতে রচনাগুণের সমাবেশ বেশী, বিষয়বৈচিত্র্যও যথেষ্ট। ভূদেবের প্রবন্ধে বিশুদ্ধ প্রবন্ধগুণের সমাবেশ এবং যুক্তিবাদ ও বিষয়নিষ্ঠা বেশী।

প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা

ভূদেব মুখোপাধ্যায় হিন্দুকলেজের খ্যাতিমান ছাত্র ছিলেন। ইনি বঙ্কিমের অগ্রজ। ছাত্রকালেই তিনি হাতে লিখিয়া প্রবন্ধ-পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পরিণত বয়সে যুক্তি ও তথ্যের প্রচুর উপকরণ দিয়া ব্যক্তিত্বস্পর্শবর্জিত আবেগহীন প্রবন্ধরচনায় তিনি নিষ্ঠা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। পর পর কয়েকখানি প্রবন্ধপুস্তকে তিনি বহু পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যাকে বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়াছেন। 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'আচার-প্রবন্ধ', 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রভৃতি গ্রন্থের রচনা-পরিকল্পনায় ও ভাষারীতিতে তিনি অক্ষয়কুমারের মননশীল আদর্শের অনুসরণ করেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতবাদ যুক্তিদ্বারা সমর্থন বা খণ্ডন করিয়া, ইতিহাস হইতে প্রচুর দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া, তর্কশাস্ত্রের আরোহ এবং অবরোহ প্রণালী অবলম্বন করিয়া ভূদেব তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধে বুদ্ধির দীপ্তি ও বিচারপ্রবণতা খুব বেশি, হৃদয়াবেগ বড় কম। এই জন্য তাঁহার প্রবন্ধের ভাষায় কোন তির্যক ভঙ্গি নাই, পরিহাসরসিকতা বা শ্রুতিসুখকর লাবণ্যেরও অভাব। সামঞ্জস্য ও সমতা দ্বারা ভাষাকে যথাসম্ভব গুরুগম্ভীর অথচ প্রাঞ্জল রাখিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য আদর্শে যাহাকে Intellectual essay বলে ভূদেবের রচনায় তাহারই প্রতিফলন।

ভূদেবের কৃতিত্ব

বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেবের প্রায় সমকালীন প্রবন্ধ লেখক। বঙ্কিমের বিশুদ্ধ প্রবন্ধগুলি ভূদেবচন্দ্রের গ্রন্থ প্রকাশের পর প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্কিম ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই প্রবন্ধ রচনায় হাত দিয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' প্রতিষ্ঠার পর সম্পাদক বঙ্কিম মাসিকপত্রের প্রয়োজনে পাঠকসম্প্রদায়ের জ্ঞানক্ষুধা ও রসপিপাসা মিটাইবার জন্য প্রবন্ধরচনার অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, জীবনদর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার লেখনী অমৃতস্রাবী হইয়া উঠিল। বঙ্কিমের প্রবন্ধগুলি মননশীলতা, বিচার-প্রবণতা ও পাণ্ডিত্যের জ্যোতি-স্নিগ্ধ কৌতুকের প্রলেপে বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছিল। তাঁহার 'বিজ্ঞান রহস্য' ও 'লোকরহস্য' অভিনব প্রবন্ধসাহিত্যরূপে বাঙ্গালী পাঠককে চমৎকৃত করে। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' বিষয় উপস্থাপনার কৌশল এবং ভাষা প্রয়োগে ব্যঙ্গ-কৌতুকের তির্যকতা অপূর্ব। প্রবন্ধের মধ্যে বঙ্কিম জ্ঞানের শুষ্কতাকে গল্পরসের আর্দ্রতায় সুস্নিগ্ধ করিয়াছিলেন। ভূদেবের রচনায় এই জাতীয় কৌশলের চিহ্নমাত্রও নাই। জ্ঞানগর্ভ ও পাণ্ডিত্যচিহ্নিত প্রবন্ধ রচনায়ও বঙ্কিম সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধে' ঐতিহাসিক গবেষণামূলক আলোচনা, সমাজতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, ধর্মনীতির নিগূঢ় বিচার অসাধারণ দীপ্তিতে উজ্জ্বল।

বঙ্কিমের কৃতিত্ব

এই সমস্ত প্রবন্ধে কোথাও পাণ্ডিত্যের গুরুভার নাই, বরং মানবপ্রেমিক ঐতিহ্যপ্রিয় বঙ্কিমের বিরাট ব্যক্তিত্বের স্পর্শ প্রত্যেকটি প্রবন্ধকে রসসিক্ত করিয়া বাখিয়াছে। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্র হইতেই বিষয়নিষ্ঠ প্রবন্ধ রচনার রীতি এবং সাহিত্য সমালোচনার পদ্ধতি স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করে। গদ্যপ্রবন্ধে ব্যক্তিত্বের চিহ্ন পরিস্ফুট হওয়ায় জ্ঞানমূলক শুষ্ক প্রবন্ধগুলি রসমূলক সাহিত্য পর্যায়ে উন্নীত হয়।

ভূদেব ও বঙ্কিম দুইজনেই স্বতন্ত্র পথের পথিক। ভূদেব বিষয়ের মধ্যে নিজেকে নিবিষ্ট করিয়া দিয়া দার্শনিক ও পণ্ডিতের কাজ করিয়াছেন, আর বঙ্কিম আপন ব্যক্তিত্বে বিষয়কে অতিক্রম করিয়া সাহিত্যিক ও রসিকের কাজ করিয়াছেন। এই স্থানেই উভয়েব কৃতিত্বের মৌলিক পার্থক্য।

১৭। বাংলা গদ্যে চলিত রীতি প্রবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়া আলালী, হুতোমী ও বীরবলী ঢঙের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ কর।

উত্তর। বাংলা সাহিত্যে গদ্যভাষা প্রবর্তনের ইতিহাস খুব বেশী দিনের নহে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে গদ্যরচনার যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন মেলে। বৈষ্ণব সহজিয়াদের রচনা, দুইচারিখানি চিঠিপত্র, খ্রীষ্টান মিশনারীদের কিছু অনুবাদকার্য ও প্রচারপত্রাদিতে কোন সুস্পষ্ট গদ্যরীতি গড়িয়া উঠে নাই। দোম অ্যান্টোনিও নামক একজন ধর্মান্তরিত বাঙ্গালী 'ব্রাহ্মণ-রোমান-কাথলিক সংবাদ' লিখিয়াছিলেন। ইহা প্রশ্নোত্তরমূলক রচনা। মানোএল দ্য আস্সাম্পসাওঁ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' লিখিয়াছিলেন। ইহাতেও বাংলা গদ্যরীতি সুনির্দিষ্ট রূপলাভ করে নাই। শ্রীরামপুরের পাদরীরা এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী বাংলা গদ্যচর্চায় মনোযোগী হইলে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা হইতে বাংলা গদ্যরীতির একটি ধারা গড়িয়া উঠে। বাংলা গদ্যের প্রাথমিক প্রচেষ্টায় সাধুভাষায় ছাঁদ-ই অভিব্যক্ত হয়।

গদ্যরীতির সূচনা

বাংলা গদ্যে চলিত রীতির সুস্পষ্ট সূচনা দেখা যায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে উইলিয়ম কেরীর 'কথোপকথন' (১৮০১) গ্রন্থে। কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ কেরী সিভিলিয়ানদের বাংলা শিক্ষার জন্য গ্রন্থখানি লেখেন। কলেজের অন্যতম অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার গ্রন্থ রচনায় প্রভূত সহায়তা করেন বলিয়া মনে হয়। এই গ্রন্থে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন, স্ত্রীসমাজের আচার, বহু গ্রাম্য প্রসঙ্গ নাটকীয় ভঙ্গিতে কথোপকথনের ভাষায় বলা হইয়াছে। বইখানির ইংরাজী

গদ্যসাহিত্যের আদি-যুগে চলিত রীতি

আখ্যাপত্র ছিল—Dialogues intended to facilitate the acquiring of the Bengalee Language. গ্রন্থখানি চলিত গদ্যরীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মুখের ভাষাকে অনুকরণ করিতে গিয়া লেখক শ্লীলতা ও গ্রাম্যতার সীমাও লঙ্ঘন করিয়াছেন। 'মাইয়া কোন্দল', 'স্ত্রীলোকে ২ কথাবার্তা' প্রভৃতি অংশ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। নক্সা জাতীয় ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনার মাধ্যমেই চলিত রীতির ব্যবহার হইয়াছে বেশী। মহৎ ভাবপ্রকাশক গুরুগম্ভীর রচনায় ইহার স্থান ছিল না। কেরীর সমসাময়িক মৃত্যুঞ্জয় ঠিক চলিত ভাষা লেখেন নাই। তবু তাঁহার 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় বিশ্ববঞ্চকের কাহিনীতে চলিত ভাষার আমেজ আছে। "ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল—তবে কি আজি খাওয়া হবে না, ক্ষুধায় মরিব ? তৎপত্নী কহিল—মরুক ম্যানে, আজি কি পিঠা না খাইলেই নয় ? দেখি দেখি হাঁড়িকুঁড়ি, খুদকুঁড়া যদি কিছু থাকে।" এই ভাষায় চলিত রীতির তাৎপর্যপুর্ণ সূচনা আছে।

চলিত-রীতির বিবর্তনের ইতিহাসে ভবানীচরণের দানও উল্লেখযোগ্য। ইনি স্বনামে এবং প্রমথ শর্মা ছদ্মনামে 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবুবিলাস' এবং 'নববিবিবিলাস' লিখিয়াছিলেন। ইনি চলিত ভাষায় লেখেন নাই ; কিন্তু ছাঁদ সাধুভাষায় হইলেও চলিত ভঙ্গিটি বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। এই জাতীয় ব্যঙ্গাত্মক নক্সা অবলম্বনেই প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের তুলাল' এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' লেখেন। টেকচাঁদ ছদ্মনামে লেখক 'আলালের ঘরের তুলাল' প্রকাশিত করেন। 'ফুলমণি ও করুণা' গ্রন্থখানিকে বাদ দিলে গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। গ্রন্থখানিতে চলিত রীতির সুন্দর নিদর্শন আছে। প্যারীচাঁদের রচনার স্বাভাবিক রীতি ছিল সাধুভাষার ছাঁদে। কিন্তু এই উপন্যাসে তিনি পাত্রপাত্রীর কথোপকথনে চলিত ভঙ্গি অনুসরণ করিয়াছেন। "বাবুরাম বাবু চাকরকে বলিলেন—ওরে হরে, শীঘ্র বালী যাইতে হইবে, তুচার পয়সার একখানা চল্‌তি পান্‌সী ভাড়া কর্‌ তো। বড় মানুষের খানসামারা মধ্যে মধ্যে বেয়াদফ হয়। হরে বলিল—মোশায়ের যেমন কাণ্ড, ভাত খেতে বস্তেছিনু, ডাকাডাকাতি ভাত ফেলে রেখে এস্তেছি। চল্‌তি পান্‌সী ভাড়া করা আমার কর্ম নয়, এ কি থুৎকুড়ি দিয়ে ছাতু গোলা ?" উদ্ধৃতির ভাষায় বিশুদ্ধ চলিত রীতি নাই ; কিন্তু চলিত ভঙ্গির স্বাচ্ছন্দ্য সহজেই অনুভব করা যায়।

আলালী-রীতি

কালীপ্রসন্ন সিংহ ছদ্মনামে 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' প্রকাশ করিয়াছিলেন।

খাঁটি কলিকাতার কথ্য বুলিতে, যাহাকে 'ককনি' ভাষা বলা চলে, এমন ভাষায় ইনি সেই যুগপরিবেশ এবং হঠাৎ বড়লোকদের ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়াছিলেন। 'হুতোম' প্রকাশের পূর্বেও দুইখানি বেনামী পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল— 'কলকাতার হাটহদ্দ' এবং 'বাবুদের দুগ্‌গোচ্ছব'। অনেকের ধারণা এই গ্রন্থ দুই-খানিও কালীপ্রসন্নের রচনা। 'হুতোম প্যাঁচা' রুচিবান্ লোকদের কাছে প্রশংসা পায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থখানির প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। কলিকাতা সমাজের কদর্যতার একটি নগ্ন চিত্র এই গ্রন্থে আছে। তবে বিষয়বস্তু যাহাই হউক না কেন, চলিত গদ্যের উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক দৃষ্টান্তরূপে গ্রন্থখানির ভাষাভঙ্গি প্রশংসনীয়। "অমাবস্যার রাত্তির—অন্ধকার ঘুরঘুট্টি—গুরুগুরু করে মেঘ ডাকছে—থেকে থেকে বিদ্যুৎ তড়পাচ্ছে, গাছের পাতাটি নড়চে না, মাটি থেকে যেন আগুনের তাপ বেরুচ্চে।

হুতোমী ভাষা

পথিকেরা একএকবার আকাশ পানে চাচ্চেন, আর হনহন করে চলছেন, কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ কচ্চে, দোকানীরা ঝাঁপতাড়া বন্ধ করে ঘরে যাবার উজ্জুগ কচ্চে, গুড়ুম করে নটার তোপ পড়ে গ্যালো।" একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে চলিত রীতির সাহিত্যিক জৌলুস এই ভাষায় আছে।

নাটকের পাত্রপাত্রীর সংলাপে চলিত ভাষার ব্যবহার যথেষ্ট হইতেছিল। আলালের ঘরের দুলালে, ভবানীচরণের রচনায় কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মুখের বুলির ব্যবহার ছিল। কেরীর চলিত ভাষাও কথোপকথনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত। সমালোচনাত্মক ও বর্ণনাত্মক বিষয়ে চলিত রীতির ব্যবহার একমাত্র কালীপ্রসন্নই সাহসের সহিত করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন সাধুরীতি রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তথাপি হুতোম ছদ্মনামে তিনি মুখের ভাষাকে উচ্চারণঘেঁষা বানানে চিত্ররূপ রচনার উপযোগী করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ব্যাকরণের পরোয়া না করিয়া প্রচলিত বর্ণবিন্যাসরীতি অগ্রাহ্য করিয়া, নিন্দাসম্ভাবনার কথা ভুলিয়া চলিত ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনার সম্ভাবনা-পথের সন্ধান দিয়াছিলেন। এই ভাষাই পরিণামে বীরবলীরীতিতে বিবর্তিত হইয়া সাহিত্য-ভাষার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিয়াছিল।

হুতোমী-ভাষার বৈশিষ্ট্য

ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ভাষাসৌন্দর্যের নানা চেষ্টায় চলিত রীতিকে অবলম্বন করা হয়; কিন্তু উন্নত ভাব প্রকাশে চলিত রীতির উপযোগিতা সম্বন্ধে লেখক-মহলে যথেষ্ট সন্দেহ-সংশয় ছিল। এমন সময় প্রথম চৌধুরী 'বীরবল' ছদ্মনামে

'সবুজপত্র' নামক পত্রিকার মাধ্যমে চলিত ভাষাকে সব রকম ভাবপ্রকাশ এবং তত্ত্বালোচনার উপযোগী মর্যাদা দিয়াছিলেন। বীরবলের পূর্বে চলিত রীতি শুধু কথোপকথনের প্রয়োজনে অথবা বর্ণনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু চিন্তামূলক গুরুগম্ভীর রচনায় চলিত ভাষার প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইত না। চলিত রীতিতে বক্তব্য বিষয় লঘু হইয়া যায় এই বিশ্বাসবশে প্রথম চৌধুরীর বিরুদ্ধে বিদ্রূপ সমালোচনাও হয়। ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টই প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন যে, ধর্মতত্ত্ব, দর্শনশাস্ত্র এবং সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে চলিত ভাষার প্রয়োগ বিষয়বস্তুর উপযোগী হয় না। বীরবল প্রমাণ করিলেন যে চিন্তামূলক প্রবন্ধ এবং অনুভূতিমূলক রসরচনা দুইই চলিত রীতিতে সম্ভব। তবে বীরবলী রীতি আলালী ও হুতোমী রীতির তুলনায় অনেক মার্জিত এবং অনুশীলিত। বীরবল লোকের মুখের কথ্য উচ্চারণকে গ্রহণ করেন নাই এবং উচ্চারণঘেঁষা বানান প্রয়োগেরও চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার নীললোহিতের গল্পে এবং বীরবলের হালখাতায় সাধু গদ্য-রীতির কাঠামোর মধ্যে প্রচুর তৎসম শব্দের সমাবেশ করিয়াছেন এবং ক্রিয়াপদে ও সর্বনামে উচ্চারণ-ভিত্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। ফলে তাঁহার ভাষা কিঞ্চিৎ কৃত্রিম ও গুরুভার হইয়াছে।

বীরবলী-রীতি

বীরবলী রীতি বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। তবে বীরবল ভাষার রুদ্ধকক্ষের অর্গল মোচন করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্তী বাংলা রচনাতে চলিত রীতির সচ্ছন্দ সাবলীল ব্যবহার প্রবর্তিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শেষ জীবনে সবরকম রচনায় চলিত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। এখন চলিত ভাষা সবরকম ভাবপ্রকাশের শক্তিশালী বাহন। শুধু উপন্যাস, ছোট গল্প এবং ভ্রমণবৃত্তান্তই নয়, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব মূলক প্রবন্ধে, সংবাদ পরিবেষণ ও সমীক্ষায়, সাহিত্যসমালোচনায় চলিত ভাষার অবাধ ব্যবহার ভাষার প্রকাশশক্তিকে সুপ্রমাণিত করিতেছে।

উপসংহার

১৮। বাংলা গদ্যরীতির ক্রমবিকাশে একদিকে টেকচাঁদ ও হুতোম, অন্যদিকে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম কি ভাবে গদ্যরীতির দুইটি ধারা পুষ্ট করিলেন তাহা আলোচনা কর।

উত্তর। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ধারা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রায় জন্মসূত্র হইতেই গদ্যভাষায় দুইটি ভাষারীতির বিকাশ

হইতে থাকে। প্রথম যুগে কুচবিহারের রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের পত্রে, সহজিয়াদের কড়চা গ্রন্থে, খ্রীষ্টান পাদরীদের গদ্যচর্চায় বাংলা গদ্যে সাধুরীতির একটি ছাঁদ গড়িয়া উঠে। হ্যালহেড যে ব্যাকরণ লেখেন তাহাও সাধুরীতির ব্যাকরণ। কিন্তু প্রথম যুগের গদ্য-গ্রন্থগুলি প্রশ্নোত্তরচ্ছলে রচিত বলিয়া ভাষার মধ্যে কথ্যরীতির ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠে। দোম আন্তোনিও "ব্রাহ্মণ-রোমান-কাথলিক সংবাদ" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বলি বড়ো ধর্মিষ্ঠ ছিলো, যে যাহারে চাহিত তাহারে তাহা দিতো এ কারণে পরমেশর ব্রামণ রূপে হইয়া বলিরাজারে ছলিলেন।" মানোএল-দ্য-আসৃম্পসাওঁ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "সেভিল্যা শুহরে এক গৃহস্থ আছিল, তাহার নাম সিরিলো, সেই সিরিলো কেবল এক পুত্রো জর্মাইল তাহারে এতো দয়া করিলো যে কোনো দিন তাহারে শিক্ষাও না দিলো এবং শাস্তিও না দিলো; সে যাহা করিতে চাহিতো তাহা করিতো।" এই প্রকার ভাষার গঠন সাধুরীতিসম্মত হইলেও চলিত রীতির ভঙ্গিটি দুর্লভ নয়।

প্রথম যুগের গদ্যে রীতি-বৈচিত্র্য

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর অধ্যাপকমণ্ডলীর প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যে সুস্পষ্ট রীতি গড়িয়া উঠে। মৃত্যুঞ্জয়, রামরাম বসু, রাজীবলোচন, চণ্ডীচরণ প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ তৎসম শব্দসমাকুল জটিল বাক্যাবলীপূর্ণ সাধুরীতির ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের গদ্যরীতি 'পণ্ডিতী বাংলা' নাম পাইয়াছিল। ঐ সময়েই কেরী তাঁহার 'কথোপকথন' গ্রন্থে কথ্যভাষা ব্যবহার করিলেন। "ওলো, তোর ভাতার কারে কেমন ভালবাসে তাহা বল শুনি। আহা, তাহার কথা কহ কেন? এখন আর আমাদের কি আদর আছে?" —এইপ্রকার ভাষায় কথ্যভঙ্গিকে সাহিত্যে ব্যবহারের চেষ্টা আছে। মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য়ও চলিত-ভাষা প্রয়োগের চেষ্টা আছে। এই রকম গদ্য-রীতিতে হাল্কা চাল এবং বিদেশী শব্দের ব্যবহার থাকায় ইহার নাম হয় 'খ্রীষ্টান বাংলা'। বাংলার খ্যাতিমান লেখকেরা সাধুরীতিরই অনুশীলন করিতেন। কিন্তু কোন কোন :রচনায় চলিতরীতির ভঙ্গি ফুটিয়া উঠিত। ভবানীচরণের প্রবন্ধাবলীর ভাষারীতি বিশুদ্ধ সাধু, কিন্তু তাঁহার 'নববাবুবিলাস' 'নববিবি-বিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থে চলিত রীতির ইঙ্গিত আছে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা গদ্যের দুই রীতি

চলিত রীতির ধারা প্রথমাবস্থায় সৃষ্টিমূলক গম্ভীর রচনায় ব্যবহৃত হয় নাই।

ব্যঙ্গবিদ্রূপপূর্ণ নক্সা-জাতীয় রচনার বাহনরূপেই চলিত ভাষা প্রযুক্ত হইত। ভবানীচরণের পন্থা ধরিয়া প্যারিচাঁদ মিত্র মহাশয় টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখিয়া কথাসাহিত্যে চলিত ভাষার প্রয়োগসিদ্ধি প্রদর্শন করিলেন। এদিকে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাচার নক্সা' লিখিয়া বর্ণনাত্মক রচনায় চলিত রীতির সুষ্ঠু প্রয়োগ করিলেন। চলিত-রীতি প্রথমাবস্থায় মর্যাদাসম্পন্ন ছিল না। প্যারীচাঁদ এবং কালীপ্রসন্ন উভয়েই তাঁহাদের অপরাপর রচনায় 'পণ্ডিতী বাংলা'রই অনুসরণ করিতেন। তবু মোটামুটি বলা যায় যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ হইতে গদ্যরচনার যে দুইটি রীতি উদ্ভূত হইয়াছিল তাহার একটিকে ধরিয়া রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি গদ্যশিল্পীরা অগ্রসর হইয়াছিলেন ; আর একটিকে ধরিয়া প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি ভাষারীতির পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই দুই রীতিকে এই যুগে যথাক্রমে 'সাগরী রীতি' ও 'আলালী রীতি' বলা যাইতে পারে।

আলালী ও হুতোমী চলিত রীতি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা ভাষায় সাধুরীতির সার্থক প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহারা গদ্যরীতিকে ঋজু, সংহত, তত্ত্বের বাহন ও যুক্তিনিষ্ঠ করিয়া তোলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনায় প্রাঞ্জলতা, মাধুর্য এবং প্রসাদগুণের প্রচুর সমাবেশ ছিল। যথোপযুক্ত ছেদচিহ্ন ব্যবহার করিয়া তিনি বাংলা গদ্যে শ্রুতিসুখকরতা এবং ছন্দোময়তা সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনায় লালিত্য ও গাম্ভীর্যের সমন্বয় ঘটিয়াছিল। শকুন্তলা, সীতার বনবাস, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি ভাষার আশ্চর্য নমনীয়তাগুণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গদ্যরীতিই পরবর্তীকালে প্রবন্ধলেখকদের আদর্শ ভাষা হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরীয় রীতি অবলম্বনে লেখনী ধারণ করিয়া বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পীর গৌরব লাভ করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগরী রীতি

বাংলা সাধুরীতির চরম পরিপুষ্টি ঘটিয়াছিল মনীষী বঙ্কিমের আশ্চর্য প্রতিভাস্পর্শে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যরীতির একটি সার্থকসুন্দর রূপ প্রকটিত করিলেন। বিদ্যাসাগর কলালক্ষ্মীর আরাধনার উপযোগী ভাষা রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভাষার ধ্বনিমাধুর্যদ্বারা কলাবতী রাগিণী সঞ্চার করিয়া কলালক্ষ্মীর গৌরব দিকে দিকে বিকীর্ণ করিয়া

দিলেন। উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা ও রসরচনা সৃষ্টি করিয়া বঙ্কিম বঙ্গভাষার অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তিকে জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। প্রকাশের সরলতাকেই তিনি ভাষার শ্রেষ্ঠ গুণরূপে বুঝিয়াছিলেন। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল প্রভৃতি উপন্যাসের ভাষাভঙ্গি খুব উন্নত স্তরের। গদ্য-ভাষাকে কাব্যসৌন্দর্যে মণ্ডিত করিবার অসাধারণ দক্ষতায় বঙ্কিম ছিলেন অতুলনীয়। বিবিধ প্রবন্ধ, লোকরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর প্রভৃতি রচনার ভাষা হৃদয়ধর্ম ও মননশীলতা—এই উভয় বৃত্তিকেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'আলালী' ও 'সাগরী' রীতির একটি সুসমঞ্জস সমন্বয় করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাকে "শবপোড়া, মরাদাহ" বলিয়া ব্যঙ্গ করাও হইয়াছিল। রামমোহন হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাসাগরী, আলালী, হুতোমী প্রভৃতি পর্যায়ে গদ্যরীতির যে স্বাভাবিক বিচিত্রমুখী বিকাশধারা, বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে সেই ঐতিহ্যেরই পূর্ণ রূপ প্রকটিত। বস্তুতঃ সাগরী ও আলালী রীতির সমন্বয়ের মধ্য দিয়াই বাংলা গদ্যের এক সর্বব্যাপ্ত পরিণত রূপ গড়িয়া উঠে। উহাই ক্রমশঃ বিবর্তিত হইয়া রবীন্দ্রনাথের হাতে সাধু ও চলিত রীতির সর্বতোমুখী সমন্বয়ী রূপ ধারণ করিয়াছে। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে সাহিত্যিক উৎকর্ষে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার মূলে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়-সাধনা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

বঙ্কিমের সমন্বয়সাধনায় গদ্যরীতির উৎকর্ষ

১৯। বঙ্কিম যুগে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন প্রবন্ধকারদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও এবং তাঁহাদের রচনার মূল্য নিরূপণ কর।

উত্তর। ইয়োরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতা বাঙ্গালীর মনের অর্গল উন্মোচন করিয়া দিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বিস্ময়কর প্রতিভা বাঙ্গালীকে আত্মপ্রকাশের ভাষা-সরণির সন্ধান দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার অসংখ্য প্রবন্ধাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বিভিন্ন পত্রিকা-গোষ্ঠীকে অবলম্বন করিয়া প্রচুর কৃতী লেখক বঙ্গসরস্বতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। মহাকালের দরবারে সকলের সম্মানজনক স্থায়ী আসন নিরূপিত না হইলেও তাঁহাদের দানের কথা স্মরণযোগ্য। বঙ্কিমযুগের কয়েকজন প্রবন্ধকারের উল্লেখ করা হইল; কিন্তু বহুজনের কথাই রহিল অকথিত।

ভূমিকা

বঙ্কিমচন্দ্রকে ঘিরিয়া বঙ্গদর্শনের আকাশে যে নক্ষত্রমণ্ডলীর আবির্ভাব

হইয়াছিল তাহার মধ্যে কয়েকজন ছিলেন বেশ উল্লেখযোগ্য। প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, জগদীশনাথ রায়, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি কয়েকজন গদ্যশিল্পী বঙ্কিম-প্রবর্তিত পথে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইঁহারা 'বঙ্গদর্শন গোষ্ঠী' নামে পরিচিত। প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় পুরাতাত্ত্বিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিতেন। 'গ্রীক ও হিন্দু' এবং 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত' প্রত্নতাত্ত্বিক গ্রন্থরূপে ঐতিহাসিকেরা সমাদর করিয়াছেন। যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ 'আর্যদর্শন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইনি ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্‌ডী, বীরপূজা প্রভৃতি জীবনীমূলক গ্রন্থ লিখিয়া জাতীয়তাবোধ সঞ্চারের চেষ্টা করেন। রামদাস সেন ঐতিহাসিক গ্রন্থরচনায় পরদর্শী ছিলেন। তাঁহার 'ঐতিহাসিক রহস্য' এবং 'ভারতরহস্য' গ্রন্থ সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রথম জীবনে 'যৌবনোদ্যান', 'মিত্রবিলাপ', 'কাব্যকলাপ' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। পরে বঙ্কিমের নির্দেশে তিনি প্রাবন্ধিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' 'স্ত্রীলোকের রূপ' নামক প্রবন্ধটি তাঁহার রচনা। ভাবের ঐশ্বর্যে, তথ্যের প্রাচুর্যে এবং কল্পনার নিবিড়তায় প্রবন্ধটি উপভোগ্য। ইনি ইতিহাস, দর্শন এবং সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। রসরচনা অপেক্ষা ঐতিহাসিক ও দার্শনিক তথ্যানুসন্ধানের প্রতি তিনি বেশী আগ্রহশীল ছিলেন। 'নানাপ্রবন্ধ' নামক প্রবন্ধপুস্তকে বহু বিতর্কমূলক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে। 'সাধারণী' ও 'নবজীবন' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার বঙ্কিমচন্দ্রের একজন প্রধান অনুবর্তী ছিলেন। 'দপ্তরের' 'চন্দ্রালোকে' প্রবন্ধটি তাঁহার রচনা। বঙ্কিমের রচনারীতি ও কমলাকান্তী মেজাজ সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া তিনি প্রবন্ধটি রচনা করেন। কিছু কিছু কবিতা ও গল্প রচনা করিলেও অক্ষয়চন্দ্র ছিলেন সরল প্রাবন্ধিক। কাব্য সমালোচনায় তিনি মূল তত্ত্বের উপস্থাপন কৌশল এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। সমাজ-সমালোচনা (১৮৭৫), আলোচনা (১৮৮২), সনাতনী, রূপক ও রহস্য, গগন পটুয়া, পিতাপুত্র প্রভৃতি রচনা অত্যন্ত সুখপাঠ্য এবং তথ্যবহুল। বঙ্কিম-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সরস প্রবন্ধের অন্যতম রচয়িতা ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

বঙ্গদর্শন গোষ্ঠী

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

ইনি সংস্কৃত কলেজের সেরা ছাত্র ছিলেন, অসাধারণ পাণ্ডিত্যও অর্জন করিয়াছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও গবেষক রূপে তিনি প্রভূত খ্যাতিও অর্জন করেন। 'কাঞ্চনমালা' ও 'বেণের মেয়ে' নামে তিনি দুইখানি উপন্যাস রচনা করেন। কিন্তু গবেষণা ও বিচারমূলক রচনায়ই তাঁহার দক্ষতা ছিল সর্বাধিক। 'বাল্মীকির জয়' নামক রূপক আখ্যায়িকা এবং 'মেঘদূত-ব্যাখ্যা' তাঁহার প্রতিভার পরিচায়ক। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁহার বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ ছড়াইয়া রহিয়াছে। ভাষার লালিত্যে, তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশে হরপ্রসাদের প্রবন্ধগুলি উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক রচনা।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বয়ঃকনিষ্ঠ কয়েকজন সাহিত্যিক শিক্ষিত সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কোন নূতন পন্থা উদ্ভাবন না করিলেও রাজনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য-সমালোচনা, আবেগপূর্ণ রস-রচনা দ্বারা বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের আয়তন ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সাহিত্যতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা এবং সাহিত্যের বিচারকরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়। তাঁহার প্রবন্ধ-গ্রন্থের নাম 'সাহিত্য-মঙ্গল'। বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁহার লিখিত অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ ছড়াইয়া আছে। সাহিত্য-বিচারে তিনি বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিয়াছেন। রস-রচনায়ও তাঁহার যোগ্যতা কম ছিল না। 'সহরচিত্র' ও 'সোহাগচিত্র' নামক গ্রন্থদ্বয়ে চমৎকার রস-রচনার দৃষ্টান্ত আছে। আর একজন উৎকৃষ্ট প্রাবন্ধিক ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু। তাঁহার রচনা অতি সুললিত এবং আবেগপূর্ণ। হিন্দুয়ানীর আবেগ দ্বারা তাঁহার রচনাগুলি কিঞ্চিৎ একদেশদর্শী। কথিত হয়, রবীন্দ্রনাথের 'হিং-টিং ছট্' নামক ব্যঙ্গ কবিতা ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই লেখা। তাঁহার রচিত 'শকুন্তলাতত্ত্ব', 'ফুল ও ফল', 'বংলা সাহিত্যের প্রকৃতি', 'ত্রিধারা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনাশিল্পের অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। যুক্তির সঙ্গে আবেগ মিশাইয়া তিনি ব্যক্তিত্ব-চিহ্নিত গদ্যরীতির অনুশীলন করিয়াছিলেন। গদ্য-রচনার মধ্যে কাব্যের ভাব ও আবেগ সঞ্চার করেন চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। ইতি 'সারস্বতকুঞ্জ' ও 'স্ত্রীচরিত্র' নামে দুইখানি গ্রন্থ লেখেন। তবে বাংলা সাহিত্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' নামক গদ্যকাব্য রচনায়। পত্নীর মৃত্যুতে উদ্‌ভ্রান্ত-হৃদয় লেখক করুণ-রসের কোমলতায়

বঙ্কিমোত্তর প্রাবন্ধিক গোষ্ঠী

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়

চন্দ্রনাথ বসু

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

দিয়া আবেগে উচ্ছ্বাসে অভিভূত হইয়া গ্রন্থখানি রচনা করেন। ভাষার কারিগরিতে, অনুভূতির নিবিড়তায়, ভাব পরিবর্তনের নাটকীয় আকস্মিকতায় চন্দ্রশেখরের গদ্যরচনা এক সময় শিক্ষিত তরুণদের প্রবল কৌতূহল সৃষ্টি করিয়াছিল। আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সহিত গভীর চিন্তাশীলতার মিশ্রণে গদ্যরীতি উদ্ভাবন করিয়া এক সময় প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ। ইনি ঢাকায় 'বান্ধব' নামক পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। 'প্রভাতচিন্তা', 'নিভৃত চিন্তা' এবং 'নিশীথ চিন্তা'—এই তিনখানি প্রবন্ধ-গ্রন্থ এক সময় প্রভূত সমাদর লাভ করিয়াছিল। সমাজনীতি, ধর্মদর্শন, ব্যক্তিচরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি অবলম্বনে কালীপ্রসন্ন ভাষার ফোয়ারা ছুটাইয়া আলোচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার রচনার এই ফেনায়িত ভঙ্গি তৎকালীন কোন কোন লেখককে বেশ প্রভাবিত করে। 'সাগরী-রীতি', অবলম্বন করায় তাঁহাকে 'পূর্ববঙ্গের বিদ্যাসাগর' বলা হইত।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

বঙ্কিম যুগে বিশুদ্ধ সাহিত্যিক প্রেরণা ছাড়া সমাজ সংস্কার ও ধর্মীয় প্রেরণায় কয়েকজন প্রতিভাবান লেখকের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক ও ধর্মনেতা রূপে, কেহ বা নিষ্ক্রিয় চিন্তাশীল রূপে গদ্যরীতি অবলম্বনে চিন্তামূলক প্রবন্ধ রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। বীরেশ্বর পাঁড়ে 'মানবতত্ত্ব', 'ধর্মবিজ্ঞান', 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' প্রভৃতি গ্রন্থ লেখেন। পূর্ণচন্দ্র বসু 'সাহিত্যচিন্তা', 'কাব্যচিন্তা', 'সমাজতত্ত্ব', 'সৃষ্টিবিজ্ঞান' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদক বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

বঙ্কিমযুগে স্বতন্ত্র লেখকগোষ্ঠী

এই লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাবুক প্রকৃতির উদাসীন লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি চিন্তাশীল দার্শনিক, পরিহাস-রসিক ব্যক্তি এবং কবি-প্রতিভা-যুক্ত খেয়ালী মানুষরূপেই প্রবন্ধ-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন। তিনি কিছু কাব্যকবিতাও লেখেন। দার্শনিক নিবন্ধ, গণিত ও যুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধীয় তাঁহার রচনাগুলি অপূর্ব। 'তত্ত্ববিদ্যা', 'নানা চিন্তা', 'প্রবন্ধমালা', 'চিন্তামণি' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় আছে। তাঁহার বহু রচনা 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অসাধারণ মনীষীর গদ্যরচনা বিষয়বস্তুর বিশিষ্টতায় এবং গদ্যরীতির অপূর্বতায় বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ। মহর্ষির স্নেহধন্য এবং নববিধান ব্রাহ্মসমাজের

কেশবচন্দ্র সেন

প্রতিষ্ঠাতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন এবং প্রাবন্ধিকরূপেও বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। ইনি ধর্মীয় প্রেরণায় যে-সমস্ত বক্তৃতা দিতেন তাহাই পরে সংকলিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইত। তাহাতে দেখা যায় যে সাহিত্যিক না হইলেও কেশব সেনের রচনায় সাহিত্যগুণের বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না। নিছক সাহিত্য-সেবা করিলে এই প্রতিভাবান ব্যক্তি প্রাবন্ধিকদের শীর্ষস্থানে স্থান পাইতে পারিতেন। 'জীবন বেদ' নামক বক্তৃতা-সংকলন গ্রন্থে তাঁহার প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। 'সুলভ সমাচার', 'নববিধান', 'বালকবন্ধু' প্রভৃতি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা এবং লেখকরূপে তিনি প্রশংসনীয় গদ্যরীতির নিদর্শন রাখিয়া

স্বামী বিবেকানন্দ

গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দও ছিলেন কেশব সেনের মত একজন ধর্মনেতা। ইনিও বিশুদ্ধ সাহিত্যিক প্রেরণায় গদ্য নিবন্ধ রচনা করেন নাই। তবুও তাঁহার রচনাবলী বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। স্বামীজি ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজীর বাংলা অনুবাদ করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গুরুভাইদের ও শিষ্যদের কাছে লেখা কিছু চিঠিপত্র, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, দৈনন্দিন লিপি প্রভৃতির মাধ্যমে স্বামীজির মৌলিক গদ্য রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। রচনাশিল্পে তিনি চলিত রীতির পক্ষপাতী ছিলেন। 'ভাববার কথা' গ্রন্থখানিতে যে উৎকৃষ্ট গদ্যরীতি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার তুলনা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', 'পত্রাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা গদ্য সাহিত্যে অতি মূল্যবান সংযোজন।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালীর মনীষা তুঙ্গাশ্রয়ী হইয়াছিল। গদ্য নিবন্ধের উৎকর্ষে এই যুগ অসাধারণ সমৃদ্ধি প্রদর্শন করে। জাতীয়

উপসংহার

জীবনের এমন একটি বিষয় ছিল না, যাহা অবলম্বনে মনীষা ও পাণ্ডিত্যের দীপ্তি প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধ রচনা হয় নাই। কয়েক বছরের মধ্যে গদ্যরীতির এমন বিস্ময়কর বিস্তার সাহিত্যের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ঘটনা।

২০। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের কয়েকজন উল্লেখ-যোগ্য প্রবন্ধকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিরূপণ কর।

উত্তর। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীস্পর্শে অভিনব মূর্তি ধারণ করিয়া বাংলা সাহিত্যের গৌরবের বিষয় হইয়াছে। বিষয়বস্তুর বিস্তারে, মননশীলতায়, ব্যক্তিত্বের স্পর্শে ও তথ্যের প্রাচুর্যে প্রবন্ধসাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধি-লাভ করে। বঙ্কিমোত্তর যুগে বঙ্কিমের অনুবর্তী লেখকেরা বঙ্কিম-প্রবর্তিত ধারায় প্রবন্ধকে উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক রচনায় পরিণতি দিয়াছিলেন। সে যুগে প্রাবন্ধিকদের অগ্রণী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রবন্ধ কবিত্বের স্পর্শে, কল্পনার সৌন্দর্যে এবং প্রকাশের মহিমায় রস-সাহিত্যের প্রতিস্পর্ধী হইয়া উঠিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে এবং তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী যুগে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে আরও ব্যাপকতা ও ভাবগভীরতার সৃষ্টি হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী প্রবন্ধসাহিত্য

রবীন্দ্রোত্তর যুগের কয়েকজন বিশিষ্ট গদ্য-শিল্পীর আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই বলেন্দ্রনাথের কথা স্মরণ হয়। ইনি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং বাল্যাবধি রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে থাকিয়া পিতৃব্যের চিন্তাপ্রণালী ও প্রকাশভঙ্গির অনুশীলন করিতে পারিয়াছিলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় বলেন্দ্রনাথ নানা বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। 'চিত্র ও কাব্য' নামক প্রবন্ধ-সংকলনটি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে তাঁহার বিশিষ্ট প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করা হইয়াছে। সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃত ভাষারীতির সহিত যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন, সাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডারের দ্বারও তাঁহার কাছে উন্মোচিত ছিল। ইহার সহিত মৌলিক চিন্তা, গবেষণালব্ধ জ্ঞান এবং উৎকৃষ্ট ভাষাশিল্পের সহায়তায় তিনি সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় নানাজাতীয় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করেন। রামেন্দ্রসুন্দর মন্তব্য করিয়াছিলেন—"বয়সে বালকত্ব অতিক্রম করিবার পূর্বেই তিনি প্রৌঢ়ত্বের দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টি-ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন।" বলেন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী হইলে বাংলাসাহিত্যে অপূর্ব রত্নসমাবেশ করিতে পারিতেন।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গদ্য-রচয়িতারূপে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে দীপ্যমান হইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের খুল্লতাত বিখ্যাত চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ

করিয়া ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ভারতীয় চিত্রশিল্পকে তিনি অনন্ত সমৃদ্ধি দান করিয়াছিলেন। গদ্যশিল্পীর ভূমিকায় তিনি বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে যে মহামূল্য রত্নসমাবেশ করিয়াছেন তাহার মূল্য নিতান্ত কম নয়। তাঁহার গদ্যরীতির মধ্যে চিত্রশিল্পের অপূর্ব সুষমা সন্নিবেশিত। তিনি খেয়ালী কল্পনার বিচিত্র ভাবে বিভোর হইয়া আলাপচারী ভঙ্গিতে প্রবন্ধ রচনা করিতেন। তাঁহার গদ্যভঙ্গিতে তাঁহারই স্বকীয়তা, উহা অনুকরণযোগ্য নহে। তিনি প্রথম লিখিয়াছিলেন 'ক্ষীরের পুতুল' এবং 'শকুন্তলা'। তাহার পর লিখিয়াছেন 'বাংলার ব্রত' (১৯০৯), 'রাজকাহিনী' (১৯০৯), 'ভূতপতরীর দেশ' (১৯১৫) 'খাতাঞ্চির খাতা' (১৯১৬)। এই রচনাগুলি বিশুদ্ধ প্রবন্ধ নয়। কোনটি ইতিহাসাশ্রয়ী, কোনটি কল্পনাবিলাস, কোনটি বস্তুগত ঘটনা বা তথ্যের রসরূপ। শিল্পিমনের কল্পনা-রঙে তিনি রচনাগুলিকে মণ্ডিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিণত বয়সের রচনাবলীতে চিন্তার গভীরতার সঙ্গে বাক্‌শিল্পের সরসতার আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে প্রদত্ত তাঁহার "বাগীশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী" (১৯৪৯) প্রবন্ধ-সাহিত্যে বিস্ময়কর সংযোজন। এই সময়কার অন্যান্য রচনা 'ঘরোয়া', 'জোঁড়াসাকোর ধারে', এবং 'আপন কথা' স্মৃতিসুরভিত অপূর্ব রচনা। আলাপের ঢঙে, কৌতুকরসের বৈচিত্র্যে স্মৃতিমূলক আলোচনায় গদ্যরীতি যে কত উন্নত স্তরে উন্নীত হইতে পারে অবনীন্দ্রনাথের এই গ্রন্থগুলি তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন প্রবন্ধ রচয়িতাদের মধ্যে প্রতিভার দীপ্তিতে সর্বাপেক্ষা বেশী ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। বিদ্যাবত্তা, মননশীলতা, স্বাদেশিকতা ও ভাবগভীরতায় তাঁহার তুল্য ব্যক্তি তৎকালীন বাংলাদেশে ছিলেন কিনা সন্দেহ। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম। মেধাবী ছাত্ররূপে তিনি প্রতি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। রিপন কলেজের (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) তিনি অধ্যক্ষ এবং বিজ্ঞানের বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মত সর্বশাস্ত্রবিদ্ প্রগতিবাদী পণ্ডিত খুব কমই দেখা যায়। নূতন যুগে বিজ্ঞানতত্ত্ব ও ধর্মজিজ্ঞাসা নূতন পথে প্রবর্তিত হইবার মুখে যে নূতন জীবন-জিজ্ঞাসা জাগে তাহা অবলম্বনেই রামেন্দ্রসুন্দর

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

দৃঢ়হস্তে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা', 'কর্মকথা', 'চরিত্র-কথা', 'নানাকথা' 'ব্রতকথা' প্রভৃতি গ্রন্থাবলীতে তিনি কথার মালা গাঁথিয়াছিলেন। কিন্তু উহা 'কথার কথা' ছিল না। প্রত্যেকটি রচনা বিজ্ঞানতত্ত্ব-নির্ভর দার্শনিকতায় অপূর্ব। বৈজ্ঞানিক অথচ ধর্মবিশ্বাসী, যুক্তিবাদী অথচ হৃদয়বান এই মনীষী নূতন ধরণের প্রবন্ধ রচনার ভবিষ্যৎ সূচনা করিলেন। তিনি দুরূহ তত্ত্বসমূহ চিত্তাকর্ষক প্রণালীতে নানা দৃষ্টান্ত উদাহরণের সার্থক সমাবেশে, কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের চতুর ইঙ্গিতে এবং সর্বোপরি কল্পনারসের মধুর নির্যাসে সহজসুন্দর করিয়া উপস্থাপন করিতে জানিতেন। তাঁহার রচনা প্রসাদগুণে, স্মিত কৌতুকের স্নিগ্ধচ্ছটায় অপূর্ব হইয়া উঠিত। রামেন্দ্র-সুন্দরের রচনা শুধু বিজ্ঞান ও দর্শনতত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, সাহিত্য-সমালোচনায়ও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন দিক ছিল না যেদিকে তিনি লেখনী পরিচালনা করেন নাই। গঠনশিল্পে তাঁহার প্রবন্ধে কিছু ত্রুটি ছিল। বুদ্ধির বিচার এবং যুক্তির সারবত্তার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি ছিলেন বলিয়া অনেক প্রবন্ধ আয়তনে দীর্ঘ হইয়াছে এবং স্থলবিশেষে প্রসঙ্গান্তরের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। তথাপি প্রবন্ধসাহিত্যে তাঁহার দান অসামান্য।

প্রমথ চৌধুরী

বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী একজন বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। ইনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করেন এবং রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াও রবীন্দ্র ভাব-কল্পনা দ্বারা প্রভাবিত হন নাই। পাবনার বারেন্দ্র জমিদার বংশে তাঁহার জন্ম, ইয়োরোপে তাঁহার শিক্ষা, নাগরিক বৈদগ্ধ্যে তাঁহার রুচি। বাংলা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া 'সনেট পঞ্চাশৎ', 'পদচারণা' নামক কাব্যগ্রন্থ এবং 'চার ইয়ারী কথা', 'নীললোহিত', 'আহুতি', 'ফার্স্ট ক্লাশ', 'বড়বাবুর বড়দিন' প্রভৃতি কয়েকখানি গল্পসাহিত্য রচনা করিলেও প্রাবন্ধিকরূপেই তাঁহার খ্যাতি। আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন যে প্রমথ চৌধুরী মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত প্রবন্ধকার। তাঁহার সমস্ত রচনা, এমন কি গল্প এবং কাব্যও প্রবন্ধধর্মী। 'বীরবল' ছদ্মনামে তিনি 'সবুজ পত্র' নামক মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে এক যুগান্তর সৃষ্টি করিলেন। চলিত ভাষা প্রয়োগে প্রবন্ধ রচনা এবং চিন্তার ক্ষেত্রে সংস্কার মুক্তি, স্বাধীন মনন ও যুক্তিনিষ্ঠতার প্রবর্তন দ্বারা বীরবল বাংলা সাহিত্যে

স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। 'তেল-হুন-লকড়ী' (১৯০৬), 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৭), 'নানা কথা' (১৯১৯), 'নানা চর্চা' (১৯৩২) প্রভৃতি প্রবন্ধে বীরবল অভিনব প্রাবন্ধিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

(প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধরচনা-রীতি 'বীরবলী ঢঙ' নামে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিন্দিত ও প্রশংসিত হইয়াছে। প্রবন্ধরচনায় ইনি যে মননশীলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে মজলিসী আলাপের সুর ও খেয়ালখুশির বৈশিষ্ট্য। তাঁহার যুক্তিগুলি তীক্ষ্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু লঘুকল্পনা ও কথার মারপ্যাচে হৃদ্য হয় নাই। বীরবলী প্রবন্ধে আঙ্গিকের দৃঢবদ্ধতা নাই। ফলে যে-কোন বিষয়ের আলোচনায় অনবরতই প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা হয়। বীরবলের প্রবন্ধে স্বচ্ছন্দ মানস বিচরণের সর্পিল গতি পাঠককে যেমন সচকিত করে তেমনি বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় করিয়া ফেলে। আগাগোড়া বৈঠকী মেজাজে বীরবল বাঙ্গালীর স্বভাবসিদ্ধ ভাবপ্রবণতা ও প্রচলিত ধারণাবিশ্বাসকে শ্লেষব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করিয়াছেন। ফরাসী ভাষায় পণ্ডিত এই ব্যক্তি ফরাসী প্রবন্ধসাহিত্যের বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও মননশীলতা বাংলাদেশে প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। বীরবল মনে করিতেন যে ভাববিলাসের দিন ফুরাইয়া গিয়াছে, সংস্কারমুক্ত মন লইয়া, মার্জিত রুচি লইয়া জীবন ও কর্মকে নূতনভাবে পরিচালিত করিতে হইবে। তাঁহার প্রবন্ধে সমাজ, সাহিত্য, সৌন্দর্যতত্ত্ব, সঙ্গীততত্ত্ব, ধর্ম, নীতি প্রভৃতি বহু বিষয়ের নির্মোহ আলোচনা আছে। ভাষার মধ্যে শ্লেষ-বক্রোক্তির প্রাধান্য, কালোয়াতী মারপ্যাচের চমক সাধারণ পাঠকের কাছে প্রবন্ধগুলিকে দুর্বোধ্য করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার ভাষায় বড় বেশি 'প্যারাডক্সের খোঁচা' রচনার প্রাঞ্জলতাগুণকে বিনষ্ট করিয়াছে। তবু বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, পরিহাসকুশলতা, বুদ্ধির সূক্ষ্মতা এবং মননের বিশিষ্টতায় বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য বীরবলের হাতে অদ্ভুত বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে।)

বীরবলী প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য

বীরবলী যুগের প্রবন্ধ-রচয়িতাদের মধ্যে আর একজন ছিলেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ছিলেন মূলত সাংবাদিক। বিপিন পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি নেতৃবর্গ ধর্মপ্রচার ও রাজনৈতিক বক্তৃতায় বাংলা গদ্য-প্রবন্ধের মধ্যে আবেগ ও ওজস্বিতা সঞ্চার করেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকরূপে নানা প্রবন্ধ লেখেন এবং সাহিত্য বিষয়ক সমালোচনায়ও বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মতবাদে তিনি ছিলেন বঙ্কিমপন্থী। ঠাকুরবাড়ীর

ভাবধারা এবং বীরবলী চিন্তা-প্রণালী তিনি সমর্থন করেন নাই। সম্প্রতি তাঁহার প্রবন্ধাবলীর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় এই প্রবন্ধকারের সূক্ষ্ম চিন্তা ও বিস্ময়কর বিশ্লেষণপদ্ধতির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। এতাবৎ কাল তাঁহার রচনাবলী বিভিন্ন সাময়িক পত্রের মধ্যে ছড়াইয়া ছিল, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবন ও চিন্তাকে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সরল ভাষায়, তথ্যসমৃদ্ধ ভঙ্গিতে এবং যুক্তিনিষ্ঠ উপায়ে প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধ রচনায় প্রভূত উৎকর্ষ দেখাইয়াছিলেন।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে বিভিন্ন গুণের সমাবেশ হইয়াছিল। চিন্তার বলিষ্ঠতায় এবং প্রকাশের বিশিষ্টতায় পাশ্চাত্ত্য গদ্যের অনুসরণ কোন কোন প্রবন্ধকারের মধ্যে দেখা গেল। একদল প্রাবন্ধিক রম্যরচনা নামক একজাতীয় খেয়ালখুশি রচনায় উৎসাহী হইলেন। কিন্তু ইঁহাদের কাহারও প্রতিষ্ঠা তেমন হয় নাই। এই পরিমণ্ডলের বাহিরে নিজের স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট একজন প্রাবন্ধিকের উদ্ভব হইল। ইনি মোহিতলাল মজুমদার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কাজ করিতেন, রবীন্দ্র-বিরোধী গোষ্ঠীতে যোগ দিয়া কবিতা লিখিতেন এবং সাহিত্যসমালোচনামূলক গদ্য রচনায় গভীর নিষ্ঠার পরিচয় দিতেন। 'কবি-সমালোচক মোহিতলাল' নামে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। মোহিতলালের প্রবন্ধগুলি সমস্তই সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য-সমালোচনামূলক। তিনি 'সত্যসুন্দর দাস' ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া সাহিত্যের স্বরূপ, সংজ্ঞা, আদর্শ, লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে থাকেন। পরে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন প্রভৃতি সাহিত্যের দিক্‌পালগণের কবি-কৃতির বিশ্লেষণ ও বিচার করিতে থাকেন। ক্রমশঃ বাংলায় সর্বশ্রেণীর লেখকদের সম্বন্ধেই সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করিয়া সমালোচনা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। 'সাহিত্য কথা' গ্রন্থে তিনি সাহিত্যের বিশুদ্ধ আদর্শ নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন। 'সাহিত্য বিতান', 'বাংলার নবযুগ', 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', 'বঙ্কিমবরণ' 'শ্রীমধুসূদন', 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' প্রভৃতি গ্রন্থে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের তিনি একটি সমুন্নত আদর্শ স্থির করিয়া দিয়াছেন। সাহিত্যের রসপ্রমাতারূপে মোহিতলাল বাংলা সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। কবি-শিল্পী মোহিতলালকে অতিক্রম করিয়া সাহিত্য-বিচারক প্রাবন্ধিক মোহিতলালের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

মোহিতলাল মজুমদার

সাম্প্রতিক কালে প্রবন্ধ সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি বিভিন্নমুখী হইয়াছে। পূর্বে বাংলা দেশের মনীষীদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী এবং স্বদেশ-বৎসল ব্যক্তিরাই বাংলা সাহিত্যের চর্চা করিতেন। কিন্তু বর্তমানে, ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিরাও তাঁহাদের দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় গবেষণার বিষয়গুলি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন না। ইহার ফলে বাংলা গদ্যনিবন্ধ বিষয়-বৈচিত্র্যে ও আয়তনে প্রসার লাভ করিতেছে। সুনীতিকুমার, শ্রীকুমার, সুবোধকুমার, সুকুমার, প্রমথনাথ, বিজনবিহারী, আশুতোষ, শশিভূষণ, নীহাররঞ্জন প্রভৃতি প্রখ্যাত অধ্যাপকবৃন্দ তাঁহাদের চিন্তা ও গবেষণামূলক বিষয়গুলিকে প্রকাশ করিয়া বাংলা গদ্যসাহিত্যের সমৃদ্ধির সূচনা করিয়াছেন। বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধীয় গবেষণাগুলিও কেহ কেহ গদ্যনিবন্ধে প্রকাশ করিতেছেন। তবে এখনও উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী-ভাষায় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বিদেশীয়দের সমাদর প্রত্যাশা করেন। তথাপি দেখা যাইতেছে যে বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাগুলিকেই ক্রমশঃ অধিকার করিতেছে।

সাম্প্রতিক প্রবন্ধ-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি

সাম্প্রতিক প্রবন্ধ-সাহিত্য শুধু চিন্তা ও মননশীলতার ক্ষেত্রে জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের সীমায় আবদ্ধ নাই। হৃদয়ের অনুভূতির রসের সহিত প্রজ্ঞা ও মননকে মিশাইয়া একপ্রকার রচনা অধুনা খুব জনপ্রিয় হইয়াছে। ইহাতে বিষয় অপেক্ষা বিষয়ীর প্রাধান্য; অর্থাৎ রচনার বিষয় যাহা খুশি হউক না কেন, রচয়িতা নিজের রসবুদ্ধি ও অনুভূতিকে রচনায় অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দিয়া তথ্যের কাঠিন্যের মধ্যে গল্প-কৌতূহলের মাধুর্য মিশাইয়া দেন। এই জাতীয় রচনার নাম রম্যরচনা। রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মীয় সভার বিবরণ' ও 'গ্রাম্য উপাখ্যানে' ইহার সূচনা। বঙ্কিমের 'দপ্তর' এবং রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' প্রভৃতিও ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রূপে রম্যরচনার পথিকৃৎ। আধুনিক কালে বাক্‌শিল্পী কৃতী লেখকেরা নানা তত্ত্ব ও নানা তথ্যকে স্নিগ্ধ কৌতুকরসের সাহায্যে প্রকাশ করেন এবং জীবনের নানা অভিজ্ঞতা এবং মননের নানা ভঙ্গিকে বাক্‌শিল্পের বিস্ময়কর চাতুর্যে গল্পের মত কৌতূহলোদ্দীপক করিয়া তোলেন। ইহার মধ্যে লেখকের ব্যক্তিমনের প্রসন্নতা ও আনন্দজনক অনুভূতির সাবলীল ও সচ্ছন্দ প্রকাশ হয় বলিয়া রচনাগুলিতে কবিত্বের স্বাদও পাওয়া যায়। ইহা যেন ছোটগল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের এক বিচিত্র 'পানক রস'। বুদ্ধদেব বসুর 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' (১৯৩৫) এই জাতীয় রচনার

রম্য রচনা

স্পষ্ট রূপ লইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। তাহার পর বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পরিমল রায়, সৈয়দ মুজতবা আলি, যাযাবর, রঞ্জন, রূপদর্শী, অবধূত প্রভৃতি অনেকেই রম্যরচনার বহুবিধ বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিতেছেন। এই রচনাগুলি নানা কারণে মনোহারী এবং কোন কোন রচনা হয়ত সাহিত্যের দরবারে স্থায়ী আসন লাভ করিবে। তবে দুর্বল লেখকের হাতে ইহা অনেকটা ভঙ্গিসর্বস্ব হইতেছে এবং মহাকালের সম্মার্জনী হয়ত যথাকালে সাহিত্য প্রাঙ্গণ হইতে ইহাদের অপসারণও করিবে।

উপন্যাস ও গল্প-সাহিত্য

১। বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের প্রথম সূচনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া উপন্যাস সৃষ্টির প্রথম প্রচেষ্টার সাহিত্যমূল্য নিরূপণ কর।

উত্তর। বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি এবং ইংরাজ শাসন প্রবর্তনের প্রত্যক্ষ ফল। ইংরাজী নভেল ও রোমান্সের আদর্শেই আমাদের বাংলা সাহিত্যে সামাজিক উপন্যাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাস গড়িয়া উঠিয়াছিল।

নভেল ও রোমান্স

গল্প-কথার কৌতূহল মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। ঐ প্রবৃত্তির প্রেরণায়ই কথাসাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। গল্পের মধ্যে যেমন থাকে বাস্তববুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা, তেমনি থাকে রহস্যের রোমাঞ্চ; অবিশ্বাস্য অসম্ভবের দিকে মনের প্রবণতা। আখ্যানের এই দ্বিবিধ রূপ হইতেই উপন্যাস ও রমন্যাসের সৃষ্টি। ইতালীয় লেখক বোকাচিও চতুর্দশ শতাব্দীতে কতকগুলি বাস্তবধর্মী গল্প লিখিয়া তাহাদের নাম দিয়াছিলেন Novella Storie অর্থাৎ নূতন গল্প। ইহা হইতেই 'নভেল' শব্দের উৎপত্তি। তাই নভেল বাস্তবধর্মী জীবনাশ্রয়ী বিশ্বাস্য কাহিনী। মানুষের জীবনে যাহা প্রকৃত ঘটিতে পারে, সামাজিক ও ব্যক্তিক চরিত্র যাহাতে সম্ভাব্য বিশ্বসনীয় বিকাশ লাভ করে এমন বাস্তব ঘটনা অবলম্বনেই নভেল বা উপন্যাসের কাহিনী কল্পনা করা হয়। রোমান্স বা রমন্যাসে কল্পনাপ্রধান আখ্যায়িকার প্রাধান্য থাকে। অলৌকিক চিত্তচমৎকারী অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশে বিস্ময়কর কৌতূহল জাগ্রত করার উপযোগী কাহিনী রোমান্সে উদ্ভাবন করিতে হয়। চরিত্র অপেক্ষা ঘটনাগত কৌতূহল রোমান্সের প্রধান উপজীব্য। সংক্ষেপে—নভেল বাস্তবধর্মী, রোমান্স

কল্পনাপ্রাধান্য ; নভেল চরিত্রভিত্তিক, রোমান্স ঘটনামূলক ; নভেলে জীবনটা থাকে প্রত্যক্ষ, রোমান্সে জীবনটা একটু দূরস্থিত এবং কল্পনালোকের বিষয়। এই জন্যই রোমান্স-রচয়িতারা ইতিহাসের ক্ষীণালোকে বিচরণ করিয়া থাকেন।

বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসে ইংরাজী নভেল ও রোমান্স উভয়েরই প্রভাব পড়িয়াছিল। উপন্যাসের মধ্যে বাস্তববুদ্ধি ও মানবতার যে প্রাধান্য থাকে তাহা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের দেবতা-অধ্যুষিত অঞ্চলেও অল্পস্বল্প দেখা দিয়াছিল। উহা উপন্যাস নয়, কিন্তু উপন্যাসের বীজ। সংস্কৃত কথাসাহিত্য এবং পালি 'জাতক' গল্পগুলির মধ্যে কথা-কৌতূহল ছিল। বাংলা মঙ্গলকাব্যের গল্পে, বিশেষতঃ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কাহিনী-বিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণে বাস্তবমুখিতা উপন্যাসের লক্ষণ প্রকটিত করিয়াছে। রোসাঙ রাজসভায় লিখিত গল্পগুলির মধ্যে এবং মুসলমান লেখকদের লেখা প্রণয়মূলক গল্পগুলিতে রোমান্সের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সাহিত্যের বিশিষ্ট আঙ্গিকরূপে গদ্যরচনা উপন্যাস উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী আদর্শ অবলম্বন করিয়াই সৃষ্ট হয়।

উপন্যাসের সূচনা

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার প্রথম প্রচেষ্টা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় 'মধুমল্লিকাবিলাস' নামক একখানি কাব্যগ্রন্থের উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন "পদ্যে লেখা হইলেও বইটি উপন্যাসই।...... গার্হস্থ্য উপন্যাসের অসন্দিগ্ধ বীজ বর্তমান।" পুঁথিখানি ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের রচনা। রচয়িতার নাম মধুসূদন চক্রবর্তী। ইহারও পূর্বে সামাজিক নক্সাজাতীয় রচনায় উপন্যাসের অঙ্কুর উদ্‌গত হইয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের লেখা নীতিমূলক কাহিনীগুলির মধ্যে কেহ কেহ উপন্যাস সাহিত্যের সম্ভাবনার সন্ধান পাইয়াছেন। উহা হয়ত বিচারসহ নহে। ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাস' নিতান্ত নক্সাজাতীয় ব্যঙ্গরচনা হইলেও কাহিনীর বাস্তবতা ও চরিত্র সৃষ্টিতে উপন্যাসের মূল লক্ষণ দেখা যায়। প্যারীচাঁদ ভবানীচরণের অনুসরণে জনশিক্ষামূলক স্কেচ্ রচনা করিতে গিয়া সার্থক উপন্যাসের সম্ভাবনা সূচিত করিয়াছিলেন।

উপন্যাস রচনার প্রথম প্রচেষ্টা

প্যারীচাঁদের "আলালের ঘরের দুলাল" নামক কাহিনীটিকে অনেকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা দিতে চাহেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "ফুলমণি ও

করুণার বিবরণ” নামক রচনাটি ঐতিহাসিক বিচারে বাংলা সাহিত্যে প্রথম বাস্তবধর্মী উপন্যাস। হানা ক্যাথারীন মূলেন্স নামে একটি বিদেশিনী খ্রীষ্টান মহিলা The Last Day of the Week নামক একটি ইংরাজী আখ্যানের ছায়া অবলম্বনে একটি দরিদ্র খ্রীষ্টান পরিবারের জীবনচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। বইখানি দেশীয় খ্রীষ্টান স্কুলে দীর্ঘকাল পাঠ্যপুস্তক রূপে পড়ান হইত। ধর্মত্যাগী বাঙ্গালী খ্রীষ্টানদের দৈনন্দিন আচরণমূলক কাহিনী ইহাতে থাকায় বাঙ্গালী হিন্দু সম্প্রদায় বইখানির খোঁজও রাখিত না। তদুপরি বইখানির ভাষা অত্যন্ত সরল ও সুন্দর হইলেও ঘটনাবিন্যাসের কোন কৌশল ছিল না, চরিত্র সৃষ্টির কোন বিশেষত্ব ছিল না বলিয়া রসিক সম্প্রদায় দীর্ঘ বিবৃতিমূলক একটানা গল্পটিকে উপন্যাসরূপে সমাদর করেন নাই। প্রথম যুগের সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার উল্লেখও নাই। সাম্প্রতিক কালে গ্রন্থখানি পুনঃ প্রকাশিত ও আলোচিত হইতেছে।

হানা ক্যাথারীন মুলেন্সের ফুলমণি ও করুণার বিবরণ

‘আলালের ঘরের দুলাল’ই প্রথম সার্থক উপন্যাস। ইহা উপদেশাত্মক এবং নক্সাজাতীয় হইলেও ইহা জীবনধর্মী উপন্যাস। প্যারীচাঁদ এই গ্রন্থে চরিত্র, কাহিনী, বাস্তব পরিবেশ, অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া উপন্যাসের প্রথম বনিয়াদ রচনা করেন। বাবুরাম বাবুর বর্ণনা প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর জীবনচিত্র জীবন্ত আলেখ্যরূপে দেখা দিয়াছে। চরিত্র সৃষ্টিতেও টেকচাঁদ ঔপন্যাসিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। কেন্দ্রীয় চরিত্র মতিলাল বড়লোকের ঘরের ‘আদুরে’ ছেলের যথার্থ প্রতিভূ। এটনির কেরানী বাঞ্ছারাম, বক্রেশ্বরবাবু এবং ঠকচাচা প্রভৃতি প্রত্যেকটি চরিত্র নিপুণ তুলিকায় আঁকা। মুকুন্দরামের ভাঁড়ুদত্তের মত ঠকচাচা একটি বিশিষ্ট চরিত্র, কাহিনীর গতি নিয়ন্ত্রণে একটি উল্লেখযোগ্য শক্তি। সাহিত্যের দরবারে ‘ঠকচাচা’ একটি চিহ্নিত চরিত্র যাহাকে type চরিত্র বলা যায়। টেকচাঁদের উপন্যাসে প্রধান দোষ নীতিমূলকতা ও কাহিনীবন্ধনে শিথিলতা। মনে হয় কতকগুলি নক্সাচিত্র যেন একটি দুর্বল সূত্রে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। তথাপি এই গ্রন্থখানিই আমাদের বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম জীবনাশ্রয়ী উপন্যাস। অবশ্য Picwick Papers এর মত চিত্রোপন্যাস বলাই উচিত।

টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালের ঘরের দুলাল

উপন্যাস রচনার দ্বিতীয় উদ্যম ‘হুতোম প্যাঁচার নক্সা’। তবে রচনাটি

নামেও নক্সা, কাজেও নক্সা ; উপন্যাসের লক্ষণ ইহার মধ্যে নাই বলিলেই হয়। সমসাময়িক সমাজচিত্র অবলম্বনে গল্পরস সৃষ্টির চেষ্টা আছে বলিয়া কথা-সাহিত্যের প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ করিতে হয়। 'হুতোম' ছদ্মনামে কালীপ্রসন্ন সিংহ এই গ্রন্থখানি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। কলিকাতার সম্পন্ন গৃহস্থদের জীবনযাত্রা, তৎকালীন পূজাপার্বণ ও সামাজিক উৎসবের নিখুঁত বিবরণ গ্রন্থখানিতে পাওয়া যায়। কথ্য ভাষায় অভব্য ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে রচিত এই গ্রন্থখানিকে কথা-সাহিত্যের মর্যাদা দেওয়া যায় না। বইখানি কালীপ্রসন্নের রচনা কিনা সন্দেহ। পণ্ডিতদের অনুমান কালীপ্রসন্নের বয়স্য 'হরিদাসের গুপ্ত কথা' গ্রন্থের লেখক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহা লিখিয়া সিংহমহাশয়ের আনুকূল্যে প্রকাশ করেন।

হুতোম প্যাঁচার নক্সা

উপন্যাস সাহিত্যের আর একদিক রোমান্স রচনা। এই দিকে প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গন্তব্য স্থলে পৌঁছিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মাঝখানে ব্যর্থ উদ্যম করিয়াছিলেন গোপীমোহন ঘোষ এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। রোমান্স রচনার ইহাই প্রাথমিক প্রচেষ্টা। কণ্টার নামক একজন ইংরাজ লেখকের রোমান্স অফ হিস্ট্রী বই হইতে দুইটি কাহিনী লইয়া ভূদেব 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৬২) লেখেন। প্রথম কাহিনী 'সফল স্বপ্ন' অনেকটা প্রবাদমূলক। দ্বিতীয় কাহিনী 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র উৎস The Marhatta Chief. শিবাজীর সহিত সম্রাট ঔরংজেবের কন্যা রোসিনারার প্রণয় অবলম্বনে কাহিনীটি রচিত। ভূদেব ইহার কাহিনীপরিকল্পনায় মূলের হুবহু অনুকরণ না করিয়া স্বীয় ভাবকল্পনার সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। ইনি "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" গ্রন্থেও তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ অবলম্বনে বিস্ময়কর কল্পনাচাতুর্যের পরিচয় দিয়াছেন। ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস রচনার ইহাই সূত্রপাত। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ছিলেন বিশিষ্ট বিদ্বান অধ্যাপক। ইনি ফরাসী ভাষার "পল ও ভার্জিনিয়া" অনুবাদ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'বিচিত্র-বীর্য' (১৮৬২) এবং 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথাভ্রমণ' ইতিহাসাশ্রিত রোমাণ্টিক রচনা। নায়ককে গল্পের বক্তারূপে স্থাপন করিয়া তাহার বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে লেখক একটি দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তির ব্যর্থ ভ্রমণকাহিনী রূপে উপস্থিত করিয়াছেন। ঘটনা-বিন্যাসে ও কল্পনাবিস্তারে গ্রন্থখানি যথেষ্ট রোমান্সরস পরিবেষণ করিয়াছে, কিন্তু উপন্যাসের সংহতিজাত বাস্তবমুখী রসবিকাশ করিতে পারে নাই।

রোমান্স রচনার সূত্রপাত

গোপীমোহন ঘোষ অযোধ্যার রাজপরিবারের কাহিনী অবলম্বনে 'বিজয়-বল্লভ' নামে একখানি উপন্যাস লেখেন। ইহার প্রকাশকাল ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ। গ্রন্থখানিতে অবিশ্বাস্য ঘটনা ও অলৌকিকতার এত বাহুল্য যে ইহা রূপকথার রহস্য হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থখানি এক সময় আদৃত হইয়াছিল, কিন্তু উপন্যাসের মর্যাদা পায় নাই।

সূচনা পর্বের উপন্যাসের সাহিত্যমূল্য

উপন্যাস সাহিত্যের সূচনা পর্বে উপন্যাস সাহিত্যের গতি সামাজিক জীবনের বাস্তবতার দিকে এবং দূরবর্তী ইতিহাসের কল্পনারসের দিকে প্রবাহিত হইয়া নভেল এবং রোমান্স রচনার সূচনা করে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই শিল্পরূপের চরম সার্থকতা অর্জন করিতে পারে নাই। উপন্যাসে কাহিনী, চরিত্র এবং বাস্তব-পরিবেশের উপস্থাপনা প্রয়োজন। সর্বোপরি উপন্যাসের মধ্যে একটা গভীর জীবনসত্য আভাসিত হইয়া উঠে। প্রথম যুগের উপন্যাস-নামাঙ্কিত গল্পকথাগুলির মধ্যে জীবন সম্বন্ধে একটা তরল কৌতূহল এবং নীতিবাদ প্রতিপন্নের চেষ্টা থাকায় রচনাগুলি নক্সা জাতীয় হইয়াছে। রোমান্স রচনার চেষ্টার মধ্যেও জীবনের গভীরতম সত্যকে, দূরবর্তী কল্পনালোকের সহিত নিকটবর্তী বাস্তবলোকের সার্থক মিলনকে প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই। ফলে রচনাগুলিতে তরল ভাবকল্পনা ও অস্পষ্ট রহস্যের রোমাঞ্চমাত্র সৃষ্ট হইয়াছে। বঙ্কিমের সরল-লেখনীর মুখে রোমান্স ও উপন্যাস উভয়ই সার্থক শিল্পরূপ লাভ করিয়াছিল।

২। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের দানের পরিমাণ নির্দেশ কর।

উত্তর। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। বস্তুতঃ তাঁহারই হাতে উপন্যাসের আকৃতি ও প্রকৃতি সুনির্দিষ্ট হইয়া সার্থক শিল্পপরিণতি লাভ করিয়াছিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কাঁঠাল পাড়ায় তাঁহার জন্ম।

বঙ্কিমের ব্যক্তিপরিচয় ও তাঁহার রচনা

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ. এবং কৃতী ডেপুটীরূপে সরকারী কর্ম সম্পাদন করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত হয়। আজীবন বাংলা সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া বঙ্কিম বাঙ্গালী জাতির সাহিত্যভাণ্ডারে অমূল্য রত্নসমূহ সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন। উপন্যাস সাহিত্যের ভিত্তি রচনা হইতে আরম্ভ করিয়া সৌধ রচনার কাজ তাঁহার বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর হইয়া আছে।

তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস—দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), মৃণালিনী (১৮৬৯), রাজসিংহ (১৮৮২); ইতিহাসমিশ্র রোমান্টিকতায় জীবনসমস্যামূলক উপন্যাস—কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫); ইতিহাসমিশ্র ধর্মতত্ত্বাশ্রিত উপন্যাস—আনন্দমঠ (১৮৮৪), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭); পারিবারিক জীবনাশ্রয়ী সমাজিক উপন্যাস—বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), রজনী (১৮৭৭), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮); ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত জীবনাশ্রয়ী রোমান্টিক উপন্যাস—ইন্দিরা (১৮৭৩), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪) এবং রাধারাণী (১৮৮৬)। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৫ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ জীবনের বাইশ বৎসর উপন্যাস রচনা করেন এবং শেষ সাত বৎসর শাস্ত্র, সংহিতা ও ধর্মতত্ত্বালোচনায় অতিবাহিত করেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস ও রোমান্স অবলম্বনেই প্রথম উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' 'মৃণালিনী' এবং 'রাজসিংহ' তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইতিহাসের সঙ্গে রোমান্সরস মিশাইয়া তিনি যে অপূর্ব কাহিনী রচনা করিয়াছেন তাহা বিশুদ্ধ ইতিহাস-কথা না হইলেও ইতিহাসের সত্য-ভিত্তির উপর ঔপন্যাসিক কল্পনার মাধুর্য-বিস্তার। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের বিষয়বস্তু ইতিহাসের পটভূমিকায় স্থাপিত। ষোড়শ শতাব্দীতে উড়িষ্যার অধিকার লইয়া মোগল-পাঠানের দ্বন্দ্বসংঘাতের ইতিহাস-কথা-সূত্রে বঙ্কিম মানবজীবনে প্রেমের আবির্ভাব ও মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের বিচিত্র কাহিনী রচনা করিয়াছেন। মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ প্রসিদ্ধ না হইলেও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইনি এই কাহিনীর নায়ক। দুর্গাধিপতি বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা তিলোত্তমা নায়িকা। তিলোত্তমার মা বিমলার জীবনেতিহাস বড় বিচিত্র। নবাবনন্দিনী আয়েষা জগৎসিংহের অনুরাগিণী, সেনাপতি ওসমান আয়েষার প্রণয়-প্রার্থী। বঙ্কিম ইতিহাসের ঘটনাবহুলতার মধ্যে মানুষের হৃদয়বৃত্তি ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব চমৎকার ফুটাইয়াছেন। আয়েষার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মবিসর্জন সমগ্র কাহিনীতে করুণরসের

ঐতিহাসিক উপন্যাস
দুর্গেশনন্দিনী

প্রলেপন দিয়াছে। ইতিহাসের পটভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের অপূর্ব আলেখ্য রচনা করিয়া বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে যুগান্তর সৃষ্টি করিলেন। Scott এর Ivanhoe এবং ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' এর সহিত 'দুর্গেশনন্দিনী'র চমৎকার সাদৃশ্য আছে।

'মৃণালিনী' উপন্যাসের পটভূমি ত্রয়োদশ শতাব্দী। মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের কাহিনী অবলম্বনে বঙ্কিম মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির রহস্যকে উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছেন। এখানেও ইতিহাস পটভূমি মাত্র, মূল বক্তব্য জীবন-সমস্যা। সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের অবিশ্বাস্য কাহিনীর পশ্চাতে বিশ্বাসঘাতকতার অস্তিত্ব অনুমান করিয়া বঙ্কিম পশুপতি নামক একটি চরিত্র কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাস অপেক্ষা প্রেমের রহস্যই এখানে প্রধান। হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রেম, পশুপতি-মনোরমার প্রেম এবং তাহার সঙ্গে মুসলমান অনুপ্রবেশের রোমাঞ্চকর রহস্য সমগ্র কাহিনীকে রোমান্সরসে পরিপুর্ণ করিয়াছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস
মৃণালিনী

'রাজসিংহ' বঙ্কিমচন্দ্রের বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস। বঙ্কিম নিজেই গ্রন্থের ভূমিকায় ইহা বলিয়াছেন। এই উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র প্রায় সবই ঐতিহাসিক এবং ইতিহাস এখানে শুধু পরিধিতে বা পটভূমিতে নাই, একেবারে কেন্দ্রস্থ হইয়া আছে। রূপনগরের রাজকুমারীকে মোগল হারেমে আনার চেষ্টা এবং তাহা লইয়া মেবারের রাণা রাজসিংহের সহিত সম্রাট ঔরংজীবের বিরোধ উপন্যাসখানির প্রধান ঘটনা। তাই ঘটনার দিক হইতে 'রাজসিংহ' বিশুদ্ধ ইতিহাস-কথা। কিন্তু শিল্পী বঙ্কিম সেনানায়ক মবারক এবং সম্রাট-নন্দিনী জেবউন্নিসাকে লইয়া শুষ্ক ইতিহাসের মধ্যে প্রেমজীবনের এক অপূর্ব রসধারা ঢালিয়া দিয়াছেন। ইতিহাসের সহিত জীবনাবেগ সংযুক্ত হওয়ায় দ্রুততালে কাহিনীর গতি অগ্রসর হইয়াছে। দরিয়া, নির্মলকুমারী, মাণিকলাল, মবারক প্রভৃতি অনৈতিহাসিক চরিত্র ইতিহাসের রথচক্রের আবর্তনে ইতিহাসের সহিত মিশিয়া গিয়া অপূর্ব জীবনবেদ রচনা করিয়াছে। রাজসিংহ উপন্যাসে বঙ্কিমপ্রতিভা তুঙ্গাশ্রয়ী হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক উপন্যাস
রাজসিংহ

ইতিহাস-মিশ্র জীবন-সমস্যামূলক উপন্যাস

ইতিহাসের পটভূমি অবলম্বনে বঙ্কিম জীবন-সমস্যার রূপায়ণ করিয়াছেন। ইতিহাস ঐ জাতীয় উপন্যাসে গতিশীল নয়, গতিশীলতার সাক্ষ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' ইতিহাসমিশ্র রোমাণ্টিকতায় জীবন-সমস্যামূলক উপন্যাসের সার্থক দৃষ্টান্ত। ইতিহাস এখানে মতিবিবি চরিত্রটির প্রয়োজনেই আনীত এবং আড়াই শত বৎসরের পূর্বেকার কাহিনীকে বাস্তবতার বিশ্বাস্যতার জন্যই কাহিনীর পটভূমিতে ইতিহাসকে রাখিতে হইয়াছে। নতুবা নির্জন সমুদ্রকূলে প্রতিপালিতা সংস্কারবর্জিতা একটি নারীর অন্তঃপ্রকৃতি বিশ্লেষণের জন্যই 'কপালকুণ্ডলা'র কাহিনী। প্রকৃতির দুহিতা সামাজিক বন্ধনে এবং বিবাহ সংস্কারে বাঁধা পড়ে কিনা, পুরুষের প্রেম কি বিচিত্র বিসর্পিল অথচ বেগবান প্রবাহে দুর্দম হইয়া উঠে এবং দুর্বার নিয়তি মানব-ভাগ্যকে কি নিষ্ঠুর পরিণতির দিকে লইয়া যায় বঙ্কিমের কবি-প্রাণ এই উপন্যাসে তাহার অনুধাবন করিয়াছে। 'কপালকুণ্ডলা' বঙ্কিমের কবি-প্রতিভা ও শিল্পকলার অতুলনীয় সৃষ্টি।

কপালকুণ্ডলা

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ইতিহাসের বেষ্টনীটি অধিকতর বাস্তব। তবু ইতিহাসের স্থান এখানে মুখ্য নয়। শৈবলিনীর বাল্যপ্রেমের দুর্দমনীয়তা তাহার জীবনে কি দুঃসহ পরিণাম সৃষ্টি করিয়াছিল তাহারই ইতিবৃত্ত উপন্যাসখানির মুখ্য বিষয়। আদর্শনিষ্ঠ বঙ্কিম চন্দ্রশেখরের চরিত্রবল, প্রতাপের অদ্ভুত সংযম, শৈবলিনীর অসংযম ও তজ্জনিত কঠোর নরকযন্ত্রণা ও প্রায়শ্চিত্ত ইতিহাসের পটভূমিকায় রাখিয়া বিচার করিয়াছেন। ইতিহাস ও মানবজীবনকে একসূত্রে বাঁধিবার আশ্চর্য কৌশল বঙ্কিমের করায়ত্ত ছিল। নীতিবাদ ও নিয়তিবাদের বিচিত্র সমীকরণ করিয়া বঙ্কিম মানবজীবনের গভীরতম কারুণ্যকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

চন্দ্রশেখর

ইতিহাস-মিশ্র ধর্মতত্ত্বাশ্রিত উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' তত্ত্বাশ্রিত উপন্যাস সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার ইতিহাস অংশ, ইহার কাহিনী কৌতূহল এবং ইহার মধ্যে দেশাত্মবোধের গভীরতম অনুভূতি তত্ত্বকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ইতিহাসটুকুকে বঙ্কিম জাতীয়তাবোধ সঞ্চারের

এবং স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনের চমৎকার উপকরণরূপে গ্রহণ করিয়া এই উপন্যাসের মাধ্যমে বাঙ্গালীকে "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছেন।

আনন্দমঠ

ঘটনার সংহতি ও চরিত্রের সংগতির দিকে দৃষ্টি দিয়া সার্থক উপন্যাস রচনা করেন নাই; কিন্তু বাঙ্গালীর জীবনবেদ রচনা করিয়াছিলেন। গীতোক্ত জ্ঞান-ভক্তি-কর্মবাদের সমন্বয় সাধন বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব। শিল্প-প্রেরণা অপেক্ষা সমাজকল্যাণাদর্শই এই উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমের লেখনীকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে।

'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমি মোগল শাসনের অন্তিম যুগের অরাজকতা। ভবানীপাঠক, রঙ্গরাজ ও দেবীচৌধুরাণীকে লইয়া বঙ্কিম

দেবীচৌধুরাণী

এক রহস্যলোক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার বক্তব্য গার্হস্থ্য ধর্মের মহিমা। গৃহস্থবধূ প্রফুল্ল অবস্থাচক্রে পড়িয়া দস্যুদলের নেত্রী হইল। প্রভূত ঐশ্বর্য ও অপরিমিত শক্তির অধিকারিণী হইলেও সে গীতার নিষ্কাম আদর্শানুসারে সব ছাড়িয়া আবার গৃহস্থবধূরূপে পুকুরঘাটে বাসন মাজিতে লাগিল। বঙ্কিম নারীর ধর্ম, গার্হস্থ্যে আদর্শ এবং ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মের তত্ত্বকথা এই কাহিনীতে শুনাইয়াছেন কিন্তু কাহিনীগ্রন্থনের কৌশলে ঔপন্যাসিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

'সীতারাম' উপন্যাসখানিতে ইতিহাসের পরিবেশটি অধিকতর জীবন্ত। সীতারাম একটি সামন্ত রাজা, হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার মত যোগ্য শক্তির

সীতারাম

অধিকারী। কিন্তু রূপজমোহ তাহার গার্হস্থ্য জীবনের সর্বনাশ করিয়াছে এবং তাহার রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানকে ধূলিসাৎ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্বের একটা বড় আদর্শের দৃষ্টান্ত রচনার জন্যই সীতারামের কাহিনী লিখিয়াছেন। ইতিহাসের সঙ্গে জীবনকে মিশাইয়া উপন্যাস-রীতির অনুমোদিত পন্থায়ই তিনি ভাগ্যতাড়িত মানুষের জীবন সম্বন্ধে পরম সত্যবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন।

পারিবারিক জীবনাশ্রয়ী উপন্যাস

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার সামাজিক উপন্যাসে। নরনারীর জীবনের আদিম সমস্যাকে লইয়া তিনি পারিবারিক জীবনের কাহিনী রচনা করিয়াছেন। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের প্রধান

বিষয়বস্তু বিধবার প্রেম। বালবিধবা কুন্দনন্দিনীকে তাহার আশ্রয়দাতা নগেন্দ্রনাথ বিবাহ করিলেন। ফলে তাহার পত্নী সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ। অনুতপ্ত নগেন্দ্রনাথের কাছে যখন সূর্যমুখী ধরা দিল তখন কুন্দ করিল আত্মহত্যা; কারণ তাহার মনে ছিল অপরাধবোধ—নগেন্দ্রনাথের পবিত্র দাম্পত্যজীবনে অনধিকার প্রবেশের অপরাধবোধ। 'বিষবৃক্ষ' রচনার সময় বাংলাদেশে বিধবা-বিবাহের সামাজিক সমস্যা ছিল। বঙ্কিম বিধবা-বিবাহের সমর্থক ছিলেন না। তিনি এই কাহিনীর আশ্রয়ে দেখাইলেন যে নিষিদ্ধ কামনার বীজ বপন করিয়া নগেন্দ্রনাথ রূপমোহের বিষবৃক্ষ সৃষ্টি করিলেন, তাহাতে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুরূপ বিষফল ফলিল। আদর্শবাদিতার একটি প্রলেপ দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর পারিবারিক জীবনের এক মহান্ চিত্র এই উপন্যাসে প্রতিফলিত করিয়াছেন।

বিষবৃক্ষ

সামাজিক উপন্যাসরূপে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। গোবিন্দলাল, রোহিণী ও ভ্রমরকে লইয়া মানবজীবনের যে বিচিত্র সংঘাত এই উপন্যাসে চিত্রিত হইয়াছে তাহার তুলনা মেলে না। গোবিন্দলালের হৃদয়ে সুপ্ত রূপমোহ এবং বালবিধবা রোহিণীর তীব্র ভোগকামনা একটি দাম্পত্য জীবনে কি নিদারুণ অভিশাপ হইল এবং তাহার ফলে ভ্রমর মরিল এবং রোহিণীকে হত্যা করা হইল। রোহিণীর প্রেম ছিল নীতিবিরুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ। গোবিন্দলালের সহিত তাহার মিলন সাময়িক মোহমাত্র। এই মিলনকে জয়ী করা সম্ভব হয় নাই। বঙ্কিম রোহিণীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছেন। ইহা শিল্পসম্মত হইয়াছে কিনা তাহা বিতর্কের বিষয়। তবু একথা অস্বীকার করা যাবে না যে প্রবৃত্তির সঙ্গে সংস্কারের দ্বন্দ্ব জীবনে যে কিরূপ বিপর্যয় আনে তাহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া মনীষী বঙ্কিম বাংলা সামাজিক উপন্যাসের রাজপথ নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

কৃষ্ণকান্তের উইল

'রজনী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনার আঙ্গিক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জীবন-সমীক্ষার একটি দার্শনিক দিক উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। একটি অন্ধ বালিকার অদ্ভুত রূপাসক্তি এবং মনস্তাত্ত্বিক কৌতূহল উপন্যাসখানির প্রধান বিষয়। লিটনের লেখা Last Days of Pompeii নামক উপন্যাসের একটি অন্ধ ফুলওয়ালী নিদিয়ার চরিত্রের অনুরূপ করিয়া বঙ্কিম রজনীর চরিত্রাঙ্কন করিয়াছেন। শচীন্দ্র-রজনীর প্রেমের প্রতিষ্ঠা যেমন এক দিকে, অপর দিকে তেমনি লবঙ্গলতা ও অমরনাথের

রজনী

সম্পর্ক। শিল্পী বঙ্কিম পতিব্রতা নারী লবঙ্গলতার হাস্যোচ্ছল জীবনের অন্তরালে একটি ব্যথাকরুণ অনুভূতির ইঙ্গিত দিয়া নারীহৃদয়ের বিচিত্র রহস্যের দিকে রসিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। রূপে-গুণে-বিদ্যায়-বুদ্ধিতে অতুলনীয় অমরনাথের জীবনের নিঃসীম শূন্যতার বেদনাও উপন্যাসখানির অন্যতম বিশেষত্ব। পাত্রপাত্রীর মুখে নিজেদের কথাগুলি রাখিয়া কাহিনী বয়নের কৌশল এই উপন্যাসে অপূর্ব। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এই আঙ্গিক ব্যবহার করা হইয়াছে। রজনী উপন্যাসে বঙ্কিম জীবন-বোধের গভীরতর পরিচয় দিয়াছেন।

ছোটগল্প লক্ষণাক্রান্ত উপন্যাস

বঙ্কিমচন্দ্র ছোটগল্প লক্ষণাক্রান্ত তিনখানি উপন্যাসে স্বল্প পরিধির মধ্যে কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী রচনা করিয়াছেন। ইহাতে রোমান্স রসের মিশ্রণই বেশি। 'যুগলাঙ্গুরীয়' হিন্দুরাজত্ব কালের পরিবেশে রচিত একটি রোমাণ্টিক প্রেমের আখ্যান। মহৎ রোমান্স রচনার পর বঙ্কিম যেন এই লঘু রচনার মাধ্যমে বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। এই প্রকার লঘু রচনা 'ইন্দিরা' নামক গল্পটিও। একটি বিবাহিতা বালিকা শ্বশুরবাড়ী যাইবার পথে দস্যু কর্তৃক অপহৃত হয়। তাহার পর দুঃসাহসিক চেষ্টায় নারীকলার সর্বপ্রকার কৌশল দেখাইয়া স্বামীর সংসারে প্রতিষ্ঠালাভ করিল। দাম্পত্য ধর্মের প্রতিষ্ঠাই এই রহস্যে-ঘেরা আখ্যানটির বৈশিষ্ট্য। ইহাতেও বঙ্কিমের প্রতিভার স্বাক্ষর আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারাণী গল্পটির মধ্যেও রোমাণ্টিকতার বৈশিষ্ট্য। লঘু রোমান্স রচনার মনোভাব লইয়াই বঙ্কিম 'রাধারাণী' রচনা করেন। দুঃস্থা বালিকা রাধারাণী রথের মেলায় মালা বেচিতে গিয়া একজন ছদ্মবেশী ভদ্রলোকের প্রভূত দাক্ষিণ্য লাভ করিল। বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া সে তাহার বিপুল পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হয় এবং সেই ছদ্মবেশীর সঙ্গেই তাহার পরিণয়ে কাহিনীর সুখসমাপ্তি ঘটে। ইহা রোমাণ্টিক প্রেমের লঘু কাহিনী কিন্তু ছোটগল্পের সূত্রপাত।

যুগলাঙ্গুরীয়

ইন্দিরা

রাধারাণী

৩। বঙ্কিম যুগের কয়েকজন প্রধান ঔপন্যাসিকের সাহিত্যকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের স্রষ্টার গৌরব বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রাপ্য। তাঁহার সমসাময়িক কালে এবং অব্যবহিত পরবর্তী যুগে বঙ্কিমের পন্থা অনুসরণ করিয়া একদল প্রতিভাবান্ ব্যক্তি বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। এই সময় উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)।

রমেশচন্দ্র দত্ত

বঙ্কিমের মত ইনি সমুচ্চ কল্পনাশক্তির অধিকারী না হইলেও ঐতিহাসিক ও গার্হস্থ্য উপন্যাস রচনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ছয়খান উপন্যাসের মধ্যে প্রথম দুইখানি রোমান্স-ধর্মী। 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪) উপন্যাসে তিনি টোডরমল্লের সমসাময়িক বাংলাদেশের ইতিহাস-কথার মধ্যে ইন্দ্রনাথ ও বিমলার রোমান্টিক প্রণয়কথার বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাস-কথা ও কাল্পনিকতা কোনটাই সার্থক হয় নাই। তাঁহার 'মাধবীকঙ্কণ' (১৮৭৭) উপন্যাসখানিতে ইতিহাস-অংশ নিতান্তই পটভূমি। সাজাহানের অন্তিমকালে পুত্রদের কলহের রাজনৈতিক পটভূমির মধ্যে একটি রোমান্টিক প্রেমের গল্প। টেনিসনের Enoch Arden গল্পের অনুকরণে রমেশচন্দ্র প্রেম সমস্যায় নরেন্দ্র, হেমলতা ও শ্রীশের শোকাবহ জীবন পরিণাম বিবৃত করিয়াছেন। বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে 'জীবন প্রভাত' (১৮৭৮) এবং 'জীবন-সন্ধ্যা' (১৮৮৯) উল্লেখযোগ্য। শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থান বর্ণিত হইয়াছে 'জীবন প্রভাত' উপন্যাসে এবং 'জীবন-সন্ধ্যা'য় বর্ণিত হইয়াছে রাজপুত জাতির পতনের বিবরণ। স্বজাতি-প্রেমের প্রেরণায় ইনি গ্রন্থ দুইখানিতে জাতির নিগূঢ় জীবনসত্যকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। ইতিহাসকে জীবনানুভূতিতে জীবন্ত করিয়া তুলিয়া তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বিধবা-বিবাহ এবং অর্থনৈতিক সমস্যাকে ভিত্তি করিয়া রমেশচন্দ্র 'সংসারে' (১৮৮৬) এবং 'সমাজে' (১৮৯৪) নামক দুইখানি সামাজিক উপন্যাস লেখেন। রচনা খুব শিল্পসম্মত না হইলেও বিধবা-বিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহের সাহসিক সমর্থনে তিনি প্রগতিবাদী মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। তদুপরি বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের প্রতিরূপ রচনায় তিনি বাস্তবতার পরিচয় দিয়া সেই যুগের পক্ষে প্রশংসার দাবী করিতে পারেন।

বঙ্কিমের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ

করিয়াছিলেন এবং প্রশংসাও লাভ করেন। সঞ্জীবচন্দ্রের ভ্রমণকাহিনী 'পালামৌ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছিলেন যে সঞ্জীবের প্রতিভায় গৃহিণীপনার অভাব। এই মন্তব্যটি তাঁহার উপন্যাস সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। তাঁহার 'মাধবীলতা' (১৮৮৫) উপন্যাসের কাহিনীবন্ধন শিথিল ও রূপকথার রহস্যে ঘেরা। এই উপন্যাসের কাহিনীর পরবর্তী ঘটনা 'কণ্ঠমালা' উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে এবং শৈল-চরিত্রে বড় আতিশয্য ও অবাস্তবতার সৃষ্টি হইয়াছে। 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' (১৮৭৭) উপন্যাসে গল্প-কৌতূহল চমৎকার; কিন্তু ঘটনার বিন্যাস ও চরিত্রের সংহতি রচনায় তিনি দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। সঞ্জীবচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'জাল প্রতাপচাঁদ' (১৮৮৩) বর্ধমানের রাজবাড়ীর ঘটনা অবলম্বনে রচিত চমৎকার কাহিনী। ইতিহাস-নিষ্ঠায় ও কাহিনী-গ্রন্থন-কৌশলে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই খেয়ালী মজলিসি মানুষটি অলস-অবজ্ঞায় ও ঔদাসীন্যে তাঁহার প্রতিভার যোগ্য পরিচয় রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমযুগে গার্হস্থ্য উপন্যাস রচনায় বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১)। বৃত্তি-জীবনে লেখক ছিলেন ডাক্তার এবং সাহিত্য-জীবনে ইনি ছিলেন বঙ্কিম-প্রভাব বর্জিত। বাঙ্গালার গ্রাম্যজীবন, যৌথ-পরিবারে ভ্রাতৃ-বিরোধ অবলম্বনে বাস্তবধর্মী উপন্যাস রচনায় ইনি সিদ্ধ-হস্ত হইয়াছিলেন। 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪) উপন্যাসখানি তাঁহার সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কীর্তি। রোমান্সের পথ পরিহার করিয়া বাঙ্গালীর প্রকৃত সংসারচিত্র যথাযথরূপে প্রকাশ করিয়া ইনি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। 'স্বর্ণলতা'র নাট্যরূপ 'সরলা'র অভিনয়ও অদ্ভুত জনপ্রিয় হইয়াছিল। একান্নবর্তী পরিবারে বড়ভাই শশিভূষণ উপার্জন-শীল, কনিষ্ঠ বিধুভূষণ গানবাজনায় ব্যস্ত। বড় বৌ নিষ্ঠুরা হইয়া সংসারটিকে ছারখার করিয়া দিল। ইহার করুণ কাহিনী উপন্যাসখানির বিষয়। প্রসঙ্গ-ক্রমে নীলকমলের চরিত্রের সাহায্যে সমাজের ও ব্যক্তিমানুষের নিপুণ আলেখ্য। তবু মনে হয় যে, তারকনাথের মধ্যে শিল্পীর এমন প্রতিভা ছিল না যে প্রতিভা বস্তুভেদী হয়, বাচ্যান্তরের অভিব্যঞ্জনা দিতে পারে। তিনি ফটোগ্রাফারের মত অসংসক্ত জীবনচিত্র আঁকিয়াছেন, জীবনদর্শন করেন নাই এবং করান নাই। তাঁহার অন্যান্য উপন্যাসগুলিতে বিষয়বৈচিত্র্য ও জীবনদর্শনের বিশিষ্টতা ছিল না বলিয়া সুচিরস্থায়ী হয় নাই। 'ললিত ও সৌদামিনী' (১৮৮২),

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

'হরিষে বিষাদ' (১৮৮৭), 'তিনটি গল্প' (১৮৮৯), 'বিধিলিপি' (১৮৯১) এবং 'অদৃষ্ট' (১৮৯২) প্রভৃতি তাঁহার রচিত উপন্যাস। কিন্তু 'স্বর্ণলতা'র খ্যাতি তাঁহার অন্যান্য রচনাগুলিকে একেবারেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

বঙ্কিম প্রবর্তিত ধারার ব্যতিক্রম করিয়া ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন প্রতাপচন্দ্র ঘোষ। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' নামক উপন্যাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের মোগল বিরোধিতা ও পরাজয় কাহিনী উপন্যাসের বিষয়বস্তু। ইনি বর্ণনায় ইতিহাসের আনুগত্য করিতে গিয়া ঘটনাগত ঐক্য এবং চরিত্রগত সংগতি রক্ষা করিতে পারেন নাই। সমগ্র রচনা নীরস বিবৃতিতে পরিণত হইয়াছে। ইনি ইতিহাসে পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু মানসিকতায় শিল্পগুণের অভাব ছিল।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবী উপন্যাস রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগেই তিনি সাবলীল সৌন্দর্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক রোমান্স এবং সামাজিক উপন্যাস রচনা করিয়া ইনি প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ ও সংযুক্তার কাহিনী অবলম্বনে লিখিত 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬) নামক উপন্যাসখানিতে তিনি কল্পনাশক্তি ও স্বদেশপ্রেমের সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন। 'মিবার রাজ', 'বিদ্রোহ', 'ফুলের মালা' প্রভৃতি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস। গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বনে লেখা তাঁহার উপন্যাসগুলিও কম আকর্ষণীয় হয় নাই। 'কোরকে কীট' নামক উপন্যাসে বহুবিবাহের কুফল দেখাইয়াছেন। উগ্র প্রগতিবাদ নারীসমাজে প্রবেশ করিলে দাম্পত্য জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খলা কিভাবে বিপর্যস্ত হয় তাহা দেখাইয়াছেন 'স্নেহলতা' নামক উপন্যাসে। 'ছিন্ন মুকুল', 'মালতী' প্রভৃতি উপন্যাসে রোমান্সরসের প্রাধান্য সত্ত্বেও সমসাময়িক সমাজজীবনের জীবন্ত চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার মত বিদুষী মহিলা-সাহিত্যিক একজনও ছিলেন না।

স্বর্ণকুমারী দেবী

বঙ্কিমযুগে অপরাপর ঔপন্যাসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দামোদর মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মীয় দামোদর মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের পরিত্যক্ত লেখনী ধরিয়া বাহাদুরি লইবার জন্য দুর্গেশনন্দিনীর পরিশিষ্ট রূপে 'নবাব নন্দিনী' এবং কপালকুণ্ডলার পরিশিষ্ট 'মৃণ্ময়ী' লেখেন। তাঁহার কৃত কার্য মহাকালের কুক্ষিতগ হইয়াছে। ইনি ডিটেক্‌টিভ কৌতূহলের গল্প লিখিতে পছন্দ করিতেন। 'বিমলা', 'মা ও মেয়ে', 'দুই ভগিনী', 'জয়চাঁদের চিঠি', 'কর্মক্ষেত্র', 'সোনার ফসল', 'যোগেশ্বরী', 'অন্নপূর্ণা', 'সপত্নী', 'নবীনা' প্রভৃতি অনেকগুলি গল্প লেখেন। কিন্তু সাহিত্যে তাহা স্থায়ী হয় নাই। স্কটের 'ব্রাইড অফ ল্যামার মুর' উপন্যাস অবলম্বনে 'কমলকুমারী' এবং কলিন্সের ওম্যান-ইন-হোয়াইট অবলম্বনে 'শুক্লবসনা সুন্দরী' নামে উপন্যাস লিখিয়া তৎকালে খ্যাতিলাভ করেন। ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস লেখায় হাত দেন। ইঁহারা সমাজ-সংস্কার প্রেরণায় হিন্দুধর্মের পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম ও খ্রীষ্টিয়ানীর বিপক্ষে আক্রমণাত্মক অভিপ্রায়ে গল্পরচনা করিতেন। ইন্দ্রনাথের 'কল্পতরু' এবং যোগেন্দ্রচন্দ্রের 'মডেল ভগিনী', 'চিনিবাস চরিতামৃত', 'কালাচাঁদ', 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' প্রভৃতি উপন্যাস সমাজে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। নির্মল কৌতুক সৃষ্ট করিয়া গল্প রচনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁহার 'কঙ্কাবতী', 'ডমরু চরিত', 'ফোকলা দিগম্বর' প্রভৃতি গ্রন্থ অতুলনীয়। পারিবারিক জীবনে বহু সমস্যা অবলম্বনে আদর্শমূলক উপন্যাস লেখেন শিবনাথ শাস্ত্রী। তাঁহার 'মেজবৌ', 'যুগান্তর' এবং 'নয়নতারা' বেশ উল্লেখযোগ্য। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 'শক্তিকানন', 'ফুলজানি', 'কৃতজ্ঞতা' প্রভৃতি উপন্যাসে পল্লীবাংলার জীবনচিত্র চমৎকার ফুটাইয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'ফুলজানি' উপন্যাসের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

বঙ্কিমযুগের অন্যান্য ঔপন্যাসিক

হাস্যরসাত্মক উপন্যাস

৪। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কি কারণে বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছেন তাহা আলোচনা কর।

উত্তর। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সুখপাঠ্য সহজবোধ্য উপন্যাস রচয়িতা রূপে বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মত বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না, কিন্তু নিজের পরিতৃপ্ত মনের আনন্দ কাহিনীর মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া পাঠকের তৃপ্তি বিধান করিতে জানিতেন। তিনি ১৪ খানি উপন্যাস ও শতাধিক ছোটগল্প রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে দান করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি 'রমা

রচনাবলী

সুন্দরী', 'নবীন সন্ন্যাসী', 'রত্নদীপ', 'জীবনের মূল্য', 'সিন্দুর কৌটা', 'মনের মানুষ', 'আরতি', 'সতাবালা', 'সুখের মিলন', 'সতীর পতি', 'গরীব স্বামী', 'নবদুর্গা' এবং 'বিদায়বাণী' উপন্যাস লেখেন। ইহা ব্যতীত, 'দেশী ও বিলাতী', 'নবকথা', 'ষোড়শী', 'গহনার বাক্স' প্রভৃতি নামে বহু গল্প লিখিয়াছেন। তাঁহার অনুরাগী পাঠকদের মধ্যে কেহ কেহ ১১৪টি গল্পের সন্ধান দিয়াছেন।

প্রভাতকুমারের উপন্যাস-কাহিনীগুলিতে স্বভাবত ঘটনাগত জটিলতা ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত কম। রূপকথার রহস্যে ঘেরা রোমান্টিক প্রেমের গল্প অথবা লঘু তরল ভাবকল্পনায় পারিবারিক জীবনের স্নিগ্ধ শান্ত রূপ ফুটাইয়া তোলাই প্রভাতকুমারের বিশেষত্ব। তাঁহার গল্পগুলিতে বিশুদ্ধ আনন্দের নিস্তরঙ্গ প্রবাহ ছাড়া বেশি কিছু নাই। কোন জটিল পরিস্থিতি বা গভীরতর জীবন-জিজ্ঞাসা দিয়া তিনি পাঠক-চিত্তে কোন আলোড়ন জাগাইয়া তোলেন নাই। 'রমাসুন্দরী' একটি দুঃসাহসিকা তরুণী। একজন ধনী যুবক তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। তারপর পারিবারিক সামান্য প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করিয়া শুভ কার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। 'নবীন' সন্ন্যাসীতে একজন উচ্চশিক্ষিত তত্ত্বজ্ঞানী যুবক সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। অকস্মাৎ একটি নারীর প্রেম সন্ন্যাসব্রত ভঙ্গ করিল এবং ইনি আদর্শ গৃহী হইলেন। 'সিন্দুর কৌটা' উপন্যাসে কাহিনী একটু জটিল হইয়াছিল। কিন্তু আইনজ্ঞ লেখক আইনের মারপ্যাঁচে জটিল গ্রন্থি মোচন করিলেন। একটি বিবাহিত হিন্দু যুবক স্বামি-পরিত্যক্তা একটি খ্রীষ্টান যুবতীর প্রেমে পড়িল। তখন আইন-বলে যুবতীর প্রথম বিবাহ অসিদ্ধ ঘোষিত হইল এবং হিন্দুযুবকের প্রথমা পত্নী সিন্দুর কৌটা দ্বারা দ্বিতীয়াকে সানন্দে সপত্নীরূপে বরণ করিয়া লইল। প্রভাত-কুমারের অধিকাংশ গল্পেই এইরূপ সহজ সমাধান, সুখাবহ পরিণাম। ইনি মহত্ত্বের ও আদর্শবাদিতার উচ্চশিখরে উঠেন নাই এবং নীচতা ও ভয়ঙ্করতার গহ্বরেও নামেন নাই। নিতান্ত স্বাভাবিক পরিবেশে বাস্তব ঘটনার মধ্যেই কল্পনার মনোরম ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া পাঠকের হৃদয়ে তৃপ্তি আনিয়াছেন, বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারে আঘাত করেন নাই।

রচনায় স্বভাবসুন্দর সমস্যাবর্জিত কাহিনী-রস

৫। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁহার দানের পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

উত্তর। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিংশ

শতাব্দীর সূচনায় বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া বাঙ্গালী পাঠককে বিস্ময়বিহ্বল এবং আনন্দরসাপ্লুত করিয়া তোলেন। বাংলা কথাসাহিত্যের মণিমঞ্জুষায় শরৎচন্দ্র একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। তাঁহার পূর্ণাঙ্গ জীবনীর অভাব। শুধু এইটুকু জানা যায় যে তিনি হুগলি জেলায় দেবানন্দপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগলপুরে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সেখানকার টি. এন্. জুবিলি কলেজে ফার্স্ট আর্টস্ পড়িতেন। কিছুদিন তিনি 'ভবঘুরে' জীবন যাপন করিয়াছিলেন। পরে প্রায় ১২ বছর রেঙ্গুনে ব্রহ্মসরকারের হিসাব বিভাগে কেরানীর কার্য করিয়াছিলেন। সাহিত্যিক খ্যাতিলাভ করার পর তিনি চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া বাংলাদেশেই বসবাস করিতে থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁহাকে 'জগত্তারিণী স্বুবর্ণপদক' প্রদান করেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারী তাঁহার জীবনাবসান ঘটে। রবীন্দ্রনাথ শোকপ্রকাশ উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন,—

ব্যক্তি-পরিচয়

যাঁহার অমর স্থান প্রেমের আসনে,
ক্ষতি তাঁর ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যাঁরে হরি',
দেশের হৃদয় তাঁরে রাখিয়াছে ধরি'॥

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য রচনার ইতিহাস খুবই বিস্ময়কর। ভাগলপুরে ছাত্রাবস্থায় হস্তলিখিত 'ছায়া' পত্রিকায় তিনি গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময় 'অভিমান' নামে একখানি উপন্যাসও লেখেন; কিন্তু পাণ্ডুলিপি হারাইয়া গিয়াছে। 'কুন্তলীন পুরস্কার' প্রতিযোগিতায় জয়ী হইলেন 'মন্দির' গল্প লিখিয়া। উহাই তাঁহার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রথম অবস্থায় তিনি বেনামীতে লিখিতেন। 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বড়দিদি' গল্পটিকে রবীন্দ্র-রচনা বলিয়া ভুল করা হইয়াছিল। ইহার পর তিনি বহু গল্প-উপন্যাস স্বনামে প্রকাশ করিয়া, অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। ক্রমে 'বিরাজ বৌ', 'বিন্দুর ছেলে', 'পণ্ডিত মশাই', 'মেজদিদি', 'পল্লীসমাজ', 'চন্দ্রনাথ', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'অরক্ষণীয়া', 'শ্রীকান্ত' (এক হইতে চার পর্ব ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়), 'দেবদাস', 'নিষ্কৃতি', 'কাশীনাথ', 'চরিত্রহীন', 'স্বামী', 'দত্তা', 'ছবি',

সাহিত্য-রচনা

'গৃহদাহ', 'বামুনের মেয়ে', 'দেনা-পাওনা', 'নববিধান','হরিলক্ষ্মী', 'পথের দাবী', 'শেষপ্রশ্ন', 'অনুরাধা', 'বিপ্রদাস' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'ছেলেবেলার গল্প', 'শুভদা' এবং 'শেষের পরিচয়'। 'শেষের পরিচয়' ছিল অসমাপ্ত, রাধারাণী দেবী সমাপ্ত করেন। 'বিন্দুর ছেলে'র সহিত প্রকাশিত হয় 'রামের সুমতি' ও 'পথ নির্দেশ'; 'মেজদিদি'র সঙ্গে 'দর্পচূর্ণ' ও 'আঁধারে আলো'; 'কাশীনাথে'র সহিত 'আলো ও ছায়া', 'মন্দির', 'বোঝা', 'অনুপমার প্রেম', 'বাল্যস্মৃতি', ও 'হরিচরণ'; 'স্বামী'র সহিত 'একাদশী বৈরাগী', 'ছবি', 'বিলাসী' ও 'মামলার ফল'; 'হরিলক্ষ্মী'র সহিত 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ'; 'অনুরাধা'র সহিত 'সতী ও পরেশ'; 'ছেলেবেলার গল্পে'র মধ্যে 'লালু', 'ছেলেধরা', 'কোলকাতার নতুনদা','একটি দিনের কাহিনী' ও 'দেওঘরের স্মৃতি'। ইহা ছাড়া শরৎচন্দ্র 'নারীর মূল্য', 'তরুণের বিদ্রোহ', 'স্বদেশ ও সাহিত্য' নামে প্রবন্ধপুস্তক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু গল্পকার ও ঔপন্যাসিক রূপেই তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্য অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যে তৎকালীন বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয় জয় করিয়াছিল। আজিও তাঁহার গল্পগুলির বিস্ময়কর আকর্ষণ বিন্দুমাত্র মন্দীভূত হয় নাই। তাঁহার রচনার প্রধান বিশেষত্ব এই যে তিনি দরদী প্রাণ লইয়া মানবহৃদয়ের বিপুল রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে নারীপুরুষের সম্পর্ক নির্ণয়ে তিনি আশ্চর্য রসদৃষ্টির পরিচয় দিয়া জীবনের একটি শাশ্বত রূপের সন্ধান দিয়াছিলেন। তাঁহার উপন্যাসে তিনি কাহিনী ও চরিত্র সমাজের উচ্চ স্তর হইতে আহরণ করেন নাই, জীবনদর্শন সম্বন্ধে গভীরতর প্রজ্ঞার পরিচয় দিতেও চেষ্টা করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সমাজের অভিজাত শ্রেণী অথবা ইতিহাস-খ্যাত ব্যক্তিদের লইয়া মহৎ উদার আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শরৎচন্দ্র তাহা না করিয়া সাধারণ বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের প্রতিরূপ অবলম্বনে মানবজীবনের চিরন্তন সত্যকে শিল্পসুন্দর মূর্তিতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন। এইখানেই শরৎচন্দ্রের শিল্পরচনার মহিমা।

শরৎ-সাহিত্যের শিল্পগুণ

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে কাহিনী ও চরিত্র সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, নানা

সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এবং মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণে তিনি পূর্বগামীদের তুলনায় অধিকতর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। জীবানন্দ-অলকা, সুরেশ-অচলা-মহিম, শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মী, উপেন্দ্র-কিরণময়ী, সতীশ-সাবিত্রী, রোহিণী-অভয়া প্রভৃতি প্রত্যেকটি নরনারীর মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার ক্ষুদ্রতম অংশটিও লেখকের দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করে নাই। কাহিনীর গতি ও পরিণতিকে মনস্তাত্ত্বিক বিকাশধারার নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিয়া শরৎচন্দ্র উপন্যাসকে শিল্পস্তরে উন্নীত করিয়াছেন এবং বিংশ শতাব্দীর কথাসাহিত্যের সমৃদ্ধির পথনির্দেশ করিয়াছেন।

চরিত্র-সৃষ্টিতে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

জীবনবোধের বৈশিষ্ট্যের দিক হইতেও শরৎচন্দ্র নূতন পথের পথিক। তিনি তাঁহার পূর্বগামীদের মত সামাজিক সংস্কার এবং ধর্মনীতির আদর্শকে মূল্যবান মনে করেন নাই। বরং সমাজ ও ধর্মান্ধতার হীন দাসত্বের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। ভ্রমর বঙ্কিমের কাছে যে মূল্য পাইয়াছে, সুরবালা, সুনন্দা পাতিব্রত্য মহিমায় শরৎচন্দ্রের কাছে সে মূল্য পায় নাই। বরং অভয়ার নির্ভীক বিদ্রোহ, অলকার অসতী অপবাদ, অচলার মর্মান্তিক পদস্খলন শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছে। বঙ্কিমের হাতে রোহিণী, কুন্দ এবং শৈবলিনীর যে গতি হইয়াছে শরৎচন্দ্রের হাতে তাহা কখনও হইত না। শরৎচন্দ্র মনে করিতেন যে, প্রাণের সহজ সংস্কার দ্বারা প্রাচীন সমাজ-বিধি এবং ধর্মসংস্কারের পুনর্বিচার আবশ্যক।

জীবনবোধের নবমূল্যায়ন

শরৎচন্দ্র তাঁহার সাহিত্য-সাধনার কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে সংসারে বঞ্চিত ও উৎপীড়িত মানবাত্মার বেদনাবাণী প্রকাশ করিয়া প্রচলিত ব্যবস্থা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্যই তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যে এই উদ্দেশ্যমূলকতা সৃষ্টিকর্মে কিছু ব্যাঘাত ঘটায় নাই। বরং অনুভূতির এই তীব্রতায় তিনি ব্যথিত মানবের বেদনার গান গাহিয়া কালজয়ী সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। মানুষের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন নিত্যকালের মহত্ত্ব। সমাজের দৃষ্টিতে যাহারা পাপী, যাহারা তথাকথিত নীতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহারা যে উদার মনুষ্যত্ব হইতে বঞ্চিত নয়, তাহারাও যে সহানুভূতির যোগ্য, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে এই আদর্শই অনুসৃত হইয়াছে। সতীশ, জীবানন্দ, দেবদাস কেহই ঘৃণ্য নহে। রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, অচলা, অভয়াকে অবজ্ঞা

শরৎ-সাহিত্যে মনুষ্যত্ব-মহিমার জয়গান

করা যায় না। একাদশী বৈরাগীর মত লোকের হৃদয়েও স্নেহের ফল্গুধারা থাকিতে পারে। সংসারের কোন মানুষই উপেক্ষণীয় নহে। শরৎচন্দ্র অপমানিত, অবহেলিত, ধিক্কৃত জীবনের বেদনাবাণী প্রকাশ করিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে দেখাইয়াছেন যে, এই বেদনার দহেও প্রেম-প্রীতি-ঘেরা মনুষ্যত্বের শতদল-বিকাশ সম্ভব। দৃষ্টিভঙ্গির এই বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে বিচার করিলে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে শরৎচন্দ্র অদ্বিতীয়।

৬। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলা উপন্যাসের যে বৈশিষ্ট্য সূচিত হয় তাহাতে শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে উপন্যাস-সাহিত্য-শিল্প উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সেই উপন্যাসে ঐতিহাসিক রোমান্স, রোমান্টিক প্রেম এবং গার্হস্থ্য জীবনের নানা সমস্যা আলোচিত ও বিশ্লেষিত হইয়াছিল। বিধবার প্রেম ও বিবাহ, বহুবিবাহ, সপত্নী-বিদ্বেষ, ভ্রাতৃকলহ প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে বঙ্কিম-যুগের ঔপন্যাসিকেরা কাহিনী রচনা করিতেন। সমাজনীতি ও ধর্মনীতির শাসন সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ তখনও সোচ্চার হয় নাই। কেহ কেহ প্রগতিমূলক মনোভাব দেখাইয়া বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি সমর্থন করিলেও সমাজনীতি উল্লঙ্ঘনের দুঃসাহস দেখান নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিমানবকে সামাজিক আদর্শের অনুবর্তী হইবার নির্দেশ দিতেন। শৈবলিনী, রোহিণী, নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল প্রভৃতি উন্মার্গগামী নারী-পুরুষের জন্য নীতিনিষ্ঠ বঙ্কিম কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঘরে ঘরে অমৃত ফল ফলাইবার উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি 'বিষবৃক্ষ' রচনা করিলেন। হীন রূপাসক্তি, নির্লজ্জ লালসা এবং অসংযত জীবনের সমর্থন তিনি করেন নাই। সমাজ-শাসনের মধ্যেই মানুষের পূর্ণতর বিকাশ-সম্ভাবনায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।

উপন্যাসে বঙ্কিম-যুগ

বিংশ শতাব্দীর সূচনায় উপন্যাসসাহিত্যের গতি স্বতন্ত্রখাতে প্রবাহিত হইল। মানবদরদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সমাজের স্থূল প্রথানুগত্যের মধ্যে ব্যক্তি-মানবের নিগ্রহের প্রতিবাদ ধ্বনিত করিয়া উপন্যাসসাহিত্যের দিক্-পরিবর্তন করিলেন। সমাজনীতি ও ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষে তিনি ব্যক্তির পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রাণহীন প্রথা ও জড় সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। তাঁহার মতে সমাজের প্রথম কাজ ব্যক্তিমনের গুণাবলীর সংরক্ষণ ও সংবর্ধন;

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে সমাজনীতির প্রতিবাদ

প্রাচীন প্রথার অন্ধ অনুসরণ করিলে সমাজ নির্জীব এবং যন্ত্রের মত যন্ত্রণাদায়ক হয়। তাই সমাজের তথাকথিত পাপী ও নীতিভ্রষ্টকে দরদ দিয়া বিচার করিতে হইবে। দেবদাস, জীবানন্দ, সতীশ, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, অচলা প্রভৃতি চরিত্রের পুনর্বিচার আবশ্যক। শরৎচন্দ্র রোহিণী-হত্যা, শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত এবং কুন্দের বিষপান সমর্থন করেন নাই। সতীত্বের আদর্শকে প্রথা অপেক্ষা হৃদয়ের দিক হইতে বিচার করার পক্ষপাতী ছিলেন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া বিংশ শতাব্দীর উপন্যাসে ব্যক্তিত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

উপন্যাসে ব্যক্তিত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা

পারিবারিক জীবনে স্নেহ-প্রেম-মমতার ব্যক্তিত্বাশ্রয়ী একটি তির্যক গতি স্বীকৃত হইয়াছিল। প্রচলিত বিশ্বাসের মূলে আঘাত করার প্রচেষ্টাও হইয়াছিল। গর্ভজাত সন্তানই সন্তান, মন্ত্রদ্বারা সিদ্ধ ব্যক্তিই স্বামী, ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াই ব্রাহ্মণ—ইহাকে সংস্কাররূপে বর্জনের চেষ্টাও দেখা যায়। শরৎচন্দ্র দেখাইলেন দেবদাস ও পার্বতীর সম্পর্ক, শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর অনুরাগ, সতীশ ও সাবিত্রীর প্রেম, রমা ও রমেশের হৃদ্যতা। বিন্দুর ছেলে গর্ভজাত নয়, রামও নারায়ণীর দেবরমাত্র, বেণী ঘোষালের গর্ভধারিণী বিশ্বেশ্বরী রমা-রমেশেরও জননী। সমাজজীবনে স্নেহপ্রেমের এই রিসপিল অথচ স্বাভাবিক গতি বিংশ শতাব্দীর উপন্যাসে একটি বিশিষ্ট ধারার সৃষ্টি করে। তীব্র ব্যক্তিত্ববোধ এবং সমাজ-নিরপেক্ষ ব্যক্তি-মনের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক গতি উপন্যাস সাহিত্যের দিক্‌পরিবর্তন ঘটায়।

রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে উপন্যাস রচনায় হস্তক্ষেপ করিলেন। বৌঠাকুরাণীর হাট (১৮৮২) এবং রাজর্ষি (১৮৮৭) রচনা করেন অনেকটা বঙ্কিমের আদর্শে। তাহার পর ১৭ বৎসর কাল উপন্যাস রচনা করেন নাই, কিছু ছোটগল্প লিখিয়াছেন মাত্র। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 'চোখের বালি' প্রকাশিত হইল এবং দুই বৎসর পর 'নৌকাডুবি'। বঙ্কিমচন্দ্রের শৈবলিনী ও রোহিণীর মধ্যে ব্যক্তিত্বের প্রথম ইঙ্গিত স্ফুরিত হইয়াছিল, শরৎচন্দ্রের

রবীন্দ্র-উপন্যাসে সমাজ-নিরপেক্ষ ব্যক্তি-মানসের প্রতিষ্ঠা

রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রী, অভয়া প্রভৃতি চরিত্রে ব্যক্তিত্বের যে দীপ্তি প্রকাশ পাইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'তে সেই ব্যক্তিত্বের বিদ্যুন্ময় বিকাশ। বস্তুতঃ 'চোখের বালি' হইতেই বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে যুগান্তরের ইঙ্গিত। রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী চরিত্রে নারী-ব্যক্তিত্বের এক বিস্ময়কর বিকাশ। বিনোদিনীর মধ্যে ছিল ব্যর্থ নারীজীবনের সূক্ষ্মতর বেদনা। সে মহেন্দ্রকে জয়

করিতে চাহিয়াছে, বিহারীর কাছে আত্মনিবেদনের মধ্যেও পুরুষ-জয়ের গূঢ় বাসনা ছিল। বিনোদিনীকে রবীন্দ্রনাথ নীতি-শাসিত চরিত্র করেন নাই, তাহার ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতা দেখাইয়া তাহাকে নিন্দা-প্রশংসার উর্ধ্বে রাখিয়াছেন। এই ভাবে মানুষের সমাজনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব-বিকাশকে অবলম্বন করিয়াই বিংশ শতাব্দীর উপন্যাস অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। 'নষ্টনীড়' নামক উপন্যাসধর্মী গল্পে রবীন্দ্রনাথ নারীজীবনের প্রেম-সমস্যাকে অদ্ভুত জটিলতার মধ্যে স্থাপন করিয়া নারীর ব্যক্তিত্বের বেদনাকেই রূপ দিয়াছেন। 'নৌকাডুবি'-তে সামাজিক আদর্শের ব্যতিক্রম কিছু না থাকিলেও কাহিনীর মধ্যে সমাজ-সাপেক্ষতা অপেক্ষা ব্যক্তিমনের বিকাশধারাই প্রধান স্থান পাইয়াছে। 'গোরা', 'যোগাযোগ', 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি উপন্যাসে নারী ও পুরুষের ব্যক্তি-মানসের বিচিত্র দ্বন্দ্বের ইতিহাসই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় পাদের উপন্যাসে সমাজ-প্রতিচ্ছবি প্রধান স্থান পায় নাই। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যেমন সমাজ-শাসনের বিরুদ্ধতা আছে, প্রথাসর্বস্ব সমাজের কঠোর সমালোচনা আছে, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে সেই মুখরতা নাই। তিনি বৃহত্তর সমাজ-সমস্যাকে পাশ কাটাইয়া ব্যক্তি-সমস্যাকে বড় করিয়া তুলিয়াছেন। উপন্যাস-সাহিত্যের এই ধারাই সাধারণতঃ পরবর্তী কালে অনুসৃত হইয়াছে।

৭। রবীন্দ্রোত্তর যুগের কয়েকজন ঔপন্যাসিক এবং ছোটগল্প লেখকের সাহিত্যকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া গল্প ও উপন্যাসের এক স্বর্ণযুগ বাঙ্গালীর সাহিত্যের ইতিহাসে সূচিত হয়। তাঁহাদের সমকালীন এবং অব্যবহিত পরবর্তী কালে ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনায় বহু কৃতী সাহিত্যিক নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরী, নরেশ সেনগুপ্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মনীন্দ্রলাল বসু, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু লেখক বিশেষ বিশেষ পাঠক সম্প্রদায়ের কাছে অদ্ভুত জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। ইহাদের কাহারও প্রতিভা কাহারও তুলনায় কোন অংশে ন্যূন ছিল না। মহাকালের বিচারে কাঁহার কি পরিণাম হইবে বলা যায় না। বহুপঠিত এবং বহু আলোচিত কয়েকজন সাহিত্যিকের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিলে আধুনিক কথা-সাহিত্যের গতিপ্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া একদল রবীন্দ্রানুসারী সাহিত্যিক মানবজীবনের স্নেহ-প্রেম-করুণার সূক্ষ্মসুকুমার সৌন্দর্য প্রকাশ করিয়া

কবি-কল্পনার রসে ভরিয়া গল্পসাহিত্য রচনা করেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মনীন্দ্রলাল বসু প্রভৃতি কথা-সাহিত্যিকেরা সমস্যা-সংকটহীন জীবনের সুকুমার অনুভূতি, প্রেম ও রোমান্স লইয়া গল্প রচনা করেন। মনীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা', 'সহযাত্রিনী' জনপ্রিয় হইয়াছিল। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা দেবী, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী প্রভৃতি ঔপন্যাসিকেরা এক সময় বাঙ্গালী পাঠকের রসপিপাসা নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্রশক্তি', 'পোষ্যপুত্র' প্রভৃতি উপন্যাসে বাস্তব-রস ও রোমান্সের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। এই জাতীয় রচনারীতিতে অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। ইনি 'বনফুল' ছদ্মনামে গল্প-সাহিত্য রচনা করিয়া বৈচিত্র্যরসে বাঙ্গালী পাঠককে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। 'তৃণখণ্ড', 'মৃগয়া', 'স্থাবর', 'জঙ্গম' প্রভৃতি উপন্যাস কাহিনী-কৌতূহলে ও আঙ্গিক বৈচিত্র্যে লেখকের প্রতিভার পরিচয় বহন করে। 'বনফুল' রচিত গল্প-উপন্যাসগুলি অতিশয় জনপ্রিয়।

হৃদয়বৃত্তিমূলক কথা-সাহিত্য

'সবুজপত্র'কে অবলম্বন করিয়া প্রমথ চৌধুরী বুদ্ধিদীপ্ত মননশীল গল্প-উপন্যাস রচনার সূত্রপাত করেন। কয়েকজন রচনাশিল্পী ভাবাবেগকে যথেষ্ট সঙ্কোচন করিয়া বুদ্ধিদীপ্ত মার্জিত কাহিনী দ্বারা বিদগ্ধ বাঙ্গালী পাঠকের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। 'বীরবল' ছদ্মনামে প্রমথ চৌধুরী 'চার ইয়ারী কথা' লিখিলেন। গল্প হইলেও ইহার ধরণ প্রবন্ধের মত। বুদ্ধিদীপ্ত মননশীল কাহিনীর মধ্য দিয়া চটকদারী গদ্যরীতির প্রকাশ-পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। তিনি 'সত্যাসত্য' নামে এক এপিক উপন্যাস লেখেন। বুদ্ধিপ্রধান যুক্তিসর্বস্ব এক নায়কের জীবনবৈচিত্র্য লইয়া ছয় খণ্ডে প্রকাশিত এই বিশাল উপন্যাস। ইহাতে কাহিনীবন্ধন শিথিল এবং গল্পরস দ্বিধাগ্রস্ত। তাঁহার 'আগুন নিয়ে খেলা' এবং 'পুতুল নিয়ে খেলা' গল্প কৌতূহলপ্রদ, কিন্তু স্বাভাবিক কাহিনীরসে নিষিক্ত নয়। সার্থক ঔপন্যাসিকের প্রতিষ্ঠা ইনি অর্জন করেন নাই, মননশীল বাক্‌শিল্পে ইনি অদ্বিতীয়।

চিন্তামূলক মননশীল কথা-সাহিত্য

'কালিকলম' ও 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া একদল বিদ্বান-বুদ্ধিমান লেখক প্রথম ইয়োরোপীয় মহাসমরাবসানের পটভূমিকায় স্বাধীন চিন্তার পথে প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই প্রতিভাবান লেখকদের

লেখনীমুখে বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করে। বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট শক্তির লেখকেরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধদেব বসু 'সাড়া' উপন্যাস লিখিয়া যৌনচিন্তার স্বাধীনতা প্রকাশ করেন। তরুণ মহলে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। ক্রমে তাঁহার 'যেদিন ফুটল কমল', 'একদা তুমি প্রিয়ে', 'তিথিডোর', 'মৌলিনাথ' প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতায় বাস্তবতার নামে তিনি যে রোমান্স সৃষ্টি করিলেন তাহাতে বিকৃত চিন্তা ও বিদ্রোহিতা মাত্র প্রকাশ পাইয়াছে। অচিন্ত্যবাবু পরমহংসদেবের ভাব লইয়া এখন কথার ফুলঝুরি সৃষ্টি করিতেছেন। বাক্‌শিল্পের এই পারদর্শিতার সাহায্যে তিনি মানুষের বিকৃত জীবনের রূপ বে-আব্‌রু করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের মধ্যেই বাস্তবতার নামে শালীনতার অভাব। মানবজীবন সম্বন্ধে যে গভীর প্রত্যয় কথাশিল্পীর প্রধান উপজীব্য সেই প্রত্যয়ের অভাব তাঁহার একালের এবং সেকালের লেখায় দেখা যায়।

বিকৃতচিন্তামূলক বিদ্রোহাত্মক কথা-সাহিত্য

জীবন সম্বন্ধে গভীর প্রত্যয় এবং বাস্তব দৃষ্টিসম্মত কথা-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কথাশিল্পীরা। সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যে জীবনচেতনা, সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে যে মনুষ্যত্বের অবমাননা এবং তজ্জনিত যে শোষণ ও বঞ্চনা তাহা এই লেখকেরা শিল্পসুন্দর মূর্তিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। শৈলজানন্দের 'নারীমেধ', 'নীহারিকা ওয়াচ কোম্পানী', 'বধূবরণ' প্রভৃতি কাহিনীতে জীবনের বাস্তব বর্ণনাকে আশ্রয় করিয়া জীবনের ট্রাজেডিগভীর রূপ ফুটিয়াছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র সাধারণ নিম্নবিত্ত সমাজের গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জীবনরসের সন্ধান করিয়াছিলেন। 'পাক' এবং 'মিছিল' গ্রন্থে তিনি নিষ্করুণ বাস্তব ঘটনার মধ্যে মানবিক অনুভূতির বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করেন। জগদীশ গুপ্তের 'বিনোদিনী' রচনাটির মধ্যে মানবিক ভাব-পরম্পরার বিচিত্র বিন্যাস পাঠককে অভিভূত করে। ইঁহারা ছোট গল্প রচনায় মানবিক আবেদন ও বাস্তববুদ্ধির সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। বৃহৎ মহৎ গঠনমূলক উপন্যাস সৃষ্টির পরিবেশ এই ভাঙ্গন-ধরা যুগে ছিল না।

বাস্তব বুদ্ধিমূলক মানবিক কথা-সাহিত্য

উপন্যাস-সৃষ্টির ক্ষেত্রে কৌতুকরসের সহায়তায় জীবন-বোধের পরিচয় দিয়াছেন এই যুগের কয়েকজন কথাশিল্পী। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকাকে অবলম্বন

করিয়া যে বিদ্রূপাত্মক গল্পকথার অমার্জিত আক্রমণ হইত, রবীন্দ্রনাথ তাহা পরিহার করিয়া লঘু কৌতুকের সুমার্জিত রীতির সন্ধান দিয়াছিলেন। সেই রীতির অনুসরণে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং পরশুরাম ছদ্মনামধারী রাজশেখর বসু মহাশয় নির্মল শুভ্র সংযত হাস্যে গল্পসাহিত্যকে উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছিলেন। কেদারনাথ বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের বিস্ময়কর পরিচয় দিয়া 'কোষ্ঠীর ফলাফল', 'ভাদুড়ী মশাই' এবং 'আই হ্যাজ' রচনা করিয়া বিদগ্ধ পাঠককে বিস্ময়বিমূঢ় ও আনন্দোদ্বেলিত করিয়াছিলেন। তাঁহার কথাসাহিত্য বুদ্ধিদীপ্ত রচনার শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য। বুদ্ধির সূক্ষ্মতার সহিত বাক্‌চাতুর্য এবং অসঙ্গতির অপূর্বতার মধ্যে পরিশীলিত হাস্য-রসের প্রতিষ্ঠা। পরশুরাম এই পথেই কৌতুক গল্পে অভূতপূর্ব খ্যাতিলাভ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী' এবং 'হনুমানের স্বপ্ন' শিক্ষিত রুচিবান্ বাঙ্গালী পাঠকের পরমপ্রিয় আকর্ষণ হইয়া উঠে। তাঁহার রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ মূল গ্রন্থের নির্বাচিত অংশের চলিত ভাষায় রূপান্তর। এই রচনা পাঠকমহলে যতটা রুচিকর হইয়াছে তাঁহার কৌতুক-গল্পগুলি তদপেক্ষা কম রুচিকর হয় নাই। নির্মল কৌতুকের অফুরন্ত নির্ঝর প্রবাহিত করিয়াছিলেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। তাঁহার 'নীলাঙ্গুরীয়' উপন্যাসখানির মধ্যে জীবন সম্বন্ধে একটি প্রসন্ন সহাস দৃষ্টির পরিচয় আছে, আর আছে রোমান্সের স্নিগ্ধমধুর স্বপ্নচ্ছায়া। তাঁহার গল্পসাহিত্যে শিবপুরের গণ্‌শা-ঘোঁৎনা যে নির্মল কৌতুকের মনোরম দীপ্তি প্রকাশ করিয়াছে, বাংলা সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। শ্রীমতী রাণুর নায়িকাত্বে যে কয়খানি গল্প রচিত হইয়াছে তাহা শিশু-মনস্তত্ত্ব এবং কৌতুক-কৌতূহলের এক বিস্ময়কর রহস্য। জীবনকে যে এমন প্রসন্ন মাধুর্যে দেখা যায় তাহা বিভূতি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই দেখাইয়াছেন।

কৌতুক ও ব্যঙ্গমূলক কথা-সাহিত্য

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বিস্ময়কর সুর-পরিবর্তন আনিয়াছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই বিস্ময়কর প্রতিভাধর লোকান্তরিত হইয়াছেন। অতি অল্পদিনের সাহিত্য-সাধনায় বাংলা কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে ইনি অমর আসনের অধিকারী হইয়াছেন। 'পথের পাঁচালী' (১৯২৩) এবং উহারই অনুষঙ্গ 'অপরাজিত' রচনা করিয়া তিনি বাঙ্গালী পাঠককে যুগপৎ কাব্যরস এবং আখ্যানরসের আস্বাদ দিয়া চমৎকৃত করিয়াছিলেন। ক্রমে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনি 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আরণ্যক', 'ইছামতী', 'দেবযান', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' প্রভৃতি উপন্যাস ও কিছু গল্প রচনা করেন। বিভূতিভূষণের রচনার সর্বাপেক্ষা বড় বৈশিষ্ট্য এই যে উহাতে যুগযন্ত্রণার জ্বালা নাই, মানবাত্মার সংক্ষুব্ধ প্রদাহ নাই, কোন কঠিন সমস্যার সংকটজনক পরিস্থিতি বা আকস্মিকতা নাই। তিনি স্বপ্নজড়িত দৃষ্টিতে বালকের কৌতূহল লইয়া চলমান সংসারকে দেখিয়াছেন। এই প্রত্যক্ষদৃষ্ট বাস্তব সংসারের মধ্যেও যে একটি রহস্যে-ঘেরা রসলোক আছে তাহার আবিষ্কারই তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব। তিনি একাধারে ছিলেন কবি ও গদ্যশিল্পী। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে সংঘাতহীন নিত্যসম্পর্কের অমৃত মাধুর্যকে তুলিয়া ধরিয়াই তিনি সমস্যাজর্জরিত মানুষের বিষতিক্ত কণ্ঠে মধু ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

সমসাময়িক দেশ-কালসাপেক্ষ গভীরতর জীবনবোধে উদ্বোধিত হইয়া উপন্যাস-রচনায় রবীন্দ্রোত্তর যুগে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী লেখক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগ্রামশীল জীবনের মর্মরহস্য বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে উপস্থাপন করার শিল্পরীতি ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের সাফল্যের হেতু। তাঁহার মত সফল কথা-

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যিক ইদানীং আর নাই। 'রাইকমল', 'নীলকণ্ঠ', 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' এবং 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' পর পর কয়েক বছরের মধ্যে লেখা এই উপন্যাসগুলিতে এক জীবনবাদী বলিষ্ঠ ঔপন্যাসিক আত্মপ্রকাশ করিলেন, বাঙ্গালী পাঠক সচকিত হইল। বিলীয়মান সামন্ততন্ত্র এবং উদীয়মান ধনতন্ত্রের তৎকালীন দ্বন্দ্বসংঘাতের পটভূমিকায় তিনি জীবনের এক বিচিত্র রূপ বিভিন্ন উপন্যাসে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। রাজনৈতিক আদর্শবাদের সংঘাতে একটি ব্যক্তিজীবন কিভাবে বিবর্তিত হয় তাহার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে 'ধাত্রীদেবতা'য়। যন্ত্রদানব কি ভাবে শান্ত জনপদকে আধা-শহরে পরিণত করে এবং ধূম্রমালিন্য কিভাবে চরিত্রকে কলুষিত করে তাহার ইতিহাস আছে 'কালিন্দী'তে। 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রামে' সংগ্রামী জনতার জাগরণ কথা আছে। তারাশঙ্কর তাঁহার অসংখ্য ছোটগল্পে মানবজীবনের রূপবৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ঐ গল্পগুলির মধ্যে তিনি সাঁওতাল, বাজিকর, বেদে, বৈষ্ণব, আউল-বাউল, তান্ত্রিক প্রভৃতি কত রকমের মানুষের জীবনচিত্র যে আঁকিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তারাশঙ্করকে আধুনিক জীবনের ভাষ্যকার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে

শরৎচন্দ্রের পর তাঁহার মত এত বড় প্রতিষ্ঠা আর কেহ অর্জন করিতে পারেন নাই।

তারাশঙ্করের সমসাময়িক কালে গল্প-উপন্যাস রচনায় সুমথ ঘোষ, গজেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, নরেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল মিত্র প্রভৃতি বহু উল্লেখযোগ্য প্রতিভার অভ্যুদয় হইয়াছে। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা-সাহিত্যে কোথাও দৈন্য নাই। আশাপূর্ণা দেবী, প্রতিভা বসু, বাণী রায়, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য প্রভৃতি মহিলারাও উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে স্বর্গত সাহিত্যিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভার বিস্ময়করতা উল্লেখযোগ্য। প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় 'মাণিক' ছদ্মনামে ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পুতুল নাচের ইতিকথা','পদ্মানদীর মাঝি' লিখিয়া গল্পপ্রিয় চিন্তাশীল বাঙ্গালী পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহার 'শহরতলী', 'অহিংসা', 'অতসী-মামী', 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ' প্রভৃতি গল্পকথায় বাস্তব মানুষের বাসনা-কামনার সত্যরূপটি প্রতিফলিত হইয়াছে। যুগযন্ত্রণার প্রত্যক্ষ প্রতিফলনে তাঁহার সাহিত্য রচনা স্বপ্নলোকের সন্ধান দেয় না, একটা অব্যবস্থিত যুগচিত্তের সর্বরকম বিকারকে শিল্পমূর্তির মধ্যে ধরিবার চেষ্টা আছে। ইনি রচনাশিল্পে অসাধারণ শক্তির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু সেই শক্তিকে সংহত করিয়া জীবনের বিশাল ও মহৎ আদর্শ রূপায়ণে তৎপর হইয়া উঠেন নাই। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এবং প্রগতিমূলক চিন্তাধারার অনগ্রসরতার জন্য এই প্রগতিবাদী প্রতিভাটি যথোপযুক্ত সার্থকতা লাভ করে নাই।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্নাবলী—গদ্যপর্ব (প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প)

১। বঙ্কিমচন্দ্রের গার্হস্থ্য-জীবন-বিষয়ক উপন্যাসগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এই শ্রেণীর রচনায় ঔপন্যাসিকের শ্রেষ্ঠত্বের কি নিদর্শন দেখা যায় তাহা নির্দেশ কর। (1965 B. A.)

২। ছোটগল্পে প্রভাতকুমারের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও। ('65 B. A.)

৩। সাহিত্যিক গদ্যের সৃষ্টিতে ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ, আলালী ও হুতোমী রীতির দান কি তাহা নির্ণয় কর। ('65 B. A.)

৪। বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশে খ্রীস্টান মিশনারীগণের দানের পরিমাণ নির্ণয় কর। ('64 B. A.)

৫। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর দান সম্বন্ধে আলোচনা কর। ('64 B. A.)

৬। বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দান নিরূপণ কর। ('63 B. A.)

৭। সাহিত্যের ক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রের আবির্ভাব বংকিমচন্দ্রের পরবর্তী হইলেও তিনি তাঁহার অনুবর্তী ছিলেন না। ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস এই উভয়ক্ষেত্রেই তাঁহার স্বাতন্ত্র্য দেদীপ্যমান। এই সূত্র অবলম্বনে রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাসগুলির বিশদ পরিচয় দাও। ('64 Hons.)

৮। বিদেশীরাই প্রথমে বাংলা গদ্যের পথ নির্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই স্তরে উহার উন্নতি দেশী লেখকের সহযোগিতায় বহুলাংশে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই অভিমত সমর্থন করিয়া সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর। ('65 Hons.)

৯। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় একই সময়ে বাংলা নাটক ও উপন্যাসের জন্ম হয়। গোড়ার দিকে নাটকের জনপ্রিয়তা বেশী হইলেও উৎকর্ষে উপন্যাস নাটকের অনেক উপরে উঠিয়া যায়। কেন তাহা আলোচনা কর। ('65 Hons.)

১০। "বাংলা দেশে ইংরাজ-শাসন বাংলা গদ্য-সাহিত্যের আবির্ভাব ত্বরান্বিত করিয়াছিল।" আলোচনা কর। ('66 Hons.)

১১। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বৎসরের ইতিহাসে বাংলা গদ্যে বিদেশী মিশনারীদের দান সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ('64 B. A.)

১২। সূচনা থেকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' পর্যন্ত বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস আলোচনা কর। ('63 B. A.)

১৩। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনাবলীর উল্লেখ করিয়া বাংলা গদ্য-সাহিত্যের নবরূপায়ণের মূলে তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দাও। ('62 B. A.)

১৪। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা গদ্যের প্রধান লেখকদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। ('61 B. A.)

১৫। উনবিংশ শতকে বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্রমবিকাশের ধারাটি পরিস্ফুট কর। ('66 M. A.)

১৬। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে বিষয়ের গুরুত্ব এবং অনুভূতির সূক্ষ্মতা এই উভয় গুণের কতটা সামঞ্জস্যসাধন হয়েছে তা' রবীন্দ্রপুর্ব প্রাবন্ধিকদের রচনা অবলম্বনে বিচার কর। ('66 M. A.)

১৭। "বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' এবং রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' প্রকাশের

দ্বারা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে দুটি সম্পূর্ণ নূতন পর্ব সূচিত হয়।” দুই পর্বের প্রধান ঔপন্যাসিকদের সাহিত্যকৃতির তুলনা করিয়া এই উক্তির সার্থকতা নিরূপণ কর। ('65 M. A.)

১৮। রমেশচন্দ্র এবং সঞ্জীবচন্দ্রের ঔপন্যাসিক রচনা প্রথম শ্রেণীর গৌরব হইতে কেন বঞ্চিত হইয়াছে তাহা বিশদভাবে আলোচনা কর। ('64 M.A.)

১৯। বঙ্কিমপরবর্তী যুগের যে-কোন দুইজন প্রবন্ধ লেখকের নাম কর ও তাঁহাদের কৃতিত্বের বিশ্লেষণ কর। ('63 M. A.)

২০। বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাসে যে-কোন দুইজনের কৃতিত্ব ও তাঁহাদের রচনার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ কর :—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, স্বামী বিবেকানন্দ। ('63 M.A.)

২১। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের তুলনামূলক বিচার কর। ('63 M. A.)

২২। **টীকা লেখ** :—আলালের ঘরের দুলাল (63 B.A., 63 Hons., 61 B.A.); অঙ্গুরীয় বিনিময় (65 Hons.,65M.A.); কমলাকান্ত (64 M.A.); হুতোম প্যাঁচার নক্সা (60, 63 B.A., 63 Hons.); শ্রীকান্ত (63 B A.); সবুজপত্র (63 B. A., 65 M. A.), স্বর্ণলতা (64 Hons.), ব্রাহ্মণ-রোমান-কাথলিক সংবাদ (65 Hons.); বঙ্গদর্শন (65 Hons.); মাধবীকঙ্কণ (65 Hons.); রজনী উপন্যাস (62 B. A.); সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব (66 Hons.); কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ (63 Hons), নববাবুবিলাস (60 B. A.); ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (60 B. A.); বান্ধব পত্রিকা (66 M. A.); নবপর্যায় বঙ্গদর্শন (66 M. A.); ফুলমণি ও করুণা (66 M. A.); প্রবোধচন্দ্রিকা (65 M. A.)।

২৩। নিম্নলিখিত লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :—

অক্ষয়কুমার দত্ত (64 M. A.), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (63 B. A., 66 Hons.), ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (63 B. A., 65 M. A.), দোম আন্তোনিও (60, 62 B.A.), ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (64 B. A., 64 Hons. 65-66 M. A.), ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (65 M. A.), প্যারীচাঁদ মিত্র (63 B. A.), রাজশেখর বসু (63 B. A., 65 M. A.), রামরাম বসু (63 Hons.), রমেশচন্দ্র দত্ত (64 B. A.), রাজনারায়ণ বসু (65 M. A.), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (65 M. A.), তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (64 M. A.), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (64 B.A.), সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (66 Hons.)।

নাটক

১। বাংলা নাটকের উদ্ভব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

অথবা,

বাংলা নাটক যে মিশ্র সাহিত্য সে-সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা কর।

উত্তর। পূর্ববাহিনী ব্রহ্মপুত্র ও পশ্চিমবাহিনী সিন্ধুর যুক্তবেণী যদি সম্ভবপর হইত, তবে উহা বাংলা নাটকের উৎপত্তির একটি সুন্দর উপমান হইতে পারিত। বস্তুত বাংলা নাটকের বহিরঙ্গে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব যেমন সুস্পষ্ট, উহার অন্তরঙ্গে দেশীয় ঐতিহ্যের ভাবাবেগজনিত তরঙ্গোচ্ছ্বাসও তেমনি প্রবল। উহার আঙ্গিক ইংরেজী নাটক হইতে গৃহীত, উহার প্রাণবস্তু পূর্বপ্রবহমান গীতাভিনয় বা যাত্রা হইতে আহৃত। সুতরাং বাংলা নাটকের উৎস-অনুসন্ধানে প্রাচীন যাত্রা এবং আধুনিক পাশ্চাত্ত্য প্রভাব দুইয়ের আলোচনাই অপরিহার্য।

প্রথমে যাত্রার কথাই ধরা যাক। কিন্তু আরম্ভের আগেও একটা আরম্ভের মতো যাত্রারও একটা আদিরূপ নিশ্চিতরূপেই বর্তমান ছিল, এমন ধারণা অযৌক্তিক নহে। কিন্তু সেই রূপ কি সংস্কৃত নাটকেরই অনুবর্তন, এরূপ প্রশ্ন সংগত কারণেই উঠিতে পারে। প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে সংস্কৃত নাটকের প্রচলন ছিল। কিন্তু উহা ছিল রাজদরবারের বস্তু, বিদগ্ধজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর, যাত্রার পশ্চাতে রহিয়াছে লোক-নাট্যের ঐতিহ্য, উহার ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত। তাহা ছাড়া বাংলা ভাষার উদ্ভবও ঘটিয়াছে অনেক পরে, মাত্র এক হাজার বৎসর উহার বয়স। চর্যাপদে 'নাটক' শব্দটির একটি ক্ষীণ আভাস মাত্র আছে। প্রাক-চৈতন্যযুগের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'ই সর্বপ্রথম আমরা 'নাট' কথাটির সাক্ষাৎ পাই। কাব্যটিকেও কতকগুলি পালার সমষ্টি বলিয়া ধরা যায়। গানগুলির মধ্যেও সংলাপের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণ, রাধা এবং বড়ায়িও গীতাভিনয়ের চরিত্রের ছাঁদেই গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, প্রাচীনকালে বাংলা দেশে যাত্রার ধরনে নাট-গীতের অভিনয় হইত।

যাত্রার আদি রূপ

নাট্য-গীতি : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

দুই বা তিন জন কিংবা তাহারও বেশী পাত্রপাত্রী গীতের সাহায্যে অনুরূপ কথোপকথন এবং অঙ্গভঙ্গি করিয়া পৌরাণিক ঘটনাবিশেষের—বিশেষত শ্রীকৃষ্ণ-সম্পর্কিত কাহিনীর—অভিনয় করিত। এইরূপ অভিনয়ের সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ষোড়শ শতকের একেবারে প্রারম্ভে—চৈতন্যযুগে। স্বয়ং শ্রীচৈতন্য তাঁহার মেসো চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে 'রুক্মিণীহরণ' অভিনয় করিয়াছিলেন। ইহাতে নৃত্য ও গীতেরই

কৃষ্ণযাত্রা

প্রাধান্য ছিল। সংলাপ যাহা ছিল তাহা পদ্যেই, গদ্যে নহে, এইরূপ অনুমান করা যায়। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতে 'কৃষ্ণযাত্রা' শব্দটির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই অভিনয়ের প্রভাবেই পরবর্তীকালে রচিত হয় রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিতমাধব' এবং কবি কর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামক সংস্কৃত নাটকগুলি।

মধ্যযুগে নাট্যরস পরিবেষণের প্রয়াস

মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যগুলি ছিল প্রধানত কাহিনীকাব্য। এইগুলি সাধারণত পাঠ করা হইত না, মন্দিরা, মৃদঙ্গ, নূপুর সহযোগে গীত হইত। কাহিনীর অন্তর্গত চরিত্রগুলির মধ্যে নাট্যগুণের অভাব ছিল না। অতএব অনুমান করা যায়, গাহিবার সময়ে গায়ক আঙ্গিক অভিব্যক্তির মাধ্যমেই কিছুটা নাট্যরস পরিবেষণেরও প্রয়াস পাইতেন।

এইরূপে ধর্মীয় কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়াই যে কৃষ্ণযাত্রার আরম্ভ হইয়াছিল, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত উহার ধারা প্রায় অব্যাহত ছিল। অবশ্য যাত্রা যে কেবল কৃষ্ণবিষয়কই ছিল তাহা নহে, 'চণ্ডীযাত্রা', 'শিবযাত্রা', 'মনসার ভাসান যাত্রা' প্রভৃতির উল্লেখও আমরা পাই। আদিতে 'যাত্রা' বলিতে দেবপূজা উপলক্ষে শোভাযাত্রা অথবা নাটগীতকেই বুঝাইত। কৃষ্ণযাত্রার মধ্যে কালিয়দমন পালা অধিক জনপ্রিয় ছিল বলিয়া কৃষ্ণযাত্রার নামান্তর হয় কালিয়দমন যাত্রা বা কালিয়দমন। কৃষ্ণযাত্রায় যাঁহারা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত বীরভূম জেলাবাসী পরমানন্দ অধিকারী, শ্রীদাম অধিকারী, সুদাম অধিকারী, লোচন অধিকারী, কাটোয়ার পীতাম্বর অধিকারী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যে বাঁধা যাত্রা-পালার সৃষ্টি হয়। বাঁধা যাত্রা-পালায় যাঁহারা খ্যাতিমান হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণনগরের গোবিন্দ অধিকারী ও কৃষ্ণকমল গোস্বামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। ইহার আগেই ভারতচন্দ্রীয় রসিকতার প্রভাবে জনমানসে এক-প্রকার রুচিবিকৃতি ঘটিয়াছিল। মানবিক কাহিনীপ্রধান বিদ্যাসুন্দর-যাত্রার উদ্ভব উহারই ফলশ্রুতি। এই সময়ে গোপাল উড়ের যাত্রাই ছিল প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণকমল ইহারই মধ্যে কৃষ্ণযাত্রাকে

যাত্রা : কালিয়দমন যাত্রা : যাত্রার প্রধান প্রধান অধিকারী

গোপাল উড়ে ও কৃষ্ণকমল গোস্বামী

কিছুটা উঁচু সুরে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। উহাতে গানেরই প্রাধান্য ছিল। এইজন্য 'যাত্রা'কে এখনও যাত্রা-গানই বলা হয়।

ইতিমধ্যে এদেশে ইংরেজী শিক্ষার হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছে। বিলাতী আদর্শে এখানে থিয়েটার এবং নাটক অভিনয়েরও প্রচলন হইয়াছে। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে যাত্রা-পদ্ধতির পরিবর্তনেরও প্রয়োজন দেখা দিল। মনোমোহন বসু, ব্রজমোহন রায়, মতিলাল রায়, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সুকণ্ঠ গায়ক ও বাঁধনদারের প্রচেষ্টায় ইংরেজী আদর্শের নাটকের সঙ্গে কথকতার ধরনের বক্তৃতা এবং যাত্রা ও পাঁচালী-পদ্ধতির ভক্তিরসপূর্ণ গান যোগ করিয়া নূতন যাত্রাপদ্ধতির সৃষ্টি হইল। অবশ্য এইরূপ যাত্রায় 'বক্তৃতা' থাকিলেও গানের প্রাধান্য যথেষ্টই ছিল। ঐ কারণে এইরূপ সংগীত-প্রধান পালাগানকে বলা হইত 'গীতাভিনয়'। আধুনিক কালেও যাত্রার পালাকে গীতাভিনয়ই বলা হইয়া থাকে।

নূতন যাত্রাপদ্ধতি

গীতাভিনয়

পূর্বে বলা হইয়াছে, যাত্রাগান প্রধানত দেবমাহাত্ম্য বর্ণনার নাচগান। মধ্যযুগে ইউরোপে Miracle Plays ও Morality Plays নামক ধর্মীয় অভিনয়ও ছিল দেবলীলামূলক। অবশ্য যাত্রার সঙ্গে উহাদের পার্থক্যও রহিয়াছে। যাত্রা গীতপ্রধান, Miracle ও Morality Plays সংলাপ ও অভিনয়প্রধান। এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন করা চলে: আধুনিক পশ্চাত্ত্য নাটকের সঙ্গে যখন Miracle ও Morality Plays এর সম্পর্ক বিশেষরূপে স্বীকৃত, সেক্ষেত্রে এদেশের যাত্রা হইতেই কেন এখানে নাট্যকলার উদ্ভব হইল না? ইহার উত্তরে বলিতে হয়, 'নাটক সব সময়েই মঞ্চের অপেক্ষা রাখে, এবং আধুনিক ধরনের মঞ্চ ইংরেজ আগমনের পুর্ব পর্যন্ত এদেশে অজ্ঞানা ছিল। অধিকন্তু যে সমাজের পরিবেশে নাটক সৃষ্টি সম্ভবপর, ইংরেজ আমলের পুর্বে বাংলা দেশে সেই পরিবেশের অভাব ছিল। যে কর্মচঞ্চল ব্যক্তি-চরিত্র নাট্যকলার মূল উপাদান, ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘাতেই এখানে তাহার স্ফুরণ ঘটিয়াছিল।' এখন সংক্ষেপে সেই স্ফুরণেরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইবে।

Miracle Plays
ও
Morality Plays

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই এদেশে ইংরেজী রঙ্গালয় স্থাপিত হইয়াছিল। উনবিংশ শতকে যখন বাঙালীর পুনরুজ্জীবন ঘটে, তখন তাহারা ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হয়। সেই সূত্রে শেক্‌স্‌পীয়র,

মলেয়ার প্রভৃতির সঙ্গেও। তারপর পাশ্চাত্ত্য নাট্যকলাসমন্বিত পাশ্চাত্ত্য নাটকের অভিনয় তাহারা দেখিল, তখন কৃষ্ণযাত্রা বা গীতাভিনয় আর তাহাদের রসপিপাসা নিবৃত্ত করিতে পারিল না। শিক্ষিত বাঙালী তাই ইংরেজী আদর্শে নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু সেই প্রয়াসেরই ফল। এইরূপে নাটক বলিতে আমরা যাহা বুঝি, পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফলেই তাহার উদ্ভব ঘটিল। কিন্তু দীনবন্ধুকে বাদ দিলে অপর দুইজনের নাটকে ইংরেজী আদর্শের সঙ্গে সংস্কৃত-রীতির মিশ্রণও দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং আদি বাংলা নাটক যে অবিমিশ্র সাহিত্য নয়, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। আবার কিছুকাল পরেই গিরিশচন্দ্রে আসিয়া বাংলা নাটকের মোড় ঘুরিল। সেখানে দেখি, প্রাচীন গীতাভিনয়েরই প্রাধান্য। চৈতন্যযুগ হইতে যে-ভক্তিপ্রবাহ বাঙালার অন্তরে প্রবহমান ছিল, যাহার আধারে যাত্রা ও গীতাভিনয় গড়িয়া উঠিয়াছিল, গিরিশচন্দ্রে মানবলীলা অপেক্ষা সেই দেবলীলার প্রতিই সমধিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং নাটক রচনা করিতে গিয়া আমরা পাশ্চাত্ত্য শৈলীকে গ্রহণ করিলেও বাঙালী সংস্কারকে যে কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই, ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য। তাই বলিতে হয়, বাংলা নাটকের উদ্ভব-মূলে পাশ্চাত্ত্য নাটক এবং দেশীয় যাত্রা দুই-ই ক্রিয়াশীল হইয়াছিল।

ইংরেজী রঙ্গালয়ের আদর্শ ও বাংলা নাটক

২। ১৮৭২ সালে প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত কলিকাতায় বিভিন্ন নাট্যশালা স্থাপনের ইতিহাস বিবৃত কর।

উত্তর। নাটক রচনার সঙ্গে নাট্যশালার যোগ অঙ্গাঙ্গিরূপে জড়িত। কারণ, নাটক অভিনয়ের মুখাপেক্ষী, এবং উহার অভিনয় রঙ্গমঞ্চেই হইয়া থাকে। কলিকাতায় ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীই সর্বপ্রথম এইরূপ নাট্যশালা স্থাপন করেন। ১৭৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'প্লে হাউস'ই প্রথম-প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চ। বলা বাহুল্য, এখানে ইংরেজী নাটকেরই অভিনয় হইত। পরবর্তী নাট্যশালার নাম 'ক্যালকাটা থিয়েটার'। উহার প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৭৬ সাল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এখানে কালিদাসের শকুন্তলা-নাটকের ইংরেজী অনুবাদও অভিনীত হইয়াছিল। পরবর্তী ইংরেজী নাট্যশালাগুলির মধ্যে 'ব্রিস্টো থিয়েটার', 'এথেনিয়ম', 'চৌরঙ্গী থিয়েটার', 'খিদিরপুর থিয়েটার', 'দমদম থিয়েটার',

প্লে হাউস ও অন্যান্য ইংরেজী নাট্যশালা

'বৈঠকখানা থিয়েটার', 'সাঁসুচি থিয়েটার' প্রভৃতি রঙ্গালয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। শিক্ষিত বাঙালীগণ এই সকল রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখিতে যাইতেন। উহা হইতেই পাশ্চাত্ত্য নাট্যকলা সম্বন্ধে তাঁহাদের ঔৎসুক্য জাগ্রত হয় এবং উহারই অনুকরণে এখানে বাংলা থিয়েটার স্থাপনের বাসনাও প্রবল হইয়া উঠে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হইলেও ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, এখানে প্রথম বাংলা থিয়েটার স্থাপিত হয়—কোনো বাঙালী দ্বারা নহে—রুশদেশীয় জনৈক ভদ্রলোকের দ্বারা। এই রুশ আগন্তুকের নাম গেরাসিম লেবেদেভ্ (Gerasim Lebedev)। ইনি ১৭৯৫ সালে ২৫নং ডোমতলায় (বর্তমান এজরা স্ট্রীট), 'বেঙ্গলী থিয়েটার' নামে একটি রঙ্গালয় গড়িয়া তোলেন। এখানে 'The Disguise' এবং 'Love is the Best Doctor' নামে দুইখানি ইংরেজী নাটক বাংলায় অনূদিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল। বাংলা অনুবাদে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন গোলোকনাথ দাস নামক একজন পণ্ডিত। কিন্তু যে-কোন কারণেই হউক, এই রঙ্গমঞ্চ স্থায়ী হয় নাই, ১৭৯৬ সালের মার্চ মাসের অভিনয়ই এখানকার শেষ অভিনয়।

গেরাসিম লেবেদেভ্ ও বেঙ্গলী থিয়েটার

ইহার পর প্রায় ৪০ বৎসরের মধ্যে বাংলা নাটকের অভিনয়ের কথা শুনা যায় নাই। তবে ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর যে 'হিন্দু থিয়েটার' স্থাপন করিয়াছিলেন, উহাতে ইংরেজী নাটক এবং সংস্কৃত 'উত্তররামচরিতে'র ইংরেজী অনুবাদ ব্যতীত অন্য কোন নাটক অভিনীত হয় নাই। দ্বিতীয় বার বাংলা নাটকের অভিনয় হয় শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে। ১৮৩৫ সালের অক্টোবর মাসে এখানে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল। সমসাময়িক তথ্য হইতে জানা যায়, ঐ অভিনয়ে বিদ্যাসুন্দরের গীত ও স্ত্রী-ভূমিকার অভিনেত্রীদের বিশেষ প্রশংসা হইয়াছিল।

হিন্দু থিয়েটার ও নবীন বসুর বাড়ির থিয়েটার

কিন্তু ততদিনে বাঙালী শেক্স্পীয়রের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছে, তাই 'বিদ্যাসুন্দর' আর তাহাদের রসপিপাসা নিবৃত্ত করিতে পারিতেছিল না। অথচ বাংলা নাটক তখন পর্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই। তাই আবার ইংরেজী নাটকের দিকেই মুখ ফিরাইতে হইল। ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ছাত্ররা 'ওরিয়েন্টাল থিয়েটার' স্থাপন করিয়া ১৮৫৪ সালে 'ওথেলো'র অভিনয় করিল। পরে 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' এবং 'হেনরি দি

ওরিয়েন্টাল থিয়েটার

ফোর্থ'-এর অভিনয়ও এখানে হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ প্রয়াস দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই।

অতঃপর আমরা রঙ্গালয়ে দেখিতে পাই বাংলা নাটকের যুগ। সেই নাটকগুলির কিছু-বা মৌলিক, আর কিছু সংস্কৃত নাটকের বাংলা অনুবাদ। এইরূপ প্রথম উল্লেখযোগ্য নাটক হইল 'শকুন্তলা'। ইহা ১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবু) বাড়িতে অভিনীত হয়। কিন্তু ঐ বৎসরের মার্চ মাসেই নূতন বাজারে রামজয় বসাকের বাড়িতে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-এর যে অভিনয় হয়, উহা বিশেষভাবে স্মরণীয় এইজন্য যে, সেই প্রথম মৌলিক বাংলা নাটকের অভিনয় হইল। ১৮৫৭-৫৯ সালের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার'-এ অভিনীত হয় 'বেণীসংহার', 'বিক্রমোর্বশী', 'মালতী-মাধব' প্রভৃতি অনূদিত নাটক এবং কালীপ্রসন্নেরই মৌলিক নাটক 'সাবিত্রী-সত্যবান'। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে তাঁহাদের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে স্থাপিত হয় 'বেলগাছিয়া থিয়েটার'। ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসে রামনারয়ণ-অনূদিত 'রত্নাবলী' নাটক দ্বারা মহাসমারোহে এই মঞ্চের উদ্বোধন হয়। এই অভিনয়ের সূত্রেই মধুসূদন বাংলা নাটক রচনায় প্রেরণা লাভ করেন। পর বৎসর সেপ্টেম্বর মাসেই এখানে মধুসূদনের মৌলিক বাংলা নাটক 'শর্মিষ্ঠা'র অভিনয় হয়। ইহার পর ধনী ব্যক্তিদের চেষ্টায় আরও বহু মঞ্চ এখানে-সেখানে গড়িয়া উঠে। উহাদের মধ্যে 'মেট্রোপলিটান থিয়েটার', 'পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়', 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা', 'বহুবাজার নাট্যালয়' প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

প্রথম মৌলিক বাংলা নাটকের অভিনয়

বেলগাছিয়া থিয়েটার ও মধুসূদন

'হিন্দু থিয়েটার' হইতে আরম্ভ করিয়া এতক্ষণ পর্যন্ত যে-সকল নাট্যালয়ের নাম করা হইল, সেগুলি প্রধানত ধনী ব্যক্তিগণের পৃষ্ঠপোষকতায়, হয় তাঁহাদের বাড়িতে না হয় বাগানবাড়িতে, স্থাপিত হইয়াছিল। এইসব থিয়েটারে অভিজাত সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু জনগণের সঙ্গে যোগ না ঘটিলে নাটক ও নাট্যশালার উন্নতি সুদূর-পরাহত হইয়া থাকে। উহাকেই সম্ভবপর করিয়া তুলিলেন 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার'-এর

ন্যাশন্যাল থিয়েটার: প্রথম বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়

কতিপয় সভ্য। ১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বহির্বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে 'ন্যাশন্যাল থিয়েটার' স্থাপিত হইল এবং দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকের মাধ্যমে উহার শুভ উদ্বোধন ঘটিল। উল্লেখযোগ্য, গিরিশচন্দ্র 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার'-এর একজন বিশিষ্ট সভ্য হইলেও ন্যাশন্যাল থিয়েটার-এর প্রতিষ্ঠায় অংশ গ্রহণ করেন নাই। অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন আরও পরে। ন্যাশন্যাল থিয়েটারেই প্রথম এদেশে সর্বসাধারণের নিকট টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। এইরূপে বাংলা শখের থিয়েটার সাধারণ রঙ্গালয়ে পরিণত হইবার পর্বে প্রবেশ করে।

৩। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী এবং সংস্কৃত নাটক অবলম্বনে যে সকল বাংলা নাটক রচিত হইয়াছিল, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দাও।

উত্তর। কলিকাতায় বাঙালী কর্তৃক নাট্যশালা স্থাপনের প্রথম পর্ব হইতেই ঐ সকল নাট্যশালায় শেক্‌স্‌পীয়রের ইংরেজী নাটক অভিনীত হইতে থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায়, শেক্‌স্‌পীয়রই তৎকালীন ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর মনোহরণ করিয়াছিলেন। ইহা বাঙালীর নাট্যরসবোধেরও পরিচায়ক। এই সঙ্গে, বাংলা ভাষাতেও শেক্‌স্‌পীয়রের অনুবাদ অথবা অনুসরণ চলে কি না তাহারও একটা প্রেরণা বাঙালীর মধ্যে দেখা দিয়াছিল। এই কারণেই দেখা যায়, উনিশ শতকের মাঝামাঝি হইতে প্রায় শেষ পর্যন্ত এখানে যে সকল ইংরেজী নাটকের অনুবাদ অথবা অনুসরণ হইয়াছে, শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকই ছিল উহার প্রধান অবলম্বন। এ বিষয় আমরা হরচন্দ্র ঘোষকেই পথিকৃৎ বলিয়া ধরিতে পারি। ১৮৫৩ সালে 'The Merchant of Venice' অবলম্বনে তিনি 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস' নাটক রচনা করেন। ১৮৬৪ সালে রচিত হয় 'Romeo Juliet' অবলম্বনে 'চারুমুখ-চিত্তহরা'। অবশ্য তাঁহার রচনায় নাট্যগুণের নিতান্তই অভাব ছিল।

প্রধান অবলম্বন: শেক্‌স্‌পীয়র প্রথম পৃথিকৃৎ: হরচন্দ্র ঘোষ

১৮৬৭ সালে রচিত হয় 'সুরলতা নাটক'। লেখক প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়। ইহার অবলম্বন 'The Merchant of Venice'. ১৮৬৮ সালে লিখিত চন্দ্রকালী ঘোষের 'কুসুমকুমারী নাটক' 'Cymbeline'-এর অনুবাদ। ঐ সালেই রচিত হেমচন্দ্রের 'নলিনীবসন্ত নাটক' 'The Tempest'-এর অনুবাদ। বেণীমাধব ঘোষের 'ভ্রমকৌতুক নাটক' (১৮৭২) এবং তারিণীচরণ পালের 'ভীমসিংহ নাটক' (১৮৭৪) লিখিত হয় যথাক্রমে 'The Comedy

of Errors' ও 'Othelo' অবলম্বনে। 'Hamlet' অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল প্রমথনাথ বসুর 'অমরসিংহ নাটক' (১৮৭৪) ও হরলাল রায়ের 'রুদ্রপাল নাটক' (১৮৭৪)। পরবর্তীকালে 'হরিরাজ' নামে ইহার আর একটি অনুবাদ হইয়াছিল। উহার রচয়িতা হিসাবে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নামই প্রচলিত। তবে এ বিষয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ আছে। 'Macbeth' অনুবাদ করিয়াছিলেন তারকনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭৫) ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৯৩)। 'মদনমঞ্জরী নাটক' (১৮৭৬) ও যোগেন্দ্রনারায়ণ দাসঘোষের 'অজয়সিংহ-বিলাসবতী নাটক' (১৮৭৮) যথাক্রমে 'The Winter's Tale' ও 'Romeo 'Juliet'-এর অনুবাদ। নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের 'শরৎশশী নাটক'-এর মূল হইতেছে 'A Mid-Summer Night's Dream'. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদ করিয়াছিলেন 'Julius Caesar' নাটকের। শেক্‌স্‌পীয়র ব্যতীত Rowe প্রণীত 'The Fair Patient' নাটক অবলম্বনে শ্যামাচরণ দাস দত্ত রচনা করিয়াছিলেন 'অনুতাপিনী নবকামিনী নাটক'।

অন্যান্য অনূদিত নাটক

শেক্‌স্‌পীয়র অবলম্বনে রচিত নাটকের মতো বিভিন্ন সংস্কৃত নাটক অবলম্বনেও বহু বাংলা নাটক রচিত হইয়াছিল। ঐগুলি ছিল প্রধানত অনুবাদ। তন্মধ্যে প্রথমেই নাম করিতে হয় নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা-নাটক'-এর (১৮৫৫)। রামনারায়ণ তর্করত্নও কয়েকটি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন। সেগুলি হইল ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' (১৮৫৩), শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' (১৮৫৮), কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক' (১৮৬০), ভবভূতির 'মালতীমাধব নাটক' (১৮৬৭)। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭) ও 'মালতী-মাধব নাটক'-এর (১৮৫৯) নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু ভালো সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু অনূদিত সংস্কৃত নাটকগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হইল বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন কর্তৃক অনূদিত কৃষ্ণ মিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটক (১৮৩৯-৪০)।

অনূদিত সংস্কৃত নাটক

৪। নিম্নলিখিত নাট্যকারদের সম্বন্ধে টীকা লিখ ঃ

(ক) যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত ; (খ) তারাচরণ শিকদার ; (গ) হরচন্দ্র ঘোষ ; (ঘ) কালীপ্রসন্ন সিংহ।

উত্তর। (ক) যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত ঃ প্রথম বাংলা নাটক রচনার গৌরব

যে দুইজন নাট্যকারের প্রাপ্য, যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ১৮৫২ সালে ইংরেজী নাট্যসাহিত্যের আদর্শে কীর্তিবিলাস নামে একখানি নাটক রচনা করেন। নাটকটি কোনো রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় নাই, সুতরাং পাঠ্য নাটক হিসাবেই উহার পরিচয়। কিন্তু সাহিত্য-বিচারে নাটকটি নিতান্তই নগণ্য। নাটকটিতে শেক্‌স্‌পীয়রের 'হ্যামলেট'-এর ছাপ থাকিলেও মূলত উহা এই দেশে প্রচলিত বিজয়-বসন্ত কাহিনীরই অনুসরণ। তবে 'কীর্তিবিলাসে'ই বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম ট্র্যাজিডি রচনার প্রয়াস পরিস্ফুট, এই হিসাবেই নাটকখানির যাহা কিছু গুরুত্ব। এই দেশের নাটকে ট্র্যাজিডির ঐতিহ্য ছিল না, যোগেন্দ্রচন্দ্র সেই ঐতিহ্যকে অতিক্রম করিবার দুঃসাহস দেখাইয়াছিলেন। অবশ্য এই প্রয়াসে যে তিনি বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা বলা চলে না। যে-কর্মসংঘাত বা action পাশ্চাত্ত্য নাটকের প্রাণবস্তু, ইহাতে তাহা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। চরিত্র-চিত্রণেও ব্যর্থতার পরিচয় পরিস্ফুট। নাটকটিতে পাশ্চাত্ত্য নাট্যরীতির অনুসরণের প্রয়াস থাকিলেও সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে উহাতে 'নান্দী' 'প্রস্তাবনা' প্রভৃতিও রহিয়াছে।

(খ) তারাচরণ শিকদারঃ যে-বৎসর 'কীর্তিবিলাস' প্রকাশিত হয়, তারাচরণ শিকদার রচিত 'ভদ্রার্জুন' নাটকের প্রকাশকালও সেই বৎসর (১৮৫২)। অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রাহরণের উপাখ্যানমূলক এই নাটকের গল্পাংশ মহাভারতের আদিপর্ব হইতে গৃহীত হইলেও ইহার রচনাপ্রণালী বহুলাংশে মৌলিক। এই নাটকে ইংরেজী ও সংস্কৃত নাট্যাদর্শের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। 'ইহাতে সংস্কৃত নাটকের নান্দী ও প্রস্তাবনা এবং বিদূষকের ভূমিকা পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং ইংরেজী নাটকের মতো ঘটনা ও সংস্থান এবং অঙ্কের অন্তর্গত একাধিক scene বা সংযোগস্থল প্রযুক্ত হইয়াছে।' নাটকের ভূমিকায় তারাচরণ লিখিয়াছেন, "এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাবস্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইউরোপীয় নাটক-প্রায় হইয়াছে।" কিন্তু 'আসলে মহাভারতের আখ্যানটি কথোপকথনে প্রকাশের চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহার বেশী নাট্যগুণ "ভদ্রার্জুনে" বিশেষ নাই।' নাটকটি অংশত গদ্যে এবং বেশীর ভাগ পদ্যে রচিত। গদ্যাংশের ভাষা সরল। চিত্রগুলিতেও মাঝে মাঝে সজীবতার স্পর্শ অনুভব করিতে পারা যায়। এই নাটকটিও কোন মঞ্চে অভিনীত হয় নাই।

(গ) হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭-১৮৮৪)ঃ হরচন্দ্র ঘোষ ছিলেন পদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং কলেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী। বাংলা এবং

সংস্কৃতের মতো ইংরেজীতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। এই কারণে দেখা যায় তিনি নাটক রচনায় সংস্কৃত এবং বাংলা ঐতিহ্যকে যেমন গ্রহণ করিয়াছেন, ইংরেজী আদর্শকেও তেমনি বরণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রয়াস সাধু হইলেও নাটক রচনার মতো প্রতিভা তাঁহার ছিল না। তাঁহার প্রথম রচিত নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস'ই (১৮৫৩) তাহার প্রমাণ। নাটকটি শেক্‌স্‌পীয়রের 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস'-এর অনুসরণ। তথাপি নাটকটি 'নাটক' হইয়া উঠিতে পারে নাই। তিনি ইচ্ছামতো মূল নাটকের অনেক পরিবর্তন করিয়াছেন, কিন্তু উহা নাট্যগুণসম্পন্ন হইয়া উঠে নাই। কারণ পোর্সিয়াকে ভানুমতীতে এবং বেসানিওকে চিত্তবিলাসে নামান্তরিত করিলেই নাটকের প্রাণবস্তু ভাবান্তরিত হয় না। তাহা ছাড়া, কৃত্রিম সাধুভাষাও তাহার নাট্যরস সৃষ্টির পরিপন্থী হইয়াছিল। হরচন্দ্রের দ্বিতীয় নাটক 'কৌরব বিয়োগ' (১৮৫৮)। এই পঞ্চাঙ্ক নাটকটির কাহিনী কাশীদাসী মহাভারত হইতে গৃহীত এবং ইহা গদ্যে-পদ্যে রচিত। তাঁহার তৃতীয় নাটক 'চারুমুখচিত্তহরা'র রচনাকাল ১৮৬৪ সাল। এই নাটকটিও শেক্‌স্‌পীয়রের 'রোমিও জুলিয়েট'-এর অনুবাদ। কিন্তু সেই অনুবাদের ভাষা ও ভঙ্গি এমন যে, উহাকে 'শেক্‌স্‌পীয়রের অনুবাদ বলিয়া ধরাই ধৃষ্টতা'। ইহার পূর্বে মধুসূদনের নাটকগুলি এবং দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' ও 'নবীন তপস্বিনী' প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে হরচন্দ্র ঘোষকে একজন ব্যর্থ নাট্যকারই বলিতে হয়। তাঁহার কৃতিত্ব এই যে, তিনিই সর্বপ্রথম শেক্‌স্‌পীয়র অবলম্বনে বাংলা নাটক রচনায় প্রয়াস পাইয়াছিলেন। হরচন্দ্রের চতুর্থ রচনা 'রজতগিরিনন্দিনী' (১৮৭৪) ব্রহ্মদেশীয় একটি উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত।

(ঘ) কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০): 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র লেখক এবং সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদক হিসাবেই কালীপ্রসন্ন বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিমান্। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের পরিপোষক হিসাবেও বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে তাঁহার নাম স্মরণীয়। তিনি 'বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার'-এর (১৮৫৬) প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং প্রধানত সেই সূত্রেই তিনি নাট্যকার। অবশ্য তাঁহার প্রথম নাটক 'বাবু' রচিত হইয়াছিল ১৮৫৪ সালে। কিন্তু এই নাটকের কোনো অভিনয় হয় নাই। তাঁহার রচিত 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭), 'সাবিত্রী-সত্যবান' (১৮৫৮) এবং 'মালতী-মাধব' (১৮৫৯) এই তিনখানি নাটকই অভিনীত হইয়াছিল। 'বিক্রমোর্বশী' এবং 'মালতী-মাধব'

যথাক্রমে কালিদাস ও ভবভূতির নাটকের অনুবাদ। তবে 'সাবিত্রী-সত্যবান' তাঁহার নিজের রচনা। তথাপি তিনি সংস্কৃত আদর্শের অনুসরণেই নাটক রচনা করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার ভাষা ছিল চলিত, কিন্তু উহা তখনও কৃত্রিমতার গণ্ডি পার হইতে পারে নাই। শেষ দুইটি নাটকে কালীপ্রসন্ন প্রচুর গীতের সমাবেশ করিয়াছেন। ইহা যে যাত্রার ঐতিহ্যেরই অনুবর্তন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৫। রামনারায়ণের নাটকগুলির পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁহার নাট্যকৃতিত্বের আলোচনা কর।

উত্তর। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির সংঘাতের ফলে এদেশের শিক্ষিত জন-মানসে সমাজ-সংস্কারের যে বাসনা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, রামনারায়ণের প্রথম দুইটি নাটকে তাহারই প্রতিফলন আভাসিত। সেদিনকার শিক্ষিত নাট্যামোদীরাও সমাজ-সংস্কার চাহিয়াছিলেন, রামনারায়ণের নাটক তাহার মূলে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিল। এইজন্য তাঁহার সামাজিক নাটক দুইটি উগ্র প্রচারগন্ধী হইয়াও তৎকালে বহুল প্রশংসা লাভ করিয়াছিল এবং বাংলা নাটকের প্রস্তুতি-পর্বে রামনারায়ণকে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের আসন দান করিয়াছিল। সুদীর্ঘ বিশ বৎসরেরও অধিক কালের (১৮৫৪-১৮৭৫) নাট্যসাধনায় রামনারায়ণ সেই আসন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং 'নাটুকে রামনারায়ণ' রূপে খ্যাত হইয়াছিলেন।

রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২-১৮৮৬) প্রথম নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪)। বস্তুত এই নাটক দ্বারাই রামনারায়ণের পরিচয় এবং ইহারই মাধ্যমে তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যে স্মরণীয়। কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে সর্বোৎকৃষ্ট নাটক রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। উহাতেই আকৃষ্ট হইয়া রামনারায়ণ তাঁহার প্রথম নাটক রচনা করেন এবং পুরস্কারটিও লাভ করেন। ১৮৫৭ সালে উহার প্রথম অভিনয় হয় এবং নাটকটি শিক্ষিতজনপ্রিয় হইয়া উঠে। ফলে নাটকটি বারবার অভিনীত হইতে থাকে এবং এই সূত্রেই রামনারায়ণও তৎকালে বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রধান পুরুষ তথা কর্ণধার হইয়া উঠেন। এই ব্যঙ্গপ্রধান নাটকে কুলীনদিগের বহুবিবাহপ্রথার দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। নাটকটিতে প্লট বলিয়া কিছু নাই, উহা কতকগুলি কৌতুকপূর্ণ দৃশ্যপরম্পরা মাত্র। কাহিনীর সঙ্গে সংস্রব নাই, এমন বহু দৃশ্য এবং বিষয়ও ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে।

কুলীনকুলসর্বস্ব

অনৃতাচার্য, অধর্মরুচি, বিবাহবণিক, উদরপরায়ণ, বিবাহবাতুল, অভব্যচন্দ্র প্রভৃতি নাটকীয় চরিত্রের নামগুলি হইতেও বুঝা যায় নাট্যকার চরিত্রসৃষ্টি অপেক্ষা 'টাইপ' সৃষ্টির দিকেই বেশী নজর দিয়াছেন। গঠনের দিক আলোচনা করিলে দেখা যায়, নাটক রচনায় রামনারায়ণ সংস্কৃতের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে নাটকটিতে নান্দী ও প্রস্তাবনা রহিয়াছে। আবার যাত্রার মতো পয়ার ত্রিপদীযুক্ত উক্তি-প্রত্যুক্তিও রহিয়াছে। তবে যাত্রার মতো সংগীতবাহুল্য ইহাতে নাই। তাহা ছাড়া, নিম্নস্তরের চরিত্র সৃষ্টিতে এবং উহাদের সংলাপে রামনারায়ণ বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তবে সমাজের উচ্চস্তরের লোকচরিত্র সৃষ্টিতে তিনি ব্যর্থ। বহু স্থানে অমার্জিত ভাষার ত্রুটিও রহিয়াছে। অবশ্য অপরিপুষ্ট বাংলা গদ্যের সেই যুগে নাটকীয় ভাষার ত্রুটি কিছুটা মার্জনীয়। এতদ্ব্যতীত সামাজিক নাটকের যে তিনিই প্রবর্তক, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অধিকন্তু এই নাটক পরবর্তী বহু সামাজিক নাটকের প্রেরণাস্বরূপ হইয়াছিল। তন্মধ্যে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক' (১৮৫৬), উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবোদ্বাহ নাটক' (১৮৫৬), রাধামাধব মিত্রের 'বিধবা-মনোরঞ্জন নাটক' (১৮৫৬), অম্বিকাচরণ বসুর 'কুলীন-কায়স্থ নাটক' (১৮৬১) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

রামনারায়ণের দ্বিতীয় নাটক 'বেণীসংহার' (১৮৫৭)। ইহা ভট্টনারায়ণ রচিত সংস্কৃত পৌরাণিক নাটকের অনুবাদ। শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটকের অনুবাদও তিনি করিয়াছিলেন। উহা ১৮৫৮ সালে বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। এই নাটকের ইংরেজী অনুবাদের জন্যই মধুসূদন নিযুক্ত হন এবং সেই সূত্রেই বাংলা নাটকের নব-উষার স্বর্ণতোরণদ্বার উন্মুক্ত হয়। নাট্যক্ষেত্রে মধুসূদনের (১৮৫৯)—এমন কি দীনবন্ধুর (১৮৬০)—আবির্ভাবের পরেও রামনারায়ণের উচ্চাসন অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই দেখিতে পাই, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে গুণীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে দিয়াই 'নবনাটক' (১৮৬৬) লিখাইয়াছিলেন এবং সেজন্য পুরস্কারও দিয়াছিলেন। নাটকটি অভিনীতও হইয়াছিল। বহুবিবাহ প্রথাকে নিন্দা করাই ছিল নাটকটির উদ্দেশ্য। রামনারায়ণের অন্যান্য নাটক হইল—অভিজ্ঞান-শকুন্তলা (১৮৬০—অনুবাদ-নাটক), 'মালতী-মাধব' (১৮৬৭ —অনুবাদ-নাটক), 'রুক্মিণীহরণ' (১৮৭১—পৌরাণিক নাটক), 'কংসবধ'

অন্যান্য নাটক

(১৮৭৫—পৌরাণিক নাটক), 'ধর্মবিজয়' (১৮৭৫—হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানমূলক পৌরাণিক নাটক) প্রভৃতি। 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', 'চক্ষুদান', 'উভয় সংকট' প্রভৃতি কয়েকখানি প্রহসনও তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

দেখা যাইতেছে, রামনারায়ণ নাট্যশাখার প্রধান প্রধান সব ধারাতেই লেখনী চালনা করিয়াছেন। অনুবাদ এবং পৌরাণিক নাটকের ধারাটিকে তিনি প্রসারিত করিয়াছেন। সামাজিক নাটকের প্রথম প্রবর্তন করিয়াছেন। প্রহসন রচনাতেও পশ্চাৎপদ থাকেন নাই। এইগুলিই রামনারায়ণের নাট্যকৃতিত্ব। নহিলে, সার্থক নাটক তিনি কিছুই সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তাঁহার রচনায় শিল্পগুণেরও অভাব ছিল। সেই শিল্পগুণ দেখা দিয়াছে প্রথম মধুসূদনে এবং পরে দীনবন্ধুতে। ঐ দুইজনই বাংলা নাটকের প্রকাশ-পর্বের প্রধান নাট্যকার। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে, বাংলা নাটকের প্রস্তুতি-পর্বের সর্বপ্রধান নাট্যকার হিসাবে রামনারায়ণ মধুসূদন-দীনবন্ধুর সৃজনশীল পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন।

রামনারায়ণের নাট্যকৃতিত্ব

৬। "মধুসূদনের প্রতিভার করস্পর্শে পুরাণ প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল, ইতিহাস সঞ্জীবিত হইল, সামাজিক জীবন নবজীবন লাভ করিল।"—মধুসূদনের নাট্যরচনার পরিচয় প্রসঙ্গে এই মন্তব্যটির বিচার কর।

উত্তর। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন 'মহাকবি' রূপেই সমধিক পরিচিত। কিন্তু তাঁহার জীবনের সাহিত্যকৃতির ইতিহাসে তিনি আগে নাট্যকার, পরে কবি। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার প্রকাশ আকস্মিকতায় উদ্দীপ্ত। কিন্তু আন্তর প্রেরণার সঙ্গে প্রতিভার মিলন না ঘটিলে কেবল আকস্মিকতাই স্মরণীয় এবং বৈপ্লবিক কোনো সৃষ্টির হেতু হইতে পারে না। মধুসূদনের মধ্যে সেই স্বর্ণশম্পানিভ প্রতিভা ছিল, তাই উহার স্ফুরণে বাংলার অন্ধকার নাট্যজগৎ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। উহারই মধ্যে বাঙালী নাট্যরসিকেরা এক নবযুগের সূচনা অনুভব করিয়াছিলেন। মধুসূদনের পূর্বে বাংলায় যে কয়টি মৌলিক নাটক রচিত হইয়াছিল, উহারা ছিল অঙ্কে এবং দৃশ্যে বিভক্ত কোনো কাহিনীর অনুসরণ মাত্র। কি নাট্যশৈলীতে, কি ভাবে, কি ভাষায়, কি চরিত্র-চিত্রণে, কি নাটকীয় ক্রিয়ায় ঐ সকলের মধ্যে ছিল একটা কৃত্রিমতার আবরণ। মধুসূদন সেই কৃত্রিমতার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করিলেন। তিনি যে

প্রাক্-মধুসূদন যুগের বাংলা নাটক ও মধুসূদন

পৌরাণিক নাটক লিখিলেন, উহা 'ভদ্রার্জুন' অথবা 'বেণীসংহার' কিংবা 'রত্নাবলী'র আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ; যে-ঐতিহাসিক নাটক লিখিলেন তাহা 'কীর্তিবিলাস'-এর তথাকথিত ট্র্যাজিডি-বিলাস নহে, পাশ্চাত্ত্য ট্র্যাজিডির উষ্ণ চলমান রক্ত বাংলা নাটকের ধমনীতে অনুসঞ্চার; যে-সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি তাঁহার প্রহসনে প্রতিফলিত হইল তাহা প্রাণবান মানুষের পদসঞ্চারে প্রতিধ্বনিত। বস্তুত, নাটকের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি প্রাচীনতার জড়ত্ব মোচন করিয়া সেখানে স্ফূর্তপ্রাণ নবীনতার সঞ্চার করিয়াছিলেন।

মধুসূদনের পূর্বে যাঁহারা নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পাশ্চাত্ত্য নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত থাকিলেও তাঁহাদের নাট্যরসবোধ তেমন উন্নত ছিল না, নাট্যরচনার প্রতিভা তো ছিলই না। সুতরাং তাঁহাদের নাটকও ছিল নিম্ন মানের। নাটকের এই দুর্দশায় মধুসূদন ব্যথিত হইয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, "অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে, নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।" বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত 'রত্নাবলী'র ইংরেজী অনুবাদ করিতে গিয়া এবং আমন্ত্রিত অতিথিরূপে সেই নাটকের অভিনয় দেখিয়া 'কুনাট্য' সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়াছিল। উহাই তাঁহাকে নাটক লিখিতে প্রেরণা দান করে এবং তিনি তাঁহার প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) রচনা করেন।

প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'

মহাভারতের যযাতি-উপাখ্যান এই নাটকের ভিত্তি। এই নাটক সম্বন্ধে পরে একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "আমি এই নাটক এমন সমস্ত লোকের জন্যই লিখিয়াছি, যাঁহারা আমার ভাবেই ভাবিত; যাঁহারা ন্যূনাধিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্ত্য নিয়মেই চিন্তা করেন। প্রাচীন সংস্কৃত আদর্শের অনুসরণ করিয়া আমাদের চিন্তার চরণে যে-শৃঙ্খল পড়িয়াছে, তাহা মোচন করাই আমার উদ্দেশ্য।" প্রাচীন সংস্কৃত প্রয়োগরীতি সম্পর্কে মধুসূদন সর্বপ্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। 'শর্মিষ্ঠা'য় তাই নান্দী, প্রস্তাবনা, বিষ্কম্ভক প্রভৃতি সংস্কৃত নাট্যশৈলী পরিত্যক্ত হইল। কিন্তু গভীর বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, বাহিরে সংস্কৃত নাটকের আদর্শ ত্যাগ করিলেও, নানাভাবে তিনি উহারই অনুসরণ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'শর্মিষ্ঠা'র দীর্ঘ স্বগতোক্তি-গুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য নাটকে স্বগতোক্তি নাটকীয় চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশের এবং নাটকীয় কর্মসংঘাতের বিকাশের ধারায়

স্বাভাবিকরূপেই উপস্থাপিত হয়। কিন্তু আলোচ্য নাটকে স্বগতোক্তি কেবল কাহিনী বর্ণনার উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, নাটকের ভাষা সংস্কৃত নাটকের অলংকারবহুল ভাষার অনুসারী হওয়ার জন্য উহাতে কিছুটা কৃত্রিমতার সঞ্চার হইয়াছে। তৃতীয়ত, নাট্যকাহিনীর বহু বিষয় সংলাপের মাধ্যমেই বিবৃত হইয়াছে কিন্তু পাশ্চাত্ত্য নাটকে উহা কর্মসংঘাতের ভিতর দিয়াই উপস্থাপিত হয়। চতুর্থত, শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতিকে কেন্দ্র করিয়া যে-নাটকীয় দ্বন্দ্ব স্ফুরণের সম্ভাবনা ছিল, নাট্যকার—যে-কোনো কারণেই হোক—তাহা এড়াইয়া গিয়াছেন। তথাপি যে-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নাট্যরসের প্রাণবস্তু, দেবযানী-চরিত্রে আমরা উহার প্রথম প্রকাশ দেখিতে পাই। এই হিসাবে, নাটকটি খুব উন্নত রচনা না হইলেও ইহাতে পুরাণকাহিনীকে নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিবার প্রয়াস রহিয়াছে।

মধুসূদনের পরবর্তী নাটক 'পদ্মাবতী' (১৮৬০)। এই নাটকটিকে গ্রীক-পুরাণ-কাহিনীর বঙ্গীকরণ বলা যাইতে পারে। এই নাটকে 'Apple of Discord' কাহিনীর হেরা, এথেনে ও আফ্রোদিতে যথাক্রমে ইন্দ্রপত্নী শচী, কুবেরপত্নী মুরজা ও মদনপত্নী রতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। গ্রীক-কাহিনীর প্যারিস ও হেলেন এখানে বিদর্ভরাজ ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীতে পরিণত। গ্রীক-গল্পে সোনার আপেল লইয়া বিরোধ, 'পদ্মাবতী'তে স্বর্ণপদ্ম লইয়া দ্বন্দ্ব। গ্রীক-উপাখ্যানে আফ্রোদিতিকে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলায় প্যারিস অপর দুই দেবীর কোপে পতিত হন, আর পদ্মাবতীতে অনুরূপভাবে রতিকে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলায় ইন্দ্রনীলকে শচী ও মুরজার ক্রোধে নানা দুর্ভোগ ভুগিতে হয়। দুই কাহিনীর মধ্যে মিল এই পর্যন্ত, 'পদ্মাবতী'র অবশিষ্ট কাহিনী মধুসূদন-উদ্ভাবিত। মধুসূদনের কৃতিত্ব এই যে, তিনি একটি পাশ্চাত্ত্য পৌরাণিক কাহিনীকে স্বীয় কল্পনাবলে প্রাচ্য পৌরাণিক কাহিনীর অনুরূপ করিয়া সাজাইতে পারিয়াছেন। অবশ্য নাট্যরচনায় মধুসূদন যে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন তাহা নহে। তবে 'শর্মিষ্ঠা'র তুলনায় এই নাটকে ভাষা বহুলাংশে সহজ, কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টির প্রয়াসও পরিস্ফুট। বর্ণনাত্মক সংলাপ অপেক্ষা ক্রিয়াত্মক ঘটনাকে মধুসূদন এই নাটকে প্রাধান্য দিয়াছেন। সর্বোপরি, এই প্রথম বাংলা নাটকে রোম্যান্টিক কমেডি সৃষ্টির প্রয়াস দেখিতে পাই। আরও একটি কারণে নাটকটির ঐতিহাসিক মূল্য রহিয়াছে। এই নাটকেই মধুসূদন প্রথম—অপরিণত এবং অত্যল্প মাত্রায় হইলেও—অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেন।

দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী'

মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। ইহার কাহিনী টডের 'রাজস্থান' হইতে গৃহীত। কিন্তু নাট্যকাহিনীতে মধুসূদন টড-কে সর্বাংশে অনুসরণ করেন নাই। তথাপি, 'রাজস্থান'-এর বহু কাহিনী ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করিয়াছে বলিয়া 'কৃষ্ণকুমারী'কে আমরা ঐতিহাসিক নাটক বলিতে পারি। ইহাই প্রথম মৌলিক বাংলা ঐতিহাসিক নাটক। কেবল তাহাই নহে, এই নাটকেই সর্বপ্রথম ট্র্যাজিডিকে সার্থকভাবে রূপায়িত করিবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। 'কৃষ্ণকুমারী'র কাহিনী সংক্ষেপে এইরূপ।

মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'

বিলাসী লম্পট জগৎসিংহ ছিলেন জয়পুরের রাজা। তাঁহার এক রক্ষিতা ছিল। নাম বিলাসবতী। রাজার পারিষদ ধূর্ত ধনদাস বিলাসবতীর শক্তি খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের কন্যা অনিন্দ্যাঙ্গী কৃষ্ণকুমারীর চিত্রপট আনিয়া তুলিয়া ধরিল জগৎসিংহের সম্মুখে। উহা দেখিয়া জগৎসিংহের রূপপিপাসা বলবতী হইল এবং তিনি কৃষ্ণকুমারীর পাণিপ্রার্থনা করিয়া ভীমসিংহের নিকট দূত পাঠাইলেন। কিন্তু বিলাসবতীর সখী মদনিকা সখীর মঙ্গলের জন্যই এই বিবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। সে কৌশলে মরুরাজ মানসিংহকে কৃষ্ণকুমারীর পাণিপ্রার্থিরূপে দাঁড় করাইল এবং কৃষ্ণকুমারীকেও মানসিংহের অনুরক্ত করিয়া তুলিল। ভীমসিংহ পড়িলেন উভয়সংকটে। কাহার হস্তে কন্যাকে তুলিয়া দিবেন তিনি? এদিকে জয়পুররাজ এবং মরুরাজ দুইজনেই জানাইলেন, কৃষ্ণকুমারীকে না পাইলে উদয়পুর ধ্বংস করিবেন। একদিকে সম্মান ও অন্যদিকে দেশ—দুইটিই এককালে বিপন্ন। ভীমসিংহ কী করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার মন্ত্রী জানাইলেন, এরূপ অবস্থায় কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু ভিন্ন সংকটত্রাণের আর পথ নাই। গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত ভীমসিংহ মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া উন্মাদগ্রস্ত হইলেন। রাজভ্রাতা বলেন্দ্রসিংহের উপর কৃষ্ণার হত্যার ভার পড়িল। কিন্তু তাহার পূর্বেই কৃষ্ণকুমারী আত্মহত্যা করিয়া সকল দ্বন্দ্বের অবসান করিলেন। দেশরক্ষার্থে কৃষ্ণার আত্মবলির সঙ্গে গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিডিস রচিত 'The Iphigenia in Tauris' নাটকের ঘটনার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ নাটকে রাজা Agamemnon দেবী আর্টেমিসের ক্রোধ-শান্তির জন্য নিজ কন্যা Iphigenia-কে বলি দিয়াছিলেন। এই কাহিনী যে কোনো-না-কোনোরূপে মধুসূদনকে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহার একটি প্রমাণ এই,

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে নিঃসন্দেহে গ্রীক-অদৃষ্টবাদের ছায়া পড়িয়াছে। কি কাহিনী-বিন্যাসে, কি চরিত্রসৃষ্টিতে 'কৃষ্ণকুমারী' মধুসূদনের অন্যান্য নাটক অপেক্ষা উন্নততর রচনা। পাশ্চাত্ত্য নাটকে চরিত্র-দ্বন্দ্বের ফলে যেভাবে ঘটনাপ্রবাহ বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে এবং উহা একটা অখণ্ড রূপে পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়া যায়, 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে সেই আদর্শের সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়াছে। অবশ্য সূক্ষ্ম বিচারে 'কৃষ্ণকুমারী'তে হয় তো গভীরতম অন্তর্বেদনাময় পাশ্চাত্ত্য ট্র্যাজিডির মহিমা আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু ইহাও সত্য যে, এই নাটকই ভবিষ্যৎ বাংলা ট্র্যাজিডির পথনির্দেশ করিয়াছে। ইহা শক্তিশালিনী নাট্যপ্রতিভারই পরিচায়ক।

মধুসূদনের প্রতিভা ছিল মুখ্যত কবি-প্রতিভা। এইজন্য নাটক-রচনায় রোমান্স ও ট্র্যাজিডির প্রতি তাঁহার প্রবণতা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ঐরূপ প্রতিভাও সমকালীন সমাজের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারে নাই। ইহার ফলস্বরূপ মধুসূদন অবশ্য কোনো সামাজিক নাটক রচনা করেন নাই, তবে সামাজিক চিত্রস্বরূপ দুইখানি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন—'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)। ইহার পূর্বে রামনারায়ণ অবশ্য ব্যঙ্গপ্রধান সামাজিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহাতে প্রচারের উদ্দেশ্যই প্রধান হইয়া দেখা দিয়াছিল। কিন্তু মধুসূদন যাহা রচনা করিলেন তাহা সত্যকার প্রহসন। চারিত্রিক অসংগতির মাধ্যমেই প্রহসনের নাট্যকাহিনী গড়িয়া উঠে। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় সমকালীন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানী যথেচ্ছচারী যুবসম্প্রদায়ের বিকৃতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা গভীর বাস্তব-রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। যে 'ইয়ং বেঙ্গল'কে এই প্রহসনে বিদ্রূপ করা হইয়াছে, মধুসূদন নিজেই ছিলেন উহার অন্যতম। সুতরাং বাস্তব অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে তাঁহার সহায়ক হইয়াছে। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটিতে প্রাচীনপন্থী হিন্দু সমাজের অধর্মচারী ধর্মধ্বজীদের ভণ্ডামি ও চরিত্রহীনতা নির্মম নগ্ন বাস্তবতায় চিত্রিত হইয়াছে। ভণ্ড বৈষ্ণব জমিদার ভক্তপ্রসাদ একদিকে কৃষ্ণবুলি আওড়ান, অপরদিকে খাজনার কড়াক্রান্তি হিসাব করেন এবং লাম্পট্যবৃত্তি চরিতার্থতার পথ খোঁজেন। এ বিষয়ে তিনি জাতি মানেন না, আচার মানেন না, 'মুখে প্যাঁজির গন্ধ' থাকিলেও মুসলমান প্রজা হানিফের স্ত্রী ফতেমার প্রতি আসক্ত হইতে তাঁহার বাধে না। ইহারই পরিণতিস্বরূপ তাঁহাকে হানিফ ও বাচস্পতির হাতে বিলক্ষণ লাঞ্ছিত

প্রহসন

হইতে হয়। রচনার দিক হইতে 'একেই কি বলে সভ্যতা'র চেয়ে এই প্রহসনটি অধিকতর পরিণত। ইহার প্রতিটি চরিত্র আশ্চর্য-সুন্দর বাস্তবতায় জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে চাষীদের মুখে যেভাবে আঞ্চলিক ভাষা দেওয়া হইয়াছে তাহা কাহিনীর পরিবেশকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিতে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। এইভাবে সমকালীন সমাজ মধুসূদনের প্রতিভাস্পর্শে এক নবজীবন লাভ করিয়াছে। আমাদের মনে হয়, পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা অপেক্ষা প্রহসন রচনায় মধুসূদন অনেক বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কাহিনী-বিন্যাস, চরিত্র-চিত্রণ, চরিত্রোপযোগী সংলাপ—সব কিছু মিলাইয়া প্রহসন দুইটিতে অখণ্ড নাট্যরস জমিয়া উঠিয়াছে। মধুসূদনের পূর্বে এইরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর প্রহসন তো রচিত হয়ই নাই, পরবর্তীকালেও প্রহসন-রচনায় কোনো বাঙালী নাট্যকারই মধুসূদনের আদর্শকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

১৮৭৪ সালে রূপকথার আধার মধুসূদন 'মায়াকানন' নামে একটি বিয়োগান্ত কাল্পনিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু উহাতে অবসিত মধু-প্রতিভার ম্লান ছায়া ব্যতীত আর কিছুই নাই। 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামে অপর একটি নাটকও তিনি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই তাঁহার জীবনাবসান ঘটে। মধুসূদনের নাট্যকৃতির ইতিহাসে দুইটিরই স্থান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

৭। বাংলা নাটকের উন্নতি ও পরিপুষ্টি সাধনে মধুসূদনের দান কতখানি তাহা আলোচনা কর।

উত্তর। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে মধুসূদনের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তেমনি বিস্ময়কর। অনন্যসাধারণ প্রতিভার সঙ্গে সুগভীর আত্মপ্রত্যয় লইয়া তিনি বাংলা কাব্যে ও নাটকে এক বিপ্লবের সূচনা করিয়াছিলেন। মহাকবি-রূপে সমধিক খ্যাতিমান্ হইলেও তিনি আগে নাট্যকার, পরে কবি।

গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মধুসূদন

নাট্যক্ষেত্রেও তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। তাঁহার প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) রচনার পরে একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "প্রাচীন সংস্কৃত আদর্শের অনুসরণ করিয়া আমাদের চিন্তার চরণে যে শৃঙ্খল পড়িয়াছে, তাহা মোচন করাই আমার উদ্দেশ্য।" বস্তুত তিনি পুরাতনের বিরোধী এবং নবীনের উদ্গাতা ছিলেন। সর্ববিষয়ে গতানুগতিকতার বন্ধন চূর্ণ করাই ছিল তাঁহার সাহিত্যিক প্রবণতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কাব্যে তিনি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়া বাংলা

কাব্যকে স্বচ্ছন্দবিহারী করিয়াছিলেন। নাটকেও তেমনি পাশ্চাত্ত্য নাট্যকলার আদর্শকে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে প্রবাহিত করিবার বাসনায় প্রাচীন নাট্যশৈলীর বিরুদ্ধে সজ্ঞান বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি কতখানি সফল হইয়াছিলেন সে প্রশ্ন পৃথক, কিন্তু বাঁধা পথে যে তিনি চলিতে চাহেন নাই, ইহা সত্য।

মধুসূদনের পূর্বে যোগেন্দ্রচন্দ্র, তারাচরণ ও রামনারায়ণ বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য নাট্যকলার অনুসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা প্রধানত বাহ্য গঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কাহিনী-বিন্যাসের মধ্যেও পরিপাট্য ছিল না। রচনারীতি ছিল অস্বাভাবিকরূপে গুরুভার। রামনারায়ণ সামাজিক নাটকের নামে কেবল দৃশ্যপরম্পরাই রচনা করেন নাই, নিম্নশ্রেণীর কৌতুকরসের মধ্যে নাটকের উন্নত মানকেও নিমজ্জিত করিয়াছেন।

প্রথম ঐতিহাসিক ট্র্যাজিডি-স্রষ্টা মধুসূদন

'একদিকে গুরুভার রচনারীতি, অপরদিকে গ্রাম্য কৌতুক-রস অথবা ভাঁড়ামি—এই দোটানার আবর্তে পড়িয়া বাংলা নাটকের যখন আর উদ্ধারের কোনো আশা ছিল না, তখন মধুসূদন লঘুতর রচনারীতি, প্লটরচনায় দক্ষতা এবং বিশুদ্ধ কৌতুকরসের প্রয়োগ দ্বারা বাংলা নাটকে নূতন জীবন দান করিয়াছিলেন।' অবশ্য তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে সংস্কৃত প্রভাবকে তিনি কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই এবং অলংকারবহুল ভাবকেও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, কিন্তু পরবর্তী নাটক 'পদ্মাবতী'তে (১৮৬০) কাহিনীবিন্যাসে ও সংলাপে এই ত্রুটি বহুল পরিমাণে অতিক্রম করিয়াছিলেন। যাঁহারা নূতনকে আবাহন করিয়া আনিতে চাহেন, তাঁহা-দিগকে কতকগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর পার হইতেই হয়। সুতরাং মধু-সূদনের এই সকল ত্রুটি মার্জনীয়। কিন্তু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তিনি তাঁহার তৃতীয় এবং শ্রেষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'তে (১৮৬১) পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাকে অনেকখানি আত্মসাৎ করিয়া প্রথম সার্থক বাংলা ট্র্যাজিডির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উহা প্রথম বাংলা ঐতিহাসিক নাটকও বটে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই পাদে বাংলা নাট্যসাহিত্যে যে ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্লাবন দেখা দিয়াছিল এবং গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদ-প্রসাদ ঐ পথেই নাটক রচনা করিয়া খ্যাতিমান্ হইয়াছিলেন, 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক এই ভাবী নাট্যকারগণের দিগ্‌দর্শন হইয়াছিল। মধুসূদনের এই দান অমূল্য। সার্থক সামাজিক প্রহসনেরও প্রথম স্রষ্টা মধুসূদন। রাম-নারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' ছিল প্রচারগন্ধী। কিন্তু নাটক প্রচার নহে,

উহা মানবজীবনের তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি। 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (দুইটিই ১৮৬০ সালে রচিত) বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন। নাটক অপেক্ষা প্রহসন রচনায় মধুসূদন অধিকতর দক্ষতা এবং বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। কাহিনী এখানে সুসংবদ্ধ, ভাষা এবং চরিত্র অতিমাত্রায় জীবন্ত। মধুসূদনের এই দুইটি প্রহসন আজিও প্রহসন রচনার আদর্শ হইয়া আছে। পরবর্তীকালের বহু প্রহসন ইহাদের ছাঁচেই গড়িয়া উঠিয়াছে, বহু চরিত্রও এই দুইটি প্রহসনোক্ত চরিত্রের ছাঁদে রূপায়িত হইয়াছে, এবং মধুসূদনের গৌরব এই যে, উত্তরকালের অনুকৃত রচনাগুলি উক্ত প্রহসন দুইটিকে শিল্পনৈপুণ্যে অতিক্রম করিতে পারে নাই।

আদর্শ প্রহসন-স্রষ্টা মধুসূদন

৮। নাট্যরচনার যে সকল বিষয়ে দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার পূর্বসূরি এমন কি উত্তরসূরিগণ হইতেও বিলক্ষণ তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে এই অসাধারণ শক্তিমান নাট্যকারের নাট্যকৃতির সম্যক্‌ উল্লেখ কর।

উত্তর। মধুসূদনের পরে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে যিনি অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন তিনি দীনবন্ধু মিত্র (১৮০৩-১৮৭৩)। মধুসূদনের অনুসারী হইয়া তিনি গুরুগম্ভীর নাটক এবং প্রহসন দুই-ই রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে যে-দৃষ্টিভঙ্গি না থাকিলে কেহ যথার্থ নাট্যকার হইতে পারেন না, দীনবন্ধু সেই দুর্লভ দৃষ্টিভঙ্গিরই অধিকারী ছিলেন। দীনবন্ধুর পূর্বসূরিগণের মধ্যে তো সেইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি ছিলই না, উত্তরকালের নাট্যকারগণ দীনবন্ধুকে আদর্শ রূপে লাভ করিয়াও নাট্যকারের সেই অপরিহার্য দৃষ্টিকোণ হইতে নাটক রচনায় প্রবুদ্ধ হইতে পারেন নাই। ইহার কারণ, "নাটক রচনায় মানুষের জীবন ও মানুষকে যে-চক্ষে দেখিবার শক্তি আবশ্যক হয়, বাঙালীর সে-দৃষ্টি স্থির নহে, অতিশয় চঞ্চল। যে ঘটনা-স্রোতে আপামর মানবসমাজের বিভিন্ন চরিত্র বিভিন্ন গতিমুখে নিরন্তর ভাসিয়া চলিয়াছে—সেই স্রোতের একটা অংশকে সমগ্রতায় উপলব্ধি করিয়া, অবিন্যস্ত ঘটনারাশির মধ্যে একটা অর্থের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ঘটনার দৈবরূপ ও মানবচরিত্রের অন্তর্নিহিত নিয়তিরূপকে কার্যকারণসূত্রে বিধৃত করিয়া যে-নাটক রচনা সম্ভব হয়, বাঙালীর চরিত্রে ও মনে তাহার প্রতিকূল প্রবৃত্তিই নিহিত রহিয়াছে [মোহিতলাল]।"

সুদুর্লভ নাটকীয় objective বা তন্ময় দৃষ্টির অধিকারী দীনবন্ধু

এই কারণে বাঙালী কাব্য ও কথাসাহিত্যে যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে,

নাটকে তাহা পারে নাই, মানসরাগ-বিযুক্ত অপূর্ব জগৎ-বস্তু নির্মাণ ক্ষমতা তাহার হয় নাই। দীনবন্ধুর বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি তন্ময় দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। নাট্যরচনার বিভিন্ন কলা-কৌশলের দিক হইতে তিনি হয় তো তেমন কৃতিত্বের নিদর্শন রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু শ্রেষ্ঠ নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারিরূপেই তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তাঁহার রচনায় সকল মানুষের প্রতিই যে উদার সহানুভূতির ভাব দেখা যায়, উহা এইরূপ তন্ময় দৃষ্টিভঙ্গিরই উপজাত। তাঁহার সৃষ্ট সাধারণ মানুষগুলির অমার্জিত সংলাপে, বলিষ্ঠ উপস্থাপনে, কৌতুক রসের অন্তরালেও অশ্রুর আভাসে যে-রস সৃষ্ট হইয়াছে তাহাও শ্রেষ্ঠ নাটকীয় রসেরই প্রকাশ।

দীনবন্ধুর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০)। নাটকটি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে উহার শ্রেণীবিচার করিয়া লওয়া আবশ্যক। নিঃসন্দেহে ইহা একটি সামাজিক নাটক। কিন্তু 'সামাজিক নাটক' সম্বন্ধে আমাদের একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে। আমাদের পরিচিত সমাজের কোনো পরিবারের কাহিনীমূলক নাটককেই আমরা 'সামাজিক নাটক' আখ্যা দিয়া থাকি। ব্যাপক অর্থে সকল নাটকই তো তাহা হইলে 'সামাজিক নাটক'। কারণ, ঐতিহাসিক নাটকের পাত্রপাত্রীরাও কোনো-না-কোনো সময়ের সমাজাশ্রয়ী এবং পৌরাণিক নাটকের দেবদেবীর চরিত্রে মানবীয় ভাব আরোপিত হয় বলিয়া উহারা প্রায় মানবসমাজেরই প্রতিনিধি হইয়া উঠে। কিন্তু সত্যকার অর্থে 'সামাজিক নাটক' উহাকেই বলা চলে যে-নাটকে সমাজ-শক্তির সংঘর্ষণেই নাটকীয় কাহিনী আবর্তিত হয় এবং নাটকীয় চরিত্রগুলির উত্থান-পতন ঘটে। যে নাটকের কাহিনী কেবল পরিবারকে কেন্দ্র করিয়াই প্রধানত আবর্তিত হয়, এবং যেখানে বাহিরের সমাজশক্তির কোনো সংঘর্ষই থাকে না, সেইরূপ নাটককে 'পারিবারিক নাটক' বা 'গার্হস্থ্য নাটক' বলাই সমীচীন। দীনবন্ধুরই 'লীলাবতী' এইরূপ পারিবারিক নাটক, এবং পরবর্তীকালীন গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল', 'গৃহলক্ষ্মী' এবং অন্যান্য নাট্যকারের অনুরূপ নাটকও এই শ্রেণীরই অন্তর্গত। কিন্তু 'নীলদর্পণ' সামাজিক নাটক। ইহার কাহিনী সমাজশক্তির তাড়নায় পরিণতির দিকে ছুটিয়া গিয়াছে। সমাজশক্তি বলিতে কতকগুলি নৈতিক অনুশাসনের প্রভাবই বুঝায় না, অর্থনৈতিক প্রভাবও উহার পাশ্চাতে ক্রিয়াশীল থাকে। বস্তুত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই সমাজব্যবস্থাকে

সামাজিক নাটকের সংজ্ঞার্থ

পরিচালিত করে। তৎকালে—আঞ্চলিকভাবে হইলেও—নীলকর সাহেবদের শোষণে বঙ্গীয় কৃষকবৃন্দ এক নিরুপায় দুর্দশার কবলে পড়িয়াছিল। উহা তাহাদের পারিবারিক জীবনকেও প্রভাবিত করিয়াছে। 'নীলদর্পণ'-এ গোলোক বসু ও সাধুচরণের পারিবারিক বিপর্যয়ের ভিতর দিয়া সেই নীল-ঝড়ের তাণ্ডবের চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে। 'নীলদর্পণ' তাই সামাজিক নাটক। অধিকন্তু, ঐ দুইটি পরিবার তৎকালীন বহু বিপর্যস্ত বাঙ্গালী পরিবারের প্রতীক। এই কারণে 'নীলদর্পণ' পরিবারকেন্দ্রিক নাটক হইয়াও সমাজশক্তি প্রভাবিত সামাজিক নাটক। আশ্চর্য হইতে হয় এই ভাবিয়া যে, দীনবন্ধুর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি তদানীন্তন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ধ্যানধারণার অপরিণত কালেও বিদেশী রাজশক্তির সহায়তায় পরিপুষ্ট ও প্ররোচিত বিদেশী বণিকের বর্বর শোষণব্যবস্থার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, উহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদেও সোচ্চার হইয়া উঠিয়াছিল। দীনবন্ধুর এই অসমসাহসিকতাই যে পরবর্তীকালে নাট্যকারগণকে দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত নাটক রচনায় প্রেরণা যোগাইয়াছিল তাহাতে ভুল নাই।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৭৭৯ সালে নীলকর সাহেবদের হাতে নীল চাষের ভার ছাড়িয়া দেয়। 'অল্পকালের মধ্যে নীলকর সাহেবরা দেশীয় রায়তের উপর অত্যাচারজুলুম আরম্ভ করে। তাহারা অনেক সময় জমি-দারদের নিকট হইতে জমিদারি ইজারা বা পত্তনি লইত এবং চাষীদের টাকা দাদন দিয়া নীল আদায় করিত। এই দাদন একবার লইলে চাষী আর সারা জীবনের মতো ঋণ হইতে মুক্তি পাইত না। লোকে নীলের চাষে লোকসান দেখিয়া উহা চাষ করিতে অস্বীকৃত হইলে তাহাদের উপর নিদারুণ অত্যাচার চলিত।' সাহেবরা চাষীদের বাড়িঘর জ্বালাইয়া দিত, জোর করিয়া তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিত, নির্মম বেত্রাঘাত করিত, এমন কি, সাহেবদের হাতে মেয়েদের সম্মানও বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৫৯ ও ১৮৬০ সালে যশোহর, নদীয়া, মালদহ প্রভৃতি জেলায় হিন্দু-মুসলমান চাষীরা একযোগে নীল বোনা বন্ধ করে। ইহাতে নীলকর সাহেব-দের সঙ্গে তাহাদের প্রবল বিবাদ উপস্থিত হয়। ইহাই 'নীল বিদ্রোহ' নামে খ্যাত। এই আন্দোলনেরই প্রেক্ষা-পটে দীনবন্ধু তাঁহার 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা করেন।

নীল বিদ্রোহের পটভূমিকায় 'নীলদর্পণ' নাটকের ভূমিকা

পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম ছিল না, 'কেনচিৎ পথিকেনাভিপ্রণীতম্' লেখকের

এই ছদ্মনামেই নাটকটি ঢাকার কোনো মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। পাদরী লঙ সাহেব ইহার একটি ইংরেজী তর্জমা প্রকাশ করেন। উহাতে লেখা ছিল—"Translated into English by a native. With an introduction by the Rev. J. Long, 1861." এই 'নেটিভ' হইলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। গ্রন্থ প্রকাশের জন্য লঙ সাহেবের এক হাজার টাকা জরিমানা ও কারাদণ্ড হয়। এই গ্রন্থ বিলাতে ইংরেজদের মধ্যে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে নীল কমিশন বসে এবং কালক্রমে নীলকরদের অত্যাচার প্রশমিত হয়। এই কারণেও 'নীলদর্পণ'-এর একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মর্যাদা রহিয়াছে। মিসেস হ্যারিয়েট এলিজাবেথ বীচার স্টো-র 'Uncle Tom's Cabin' এবং চার্লস্ ডিকেন্স-এর 'Oliver Twist' যেমন যথাক্রমে আমেরিকার নিগ্রোদাসত্বপ্রথা এবং বিলাতের শিশুপীড়নের মূলে প্রবল আঘাত করিয়া উহার উচ্ছেদসাধনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল, 'নীলদর্পণ'ও তেমনি দরিদ্র রায়তদের উপর নীলকরদের অত্যাচার সকলের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাহার প্রশমনে কার্যকর হইয়াছিল। আরও একটি ঐতিহাসিক কারণে 'নীলদর্পণ' বাংলা নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। এই নাটক দ্বারাই প্রথম বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের (Public Theatre) শুভ আরম্ভ হয় (১৮৭২)।

'নীলদর্পণ'-এর সংক্ষিপ্ত কাহিনী

'নীলদর্পণ' নাটকটি গড়িয়া উঠিয়াছে প্রধানত স্বরপুরের গোলোকচন্দ্র বসুর পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া। গোলোকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র নবীনমাধব নীলকর সাহেবের অত্যাচার হইতে প্রজাদের রক্ষা করিত বলিয়া নীলকুঠির বড় সাহেব আই. আই. উড্ ইহাকে শাসন করিবার জন্য নিরীহ গোলোককে মিথ্যা ফৌজদারিতে কারারুদ্ধ করে। গোলোক কারাগারে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন। ছোট সাহেব পি. পি. রোগ্ প্রজা সাধুচরণের কন্যা ক্ষেত্রমণিকে স্বীয় কুঠিতে আনিয়া বলাৎকারের চেষ্টা করিলে, নবীনমাধব মুসলমান প্রজা তোরাপের সাহায্যে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করে। গর্ভবতী ক্ষেত্রমণির পেটে রোগ্ সাহেব ঘুষি মারায় গর্ভস্রাব হইয়া তাহার মৃত্যু হয়। নীলবপন লইয়া বিবাদ হইলে উড্ সাহেব নবীনমাধবকে অপমানসূচক কথা বলে। ক্রুদ্ধ নবীন সাহেবকে পদাঘাত করিলে, সাহেব তাহার মস্তকে লগুড়াঘাত করে—

তাহাতেই নবীনের মৃত্যু হয়। গোলোক বসুর পত্নী সাবিত্রী পতিপুত্র-শোকে উন্মাদিনী হইয়া কনিষ্ঠা পুত্রবধূর গলায় পা দিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলেন। পরে চৈতন্য হইলে স্বীয় কর্মের জন্য শোকে প্রাণত্যাগ করেন। সংক্ষেপে ইহাই 'নীলদর্পণ' নাটকের কাহিনী। কিন্তু সমালোচনার খাতিরে বলিতে হয়, কাহিনীটি সর্বাংশে নাট্যগুণসম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে নাই। সংলাপের ভাষা নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখে যেমন অতি-সুন্দর ও বাস্তব হইয়াছে, উচ্চস্তরের পাত্রপাত্রীর মুখের ভাষা তেমনি আড়ষ্ট ও কৃত্রিম হইয়াছে। স্বগতোক্তির বাহুল্য এবং দীর্ঘ বক্তৃতাও রসহানি ঘটাইয়াছে। সর্বোপরি মৃত্যুর ঘনঘটা নাটকের ট্র্যাজিডিকে ব্যর্থ করিয়া উহাকে মেলোড্রামায় পরিণত করিয়াছে। ডঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন, "নীলদর্পণ ঠিক নাটক নহে, নাট্য-চিত্র। ইহাতে কোনো চরিত্রের পরিণতি অথবা মানব-জীবনের কোনো মৌলিক সমস্যা কিংবা ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির চিত্ত-সংঘর্ষ আলিখিত হয় নাই। একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ অবস্থায় পতিত কতকগুলি অসহায় মানুষের অত্যাচার-জীবনের বাস্তব চিত্র ছাড়া ইহাতে আর কিছুই নাই। গ্রাম্য চরিত্র-গুলির মধ্যে মানব-জীবনের যে-অনাবৃত খণ্ডিত রূপটুকুর চকিত দর্শন পাই, শুধু তাহাই নীলদর্পণকে সমসাময়িক নাট্যরচনাগুলি হইতে স্বতন্ত্র করিয়া স্থায়ী মূল্য দান করিয়াছে।" কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও সত্য যে, এই নাটকের চিত্রগুলি অতি মাত্রায় জীবন্ত ও বাস্তব। ক্ষেত্রমণির উপর রোগ্ সাহেবের অত্যাচারের দৃশ্যে দীনবন্ধু যে-অভ্রান্ত নাটকীয় দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন, আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলা নাটকের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। তোরাপ, ক্ষেত্রমণি, সাধুচরণ. রাইচরণ, আদুরী. গোপী, পদী ময়রানী, রোগ্ সাহেব. উড্ সাহেব প্রভৃতির চরিত্র এমন নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে রচনা করা হইয়াছে যে, আজ পর্যন্ত এইরূপ চরিত্র-সৃষ্টিতে দীনবন্ধুকে কেহ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা স্মরণীয়। আজকাল দেশে যে-'গণ নাটক' সৃষ্টির জোয়ার আসিয়াছে, 'নীলদর্পণ' উহারই দিক্-নির্দেশ করিয়াছিল। গণ-আন্দোলনের পটভূমিকায় 'নীলদর্পণ'ই প্রথম প্রকৃত বাংলা গণ-নাটক।

'নীলদর্পণ'-এর সমালোচনা

দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটক হইল 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩), বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬), সধবার একাদশী (১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৬৭), জামাই বারিক (১৮৭২) এবং কমলে কামিনী (১৮৭৩)। 'নবীন তপস্বিনী' ও 'কমলে

কামিনী' রোম্যান্টিক নামক। এইরূপ নাটকের কাহিনী গ্রন্থনে অথবা চরিত্র চিত্রণে দীনবন্ধু কোনোরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। বস্তুত এই শ্রেণীর নাটক রচনা দীনবন্ধু-প্রতিভার আদৌ অনুকূল ছিল না। লঘু রঙ্গ বা কৌতুক রসই তাঁহার স্বাভাবিক নৈপুণ্য প্রকাশের ক্ষেত্র। তাই ব্যর্থতার মধ্যেও তিনি 'নবীন তপস্বিনী'তে রাজমন্ত্রী জলধর ও তাহার স্ত্রী জগদম্বার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার হাস্যরস আমাদের মনকে সহজেই আকর্ষণ করে। 'লীলাবতী'তেও সামাজিক পটভূমিকায় রোমান্টিক প্রণয়চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু এই নাটকেও দীনবন্ধু নাট্যকার হিসাবে ব্যর্থতাই বরণ করিয়াছেন। কাহিনীর জটিলতা যেমন অবান্তর হইয়া উঠিয়াছে, ললিত-লীলাবতীর প্রণয়ালাপও অস্বাভাবিকরূপে হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নদেরচাঁদ ও হেমচাঁদের রঙ্গরস আমাদের নিকট বিশেষ উপভোগ্য বলিয়াই মনে হয়। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিবার আছে। কোনো কোনো সমালোচক হেমচাঁদ-নদেরচাঁদের বিশেষ একটি দৃশ্যের সংলাপকে অশ্লীল মনে করিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, উহারা যদি মার্জিত ভাষায় কথা বলিত তবে উহাদের মূর্খতা ও মূঢ়তা প্রকাশ পাইত কি? নাটকীয় চরিত্র তো নাট্যকারের ইচ্ছানুযায়ী পরিমার্জিত হইবার নহে। এমন হইলে আমাদের শ্লীলতা-রুচি পরিতৃপ্ত হইতে পারে, কিন্তু নাটকীয় চরিত্র সৃষ্টি হয় না। দীনবন্ধু যথাপ্রাপ্ত জগৎকেই আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন, সেখানে মানসরাগে কাহাকেও অনুরঞ্জিত করিবার কথা উঠে না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো রুচিবান মনীষী-গ্রন্থকারও বলিয়াছেন যে, তোরাপ বা আদুরী যদি শ্লীলতার মাত্রা বজায় রাখিয়া কথা বলিত তবে আমরা ছেঁড়া-তোরাপ বা কাটা-আদুরীকেই পাইতাম।

দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটক

যাহা হউক, দীনবন্ধুর প্রতিভা যে মুখ্যত প্রহসনকারেরই প্রতিভা, তাহা আমরা তাঁহার প্রহসনগুলি হইতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। এক্ষেত্রে তিনি মধুসূদনের অনুসারী হইয়াও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। দীনবন্ধুর কৌতুকরসের বিশিষ্টতা হইল এই যে, উহাতে হাস্যরসের সঙ্গে করুণরস মিশ্রিত হইয়া আছে। "উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, 'লীলাবতী'র হেমচাঁদ-চরিত্রে অতি সূক্ষ্মভাবে এই রস সঞ্চারিত হইয়াছে। 'বিয়েপাগলা বুড়ো' আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বিবাদ করিয়া, যুবা সাজিয়া, নকল বাসর-ঘরে, নকল-শালাজদের কানমলা সহ্য করিবার চেষ্টা করিয়াও যখন সহসা 'মরে গেছি! মরে গেছি!

ও রামমণি!' বলিয়া তাহার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র পালয়িত্রী ও রক্ষয়িত্রী বর্ষীয়সী বিধবা কন্যার নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে—তখন এই হাস্যরসে আর এক রসের সঞ্চার হয়; নিজ বার্ধক্য অস্বীকার করিয়া যে-বৃদ্ধ বিগত-যৌবনের অভিনয় করিতেছে, সে যে কিছুতেই জরাকে ফাঁকি দিতে পারিতেছে না, নিমেষের মোহও টিকিতেছে না,—নিয়তির সহিত কঠিন সংগ্রামে বিমূঢ় মানবের এই অবস্থা যেমন হাস্যোদ্দীপক, তেমনি তাহার অন্তরালে গভীর সহানুভূতির কারণ রহিয়াছে। কিন্তু সে সহানুভূতিকালে অদৃষ্ট ও বিধাতার বিরুদ্ধে কোনও আক্রোশের ভাব নাই—ইহাই উৎকৃষ্ট হিউমারের নিদর্শন" [মোহিতলাল]। 'জামাই-বারিক'-এ দীনবন্ধুর হাস্যরস বেশ নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। 'ঘরোয়া ঠাট্টা-রসিকতা ও ছড়া-প্রবাদের মধ্য দিয়া বাঙালীর প্রাণরস এককালে কিভাবে স্ফূর্ত হইত, তাহার এক অতি উজ্জ্বল চিত্র এই নাটকে আছে।' কিন্তু নাট্যরসের দিক হইতে 'সধবার একাদশী'ই দীনবন্ধুর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই নাটকে নব্যশিক্ষিত যুবসমাজকে লইয়া রঙ্গব্যঙ্গ করা হইয়াছে। এই নাটকে মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ছাপ থাকিলেও উক্ত প্রহসন হইতে ইহার চরিত্র সম্পূর্ণ অন্যরূপ। 'একেই কি বলে সভ্যতা' শুধু প্রহসনই, কিন্তু 'সধবার একাদশী' প্রহসনত্ব অতিক্রম করিয়া নাটকত্বে উন্নীত। ইহার মধ্যে কাহিনীর বিকাশ এবং পরিণতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নায়ক নিমচাঁদ দত্ত বা নিমে দত্ত দীনবন্ধুর অমর সৃষ্টি। নিমচাঁদ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, কিন্তু নিজেকে সংযত রাখিবার শিক্ষা তাহার নাই, সে মদ্যের পল্বল-পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এই মদ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মদও বটে। কিন্তু নিজের অধঃপতন সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন, তাই মনের সুগভীর বেদনাকে লঘু পরিহাসের আবরণে ঢাকিয়া সে জীবনপথে চলিয়াছে। জীবনে যে সে পরাজিত এই কথা ঢাকিবার জন্য তাহার বাক্‌চাতুরীর নানা প্রয়াস। কিন্তু তাহার জীবনে 'বাহিরে যবে হাসির ঘটা, ভিতরে থাকে চোখের জল'। ইহাই নিমে দত্তের জীবনের ট্র্যাজিডি। "তাহার মধ্যে দীপ্ত মনীষা ও আত্মসম্মান-হীন আচরণ, উচ্চ চিন্তা ও মদ্যাসক্তি, বুদ্ধির অভিমান ও আত্মগ্লানি, মোসাহেবি ও স্পর্ধিত সত্যভাষণ এমন আশ্চর্য সমন্বয় লাভ করিয়াছে যে, সে নীতিজ্ঞানহীন অক্ষম বুদ্ধিজীবিসম্প্রদায়ের এক চিরন্তন প্রতিনিধিরূপে অমরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।...

দীনবন্ধুর প্রহসন

'সধবার একাদশী' ও নিমচাঁদ

নিমচাঁদ নিজ অধঃপতন সম্বন্ধে মর্মান্তিকভাবে সচেতন; তাহার সমস্ত স্ফূর্তি-মাতলামির মধ্যে একটা বিরাট সম্ভাবনার অপচয়জনিত অনুশোচনার সুর ধ্বনিত হইয়াছে। বিদেশী সাহিত্যের অমৃতরসের সঙ্গে সে বিজাতীয় জীবনাদর্শের গরল এক চুমুকেই পান করিয়াছে—তাহার সমস্ত প্রকৃতিই এই অমৃত-বিষের যুগ্ম উপাদানে গঠিত।....নিমচাঁদ-চরিত্র সমাজনীতি-বিপর্যয়ের এক চিরস্থায়ী ফলরূপে, সমস্ত লঘু-তরল, ইতর ভোগবিলাসের পঙ্কিল আবর্ত হইতে উত্থিত, এক কলঙ্ক-ভাস্বর বিকৃতির প্রতীকরূপে অবিলুপ্ত মহিমায় বিরাজিত [শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]।" এই প্রহসনের 'বাঙাল' রামমাণিক্য এবং ঘটিরাম ডেপুটিও দুইটি অবিস্মরণীয় বাস্তব চরিত্র-চিত্রণ। অপরাজেয় 'কথাশিল্পী' শরৎচন্দ্র 'সধবার একাদশী' সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে এ একখানি জাতীয় সম্পত্তি।"

৯। বাংলা নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের দান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

উত্তর। রামনারায়ণ পর্যন্ত বাংলা নাট্যরচনার কালকে আমরা 'প্রস্তুতি-পর্ব' আখ্যা দিতে পারি। নাটক সৃষ্টিতে নাট্যকারগণ কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, সেই কালে বস্তুত উহারই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছিল। পৌরাণিক নাটক, ইংরাজীর অনুকরণে ট্র্যাজিডি, সমাজ-সমস্যা অবলম্বনে ব্যঙ্গ নাটক —তৎকালীন নাট্যকারগণ এই সকল বিষয়েই দৃষ্টি দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা বিষয় নির্বাচনে অতিরিক্ত কিছু দান করিতে পারেন নাই। মধুসূদনেই আমরা প্রথম নাটক রচনার যথার্থ প্রয়াস দেখিতে পাই। গতানুগতিকতার শৃঙ্খল ভাঙিয়া তিনি বাংলা নাটকে কিছুটা নাটকত্ব আনিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; এবং এ বিষয়ে—বিশেষত প্রহসন রচনায়—তিনি সাফল্য লাভও করিয়াছিলেন। মধুসূদনের কালকে আমরা তাই 'প্রয়াস-পর্ব' বলিতে পারি। দীনবন্ধু এই পর্বেরই অন্যতম নাট্যকার। মধুসূদন সামাজিক বিষয়কে অবলম্বন করিয়া যে-প্রহসন রচনার পথ দেখাইয়াছিলেন, দীনবন্ধুতে আমরা উহারই পরিপূর্ণতা দেখিতে পাই। প্রহসন সত্ত্বেও তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি নাট্যধর্মী হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু দীনবন্ধু সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা তাঁহার নাটকীয় দৃষ্টিভঙ্গি। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি আগেকার কোনো নাট্যকারের তো ছিলই না, পরবর্তীকালেও এমন অভ্রান্ত নাটকীয় দৃষ্টির দৃষ্টান্ত বিরল। সেই দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ছিল মানুষের

প্রতি উদারতা ও সহানুভূতি। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গি প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারেরই লক্ষণ। "নিকৃষ্ট চরিত্র সৃষ্টি করিতেও তিনি কাহাকেও কোনো স্থানে শ্লেষ করেন নাই, অকারণ বিদ্রূপ করেন নাই বা অন্যায় আঘাত করেন নাই। নাট্যকারের প্রধান ধর্মই হইল এই যে, তিনি সর্ববিষয়ে নির্বিকার ও নিরাসক্ত হইবেন। কোন দুর্বৃত্তের চরিত্র আঁকিতেও তিনি যেমন তাহাকে অভিশাপ দিবেন না, তেমনি সাধু চরিত্র সৃষ্টি করিয়াও তাহাকে আশীর্বাদ করিতে যাইবেন না। এই নির্বিকার দৃষ্টি লইয়া তিনি জীবন ও জগৎকে প্রত্যক্ষ করিবেন। দীনবন্ধুর এই দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল। আরো একটি বিষয় স্মরণীয়। মানুষকে বিচার করিতে যাইয়া (দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা তাঁহার নীলদর্পণের অত্যাচারী ও চরিত্রহীন রোগ্ সাহেবের কথা ধরিতে পারি) যদি তিনি প্রচলিত নীতি-ধর্মের সাহায্য লইতে যাইতেন তাহা হইলে নাট্যকার হিসাবে তাঁহার ব্যর্থতাই প্রমাণিত হইত। আর্টের নীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন—তাই আর্টের ক্ষেত্রে তিনি 'higher morality'-কেই অনুসরণ করিয়াছিলেন।

দীনবন্ধুর নূতন দৃষ্টিভঙ্গি : মানুষের প্রতি উদারতা ও সহানুভূতি

এই higher morality-র প্রেরণাতেই নাটক রচনার আর-একটা লক্ষণ তাঁহার মধ্যে বিকশিত হইয়াছে। উহা দীনবন্ধুর objective কল্পনা। Subjective বা আত্মগত রস কল্পনা হইতে উহা বিলক্ষণ। এবং বিলক্ষণ বলিয়াই কাব্য-উপন্যাস হইতে নাটক আলাদা প্রকৃতির। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে একমাত্র দীনবন্ধু ভিন্ন আর কোনো নাট্যকারের মধ্যে এইরূপ objective দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অন্যান্য সকল নাট্যকারই চরিত্রসৃষ্টি করিতে গিয়া ব্যক্তিগত রুচি-সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন। এই হেতু এক অর্থে, দীনবন্ধুকেই আমরা খাঁটি বাঙালী নাট্যকার বলিতে পারি। অবশ্য একথা সত্য যে, সাধারণ শ্রেণীর মানুষের বাহিরে যে-সকল চরিত্র তিনি সৃষ্টি করিতে গিয়াছেন, উপযুক্ত সংলাপের অভাবে তাহারা আমাদের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। তথাপি চরিত্র হিসাবে ঐ চরিত্রগুলি যে জীবন্ত, একথাও স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। কিন্তু নিমচাঁদ, তোরাপ, ক্ষেত্রমণি, রোগ্ সাহেব, আদুরী প্রভৃতি শ্রেণীর মানবচরিত্র-চিত্রণে আজিও তাঁহার সমকক্ষতা কেহ লাভ করিতে পারেন নাই। মানুষকে

দীনবন্ধুর objective কল্পনা

দেখিবার এবং দেখাইবার এই-যে নূতন ভঙ্গি, ইহাই বাংলা নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ দান। পরবর্তীকালের বহু নাট্যকারের নাটক রচনায় এই দানের প্রভাব অনস্বীকার্য।

এক বিষয়ে দীনবন্ধু বাংলা নাটকের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রকে প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি কেবল সামাজিক বিষয়ের মধ্যেই নিজেকে নিবদ্ধ রাখেন নাই, সমকালীন অর্থ নৈতিক শোষণের এবং তাহার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ-বিক্ষোভের কথাও জীবন্তরূপে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'নীলদর্পণ'-এর কথা বলিতেছি। এতখানি সমাজ-সচেতনতা তৎকালীন আর কোনো নাট্যকারের মধ্যে দেখা যায় নাই। ঐ নাটক লইয়া একটা আন্দোলন হইয়াছিল বলিয়াই নহে, সাধারণ মানুষের আন্দোলনের নাটক বলিয়াই 'নীলদর্পণ' এক মহৎ সৃষ্টি। অবশ্য শিল্প-বিচারে নাটকটি ত্রুটিমুক্ত নহে, কিন্তু সমকালীনশিক্ষিত জনমানসের বিচারে দীনবন্ধুর মধ্যে যে-তীক্ষ্ণ সমাজসচেতনতার পরিচয় পাই,—ক্ষমতায় আসীন শোষক শ্রেণী নহে—নিরুপায় শোষিতের প্রতি তাঁহার যে অকুণ্ঠ নির্ভীক সমর্থন : দেখিতে পাই, বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে ইহাও এক বিশিষ্ট দান। পরবর্তীকালে ইহারই ধারা বাহিয়া জাতীয়তাবাদী নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে এবং আধুনিককালে নবনাট্য আন্দোলনের ধারায় যে সকল গণ-নাটক সৃষ্ট হইয়াছে উহারা নীলদর্পণের ফলশ্রুতি।

তীক্ষ্ণ সমাজসচেতনতা -ও শোষিতের প্রতি নির্ভীক সমর্থনে প্রথম বাংলা গণ-নাটক রচনা

(মোট কথা, প্রতিভার অক্ষমতার হেতু রামনারায়ণের মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা এবং অতিমাত্রিক কবিত্বের জন্য মধুসূদনের নাটকে যে-কৃত্রিমতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, দীনবন্ধুতে আসিয়া বাংলা নাটক সেই সকল ত্রুটি হইতে অনেকখানি মুক্ত হয়, নাটকের ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়; সর্বোপরি বস্তুনিষ্ঠ চরিত্রচিত্রণ ও তীক্ষ্ণ সমাজসচেতনতার আবির্ভাব ঘটে। ইহাই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের একটা নূতন সমৃদ্ধির যুগকে আহ্বান করিয়া আনে।)

১০। নিম্নলিখিত নাট্যকারদের সম্পর্কে টীকা লিখ :

(ক) মনোমোহন বসু; (খ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর; (গ) উপেন্দ্রনাথ দাস; (ঘ) রাজকৃষ্ণ রায়; (ঙ) অমৃতলাল বসু।

উত্তর। (ক) মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২): মধুসূদন ও

দীনবন্ধুর পরে বাংলা নাটকে এক আকস্মিক পরিবর্তন দেখা দিল। মধুসূদন পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে যে মানবিকতার কলধ্বনি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহা মধ্যযুগীয় ভক্তিবাদের সংকীর্ণ জলাশয়ে পথ হারাইল। উহারাই নিদর্শন আমরা দেখিতে পাই মনোমোহন বসুর গীতাভিনয়মূলক নাটকগুলিতে। বাঙালীর রসপিপাসা যে যাত্রারই অনুকূল, যুক্তিবাদ ও বস্তুনিষ্ঠা অপেক্ষা অলৌকিকতার আবেগেই ভাসিয়া যাইতে যে উহা সমুৎসুক, ইহাই আর একবার প্রমাণিত হইল। মনোমোহন যে সকল নাটক রচনা করিয়াছিলেন উহাদের নাম—'রামাভিষেক' (১৮৬৭), 'প্রণয়-পরীক্ষা' (১৮৬৯), 'সতী' (১৮৭৩), 'হরিশ্চন্দ্র' (১৮৭৫), 'পার্থপরাজয়' (১৮৮১), 'রামলীলা' (১৮৮৯), 'আনন্দময়' (১৮৯০)।

নাটকাবলী

ইহাদের মধ্যে 'প্রণয়-পরীক্ষা' ও 'আনন্দময়' পারিবারিক নাটক; বাকিগুলি পৌরাণিক নাটক। নাটক না বলিয়া এইগুলিকে 'গীতাভিনয়' বলাই অধিকতর যুক্তিসংগত। কারণ, মনোমোহন যাত্রার ধরণেই তাঁহার তথাকথিত নাটকাবলী রচনা করিয়াছিলেন। ঐগুলিতে সংগীত ছিল যেমন প্রচুর, ভক্তিরসের বাহুল্যও ছিল তেমনি। তিনি পূর্বপ্রচলিত যাত্রা-রীতিকে ধ্বংস না করিয়া কিছুটা সংশোধিত করিয়া লইতে চাহিলেও মূলত তাঁহার রচনা যাত্রারই নাট্যীকৃত রূপ। তাঁহার নাটকগুলি বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়ে অভিনীত হইয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যায়, বাঙালী নাটক চাহে নাই, যাত্রা চাহিয়াছিল; বস্তুনিষ্ঠ চরিত্রচিত্রণ চাহে নাই, ভক্তির উচ্ছ্বাস চাহিয়াছিল; এবং মনোমোহন সেই জনরুচির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গার্হস্থ্যধর্মী নাটক দুইটিও যাত্রার আধারেই রচিত এবং একান্তভাবেই বিশেষত্বহীন।

মনোমোহনের নাটক গীতাভিনয়ের নামান্তর

(খ) **জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর** (১৮৪৮-১৯২৫): উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দশক হইতেই এদেশে শিক্ষিতবর্গের মধ্যে একটা স্বাদেশিকতার হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার সেই স্বদেশী-সাধনার এক পীঠভূমি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের বিশেষ উদ্যোগে ১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 'হিন্দুমেলা'। দেশবাসীকে স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করাই ছিল ঐ মেলার উদ্দেশ্য। মহর্ষির চতুর্থ পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই স্বাদেশিক আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

নিজেই লিখিয়াছেন: "হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত —কী উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথা ও ভারতের গৌরব-কাহিনী কীর্তন করিলে হয় তো কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।" ইহা হইতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক রচনার কথা জানিতে পারি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক রচনার প্রেরণা: দেশাত্মবোধ

অবশ্য মধুসূদনই সর্বপ্রথম বাংলায় ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজী ট্র্যাজিডির অনুসরণে বাংলায় ট্র্যাজিডি রচনা। তবে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ভীমসিংহের উক্তিতে দেশপ্রেমের কিছুটা আভাস ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে দেশপ্রেমের বাণী স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইল। অবশ্য সোজাসুজি এই বাণী উচ্চারণের পথে বাধা ছিল—বিদেশী রাজশক্তির বাধা। তাই তাঁহাকে মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর সংগ্রামকেই উহার প্রতীক-রূপে গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং কাহিনীর জন্য প্রধানত রাজপুত কাহিনীই অবলম্বন করিতে হইয়াছে। মুসলমান সেখানে বিদেশী ইংরেজ এবং হিন্দু হইল সাধারণ ভারতবাসী। এইরূপ প্রতীক গ্রহণের রাজনৈতিক বিষময় ফলও পরবর্তীকালে ফলিয়াছে, কিন্তু উহা আমাদের আলোচ্য নহে। তবে নাটকের ক্ষেত্রে কালানৌচিত্য প্রভৃতি বহু দোষই ঘটিয়াছে। তথাপি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এইরূপ নাটক যে তৎকালে জাতীয়তাবাদ প্রচারের সহায়ক হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরবর্তীকালে গিরিশ-দ্বিজেন্দ্র-ক্ষীরোদ-প্রসাদ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুসরণেই জাতীয়তাবোধক নাটক রচনায় উদ্দীপ্ত হইয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে জাতীয়তাবোধোদ্দীপ্ত ঐতিহাসিক নাটকের জনক বলা চলে।

জাতীয়তাবোধোদ্দীপ্ত ঐতিহাসিক নাটকের জনক

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলির নাম—'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪), 'সরোজিনী' (১৮৭৫), 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯) এবং 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২)। আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে পুরুর সংঘাতের কাহিনী 'পুরুবিক্রম' এর ভিত্তি। আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণ 'সরোজিনী' নাটকের বিষয়। রানা প্রতাপ ও মানসিংহের দ্বন্দ্ব 'অশ্রুমতী'তে বিবৃত। আর 'স্বপ্নময়ী'র কাহিনীবস্তু বঙ্গদেশে শোভাসিংহের বিদ্রোহ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রয়াস সাধু এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু উদ্দেশ্যের নিকট অনেক সময় ইতিহাসকে তিনি বলি দিয়াছিলেন। অবশ্য

ইতিহাস নাটক নয় আমরা জানি, কিন্তু ঐতিহাসিক নাট্যকার ইতিহাসের মর্যাদাও লঙ্ঘন করেন না—ইহাও সত্য। অথচ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহু স্থলে উহাই করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি, 'পুরুবিক্রমে' রানী ঐলবিলাকে লাভের বাসনাই পুরুকে আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—দেশপ্রেমের প্রেরণা নহে। ইহাতে পুরুর মহত্ত্ব খর্বিত হইয়াছে, দেশপ্রেমের মর্যাদাও রক্ষিত হয় নাই। 'সরোজিনী' নাটকে ভৈরবাচার্য নামধেয় জনৈক ছদ্মবেশী পাঠানকে দিয়া বেদমন্ত্রাদি উচ্চারণ করানো হইয়াছে। ইহা অসম্ভব। 'স্বপ্নময়ী' নাটকে লম্পট শোভাসিংহের উপর যে দেশপ্রেম আরোপিত হইয়াছে, অসম্ভাব্য রোমান্সের স্পর্শে উহা আকাশকুসুম অপেক্ষা অলীক বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। বংশগরিমার জন্যই যে প্রতাপসিংহের সঙ্গে মানসিংহের বিবাদ, 'অশ্রুমতী'তে সেই প্রতাপসিংহের কন্যার সঙ্গে আকবর-পুত্র সেলিমের প্রণয় প্রদর্শিত হইয়াছে! তথাপি রোমান্স-আশ্রিত দেশপ্রেমমূলক ঐতিহাসিক নাটকের পথিকৃৎরূপে বাংলা নাট্যসাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি স্থান নিশ্চিতরূপেই রহিয়াছে।

নাটকাবলী ও উহার গুণাগুণ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কতকগুলি প্রহসনও রচনা করিয়াছিলেন। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ (১৮৭২), 'এমন কর্ম আর করব না' (১৮৭৭), 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪), 'হিতে বিপরীত' (১৮৯৬), 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' (১৩০৯), 'অলীক বাবু' ইত্যাদি প্রহসনগুলির মধ্যে একটি স্মিত হাস্যের ধারা প্রবাহিত। 'হঠাৎ নবাব' প্রহসনটি ফরাসী নাট্যকার মলিয়ের-এর অনুসরণে রচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহু সংস্কৃত, ফরাসী ও ইংরেজী নাটকের অনুবাদও করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার অনূদিত নাটকগুলি প্রায় বৈশিষ্ট্যবর্জিত, তবে অনুবাদ-নাটকের ক্ষেত্র প্রসারণের কৃতিত্ব তাঁহার অবশ্যই প্রাপ্য।

প্রহসন-রচয়িতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

(গ) **উপেন্দ্রনাথ দাস** (১২৫৫-১৩০২ সন): এক সময়ে উপেন্দ্রনাথের 'শরৎ-সরোজিনী' (১৮৭৪) ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' (১৮৭৫) নাটক বাংলা রঙ্গমঞ্চে তুমুল আলোড়ন আনিয়াছিল। ইহার কারণ নাটক-দুইটির নাট্যরসধর্মিতা নহে, দেশপ্রেমের মোটা দাগের প্রকাশ। বহু রোমাঞ্চকর ঘটনায় নাটক দুইটি ঠাসা ছিল, উহাদের অতি-নাটকীয়তাই জনপ্রিয়তার মূল হেতু। সাহিত্যবিচারে ইহাদের মতো অ-নাটক আর কিছু হইতে পারে না। তথাপি বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে 'সুরেন্দ্র-

নাটক-পরিচিতি

বিনোদিনী'র একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। ঐ নাটকের অভিনয়কে কেন্দ্র করিয়াই ১৮৭৬ সালে এদেশে Dramatic Performance Act পাস হয়।

(ঘ) **রাজকৃষ্ণ রায়** (১৮৪৯-১৮৯৪): বীণা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক রাজকৃষ্ণ রায় তৎকালে প্রচুর নাটক লিখিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাটকাবলীর মধ্যে সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'পতিব্রতা' (১৮৭৫), সীতার অগ্নিপরীক্ষা অবলম্বনে রচিত 'অনলে বিজলী', 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' (১৮৮৪), যযাতি নহুষের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'নরমেধ যজ্ঞ' (১৮৯১) এবং বনবীর-ধাত্রী পান্নার কাহিনী অবলম্বনে রচিত ঐতিহাসিক নাটক 'বনবীর'ই উল্লেখ্য। তাঁহার নাটকগুলিতে যাত্রার প্রভাব অতিমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। ভক্তিরসের প্রাবল্যই তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলির জনপ্রিয়তার হেতু। ফারসী কাহিনী অবলম্বনে রচিত তাঁহার দুইটি নাটিকাও আছে—'লয়লামজনু' (১৮৯১) এবং 'বেনজীর বদরেমুনির' (১৮৯৩)।

নাটকাবলী

(ঙ) **অমৃতলাল বসু** (১৮৫৩-১৯২৯): আমাদের দেশে সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় অমৃতলাল ও গিরিশচন্দ্র পরস্পর সহযোগিতা করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের মতো অমৃতলালও ছিলেন একাধারে সুদক্ষ অভিনেতা ও যশস্বী নাট্যকার। গিরিশচন্দ্র নূতনত্বের প্রবর্তন করিয়াছিলেন নাটক রচনায়, আর অমৃতলাল পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন প্রহসন বা বিদ্রূপাত্মক নকশা রচনায়। সমসাময়িক ভাঁড়ামি ও ইতরতা হইতে বিমুক্ত করিয়া তিনি প্রহসনের বিশুদ্ধতা আনয়ন করেন। বস্তুত তাঁহার প্রতিভাই ছিল প্রহসন রচনার প্রতিভা। প্রহসন এবং রঙ্গনাট্য রচনায় তিনি যে-পরিমাণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, গুরুগম্ভীর নাটক রচনায় সেই পরিমাণ ব্যর্থতা বরণ করিয়াছেন। অমৃতলালের প্রথম নাটক 'হীরকচূর্ণ' বা 'গাইকোয়াড়' (১৮৭৫)। রেসিডেণ্ট কর্নেল ফেয়ারকে বিষপ্রয়োগে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে বরোদার গায়াকায়াড় মলহররাওয়ের বিচার ও নির্বাসন—এই সমসাময়িক ঘটনা লইয়া নাটকটি রচিত। 'তরুবালা' (১৮৯১) স্বাধীন প্রেমের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত পারিবারিক নাটক। 'বিজয়-বসন্ত' বা 'বিমাতা' (১৮৯৩) প্রচলিত রূপকথা অবলম্বনে লিখিত। 'হরিশ্চন্দ্র' (১৮৯৯) এবং 'যাজ্ঞসেনী' (১৯২৮) পৌরাণিক নাটক। দুইটিই

নাটকাবলীর পরিচয়

বিশেষত্ব বর্জিত, বিশেষ করিয়া 'যাজ্ঞসেনী' নিকৃষ্ট শ্রেণীর রচনা। তবে ১৯১৪ সালে লিখিত তাঁহার রোম্যান্টিক কমেডি 'নবযৌবন' প্রসন্ন হাস্যে ও রুচিতে সমুদ্ভাসিত। সমাজ ও ব্যক্তিবিশেষের দৌর্বল্য এবং সাময়িক ঘটনা লইয়া লেখা নকশা ও প্রহসনগুলিতে অমৃতলাল চমৎকার সরসতার অবতারণা করিয়াছেন। এইরূপ রচনার মধ্যে 'বিবাহ বিভ্রাট' (১৮৮৪), 'রাজা বাহাদুর' (১৮৯১), 'খাসদখল' (১৯১২) প্রভৃতি সামাজিক কমেডি, 'চোরের উপর বাটপাড়ি', 'ডিসমিস', 'তাজ্জব ব্যাপার', চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে (১৮৮৪) প্রভৃতি বিশুদ্ধ প্রহসন; 'একাকার' (১৩০১ সন), 'কালাপানি' (১২৯৯ সন), 'বাবু' (১৩০০ সন), 'অবতার' (১৩০৮ সন), 'গ্রাম্য বিভ্রাট' (১৩০৪ সন), 'দ্বন্দ্বে মাতনম্', 'তিলতর্পণ', 'কৃপণের ধন' (১৯০০) প্রভৃতি শিক্ষাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক প্রহসনই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। সমস্ত রকম প্রগতিরই বিরোধী ছিলেন তিনি। যে-শিল্পী যুগের সঙ্গে চলিতে পারেন না, গোঁড়ামি যাঁহার শৈল্পিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাঁহার সরস রচনাও অতি শীঘ্র বিস্মৃতির জাদুঘরে স্থান পায়, অমৃতলালও তাই আজ একটি বিস্মৃত নাম মাত্র।

প্রগতিবিরোধী রক্ষণশীল নাট্যকার অমৃতলাল

১১। গিরিশচন্দ্রের নাট্যরচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া তাঁহার নাট্যকৃতিত্বের সম্যক্ আলোচনা কর।

উত্তর। বাংলা নাট্যশালা ও নাটকের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র (১৮৪৪-১৯১২) একটি মোহময় নাম। এই মোহের পশ্চাতে প্রধানত রহিয়াছে এক অতুলনীয় নট এবং নাট্যপরিচালকের সুদীর্ঘ ৪৪ বৎসরের অক্লান্ত সাধনা। এই সাধনার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল ৩৯ বৎসরের অতন্দ্র লেখনী চালনা। এই ভূরি-স্রষ্টা নাট্যকার সর্বশ্রেণীর নাটক মিলাইয়া প্রায় একশতখানা নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল কারণে তিনি সংগতরূপেই 'নটগুরু' রূপে আখ্যাত হইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় 'ভক্ত ভৈরব' হিসাবেও গিরিশচন্দ্রের জীবন একটি ধর্মীয় মহিমায় মণ্ডিত হইয়াছিল। এবং আমাদের দেশ গুরুবাদের দেশ বলিয়াই নির্বিচারে তিনি 'মহাকবি' আখ্যা লাভ করিয়াছেন। তিনি নটগুরু, অতএব তিনি নাটকের গুরুও নিশ্চিতরূপেই হইবেন, এই অযৌক্তিক যুক্তিই বহু ভক্তজনকে এমন ভ্রান্ত ও হাস্যকর ধারণা পোষণ করিতে সাহায্য করিয়াছে

ভূমিকা: গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তি-পরিচয়

যে, গিরিশচন্দ্র শেক্‌স্‌পীয়রের চেয়েও বড় নাট্যকার। ইহা ভাবাবেগপ্রসূত স্তুতিবাদ হইতে পারে, কিন্তু নাট্যসমালোচনা নহে। গিরিশচন্দ্রের নাটকের আলোচনায় প্রথমে তাই আমাদিগকে পূর্বোক্ত মোহের আবরণ অপসৃত করিয়া যুক্তির আলোকে সাহিত্যবিচারের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ইহার পূর্বে আর-একটা কথা স্বীকার করিয়া লওয়া ভালো। গিরিশচন্দ্র আগে নট (১৮৬৭), পরে নাট্যকার (১৮৭৩)। প্রধানত রঙ্গালয়ের নাট্যপরিচালকরূপে রঙ্গালয়কে বাঁচাইতে গিয়াই তিনি নানা শ্রেণীর নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' গ্রন্থে লিখিয়াছেন : 'নাট্যবাণীর পূজার প্রধান উপকরণ—ইহার প্রাণ—ইহার অন্ন—নাটক। গিরিশচন্দ্র এদেশের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মানে—তিনি অন্ন দিয়া ইহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, বরাবর স্বাস্থ্যকর আহার দিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন ; ইহার মজ্জায় মজ্জায় রসসঞ্চার করিয়া ইহাকে আনন্দ-পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন ; আর এইজন্যই গিরিশচন্দ্র Father of the native stage—ইহার খুড়া জ্যাঠা আর কেহ কোনোদিন ছিল না।" কিন্তু যাহা প্রয়োজনের তাড়নায় রচিত তাহা কোনোকালেই শৈল্পিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না। গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলী উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই তাঁহার প্রায় শত নাটকের মধ্যে 'combination night'-এর সুযোগের উৎসরূপে কেবল 'প্রফুল্ল' নাটকটিই আজ কোনো রকমে টিকিয়া আছে! অথচ যে পৌরাণিক নাটক রচনায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার, একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্র ভিন্ন তাহার অস্তিত্ব আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

নাটকের বিষয়-বৈচিত্র্যে গিরিশচন্দ্র একক এবং অদ্বিতীয়। প্যাণ্টোমাইম (Pantomime) শ্রেণীর নাটক হইতে আরম্ভ করিয়া গীতিনাট্য, প্রহসন, পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, সামাজিক ও পারিবারিক নাটক—কোন্ শ্রেণীর নাটক না তিনি রচনা করিয়াছেন! মঞ্চ-কর্তৃত্ব তাঁহার হাতে থাকায় সবগুলি নাটকই পেশাদারী মঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্রের যে-আসন ভক্তজন কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়, উহার উৎসও এইখানে। তাঁহার সকল নাটকের নামোল্লেখ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। তাই আমরা প্রধান কতকগুলির উল্লেখ করিলাম।

নাটকাবলী

আগমনী, অকালবোধন, দোললীলা, মায়াতরু, মোহিনী প্রতিমা, মলিন মালা, পারস্যপ্রসূন, বেল্লিক বাজার, আবুহোসেন, আলাদীন, ম্যাক্‌বেথ-

কা-ত্যায়সা প্রভৃতি গীতিনাটক ও প্রহসন। রাবণ বধ, সীতার বনবাস, অভিমন্যু বধ, লক্ষ্মণ বর্জন, সীতাহরণ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (১৮৮৩), দক্ষযজ্ঞ (১৮৮৩), 'নল-দময়ন্তী', শ্রীবৎস-চিন্তা, জনা (১৮৯৩), পাণ্ডব-গৌরব (১৯০০), তপোবল (১৯১১) প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক। চৈতন্য-লীলা (১৮৮৪) নিমাই-সন্ন্যাস (১৮৮৫), বুদ্ধদেব-চরিত (১৮৮৫), বিল্বমঙ্গল (১৮৮৬), রূপ-সনাতন, (১৮৮৭) পূর্ণচন্দ্র (১৮৮৮), নসীরাম (১৮৮৮), করমেতিবাঈ (১৮৯৫), শংকরাচার্য (১৯১০) প্রভৃতি অবতারমূলক, ভক্তচরিতমূলক ও ভগবত্তত্ত্বমূলক নাটক। আনন্দ রহো, (১৮৮১), চণ্ড (১৮৯০), কালাপাহাড় (১৮৯৬), সৎনাম (১৯০৪), সিরাজদ্দৌলা (১৯০৫), মীরকাশিম (১৯০৬), ছত্রপতি শিবাজী (১৯০৭), রাজা অশোক (১৯১০) প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক। প্রফুল্ল (১৮৮৯), হারানিধি (১৮৮৯), বলিদান (১৯০৫), শাস্তি কি শান্তি (১৯০৮), গৃহলক্ষ্মী (১৯১২) প্রভৃতি সামাজিক নাটক ও পারিবারিক নাটক।

গীতি-নাট্যকার হিসাবেই বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাব। কিন্তু তাঁহার গীতি-নাটকগুলি নিতান্তই বৈশিষ্ট্যবর্জিত। গীত-রচনার ভাষাতেও তিনি নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই। প্রধানত সেই যুগের টপ্পার ঢঙে রচিত গানগুলির মধ্যে যদি কেহ কবিত্বের আশা করেন তবে তাঁহাকে হতাশ হইতে হইবে। শব্দযোজনাতেও নিম্নরুচিরই পরিচয় যত্রতত্র বিক্ষিপ্ত। গীতি-নাটকগুলির মধ্যে একমাত্র 'আবুহোসেন' সেই যুগে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রহসন এবং পঞ্চরংগুলি, কি সংলাপে, কি গানে, অশালীনতা ও অভব্যতারই পরিচয় বহন করিতেছে। "সে যুগের দর্শকগণ যে কী করিয়া ধৈর্য ধরিয়া নাটমঞ্চে এই সমস্ত অপথ্যগুলিকে হজম করিত, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।"—শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উক্তি যথার্থ।

গীতিনাট্য, প্রহসন ইত্যাদি

পৌরাণিক নাটকের নাট্যকাররূপেই গিরিশচন্দ্র খ্যাতিমান। মনোমোহন বসু গীতাভিনয়ের যে-ধারায় নাটক লিখিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র ঐ বিষয়ে তাহারই অনুসারী। এই প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনার পূর্বে গিরিশচন্দ্র যেকালে ঐ সকল নাটক রচনা করিয়াছিলেন সেই কালের পটভূমিকাটি স্মরণ করা আবশ্যক। বাংলার নবজাগৃতির ইতিহাসে 'ইয়ং বেঙ্গল' যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, উহারই প্রতিক্রিয়ারূপে তৎকালে দেখা দিয়াছিল 'Hindu Revival'.

উহার দুইটি ধারা ছিল। এক ধারার প্রবক্তা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষী। তাঁহারা যুক্তিবাদের আলোকেই হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ অপর ধারার প্রবক্তাগণ যুক্তি অপেক্ষা অন্ধ ভক্তি ও বিশ্বাসকেই একমাত্র পাথেয় করিয়া লইয়াছিলেন। পূর্ব হইতেই এদেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধনার ভক্তিবাদ জনমানসে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত ছিল। উহার সঙ্গে সমকালে যুক্ত হইয়াছিল রামকৃষ্ণদেবের বিশ্বাসবাদ। এই যুক্তবেণীর সমন্বয়ে বাঙালীর মনে ধর্মচেতনার যে জোয়ার আসিয়াছিল, গিরিশচন্দ্র উহারই উত্তুঙ্গ তরঙ্গচূড়ায় আসীন হইয়া রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীকে ও অবতার-কল্প সাধুসন্তের জীবনীকে ভক্তির আলোকে আরতি করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা করিতে গিয়া তিনি শেক্স্‌পীয়রীয় নাটকের আদর্শও গ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার যাত্রা-শৈলীকেও বর্জন করেন নাই। ফলে একদিকে যেমন রসাভাস ঘটিয়াছে, অপরদিকে তেমনি বাঙালীর রস-সংস্কারই জয়ী হইয়াছে। তুলনা করিলে বলিতে হয়, গিরিশচন্দ্র গির্জার পরিবেশে হরিসংকীর্তনের আসর বসাইয়াছিলেন এবং বিলাতী দুধের কৌটায় রক্ষিত হরির লুটের বাতাসা বিলাইয়াছিলেন। আমাদের উক্তির সপক্ষে তাঁহার 'জনা' নাটকের উল্লেখ করিতে পারি। অনেকের মতে এই নাটকটিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক। জনা-চরিত্রটি তিনি শেক্স্‌পীয়রের "The Tragedy of King Richard the Third"-এর ষষ্ঠ হেনরীর বিধবা রানী মার্গারেটের ছায়ায় অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রতিবিধিৎসু জনার উক্তির সঙ্গে মার্গারেটের উক্তির (১ম অঙ্ক ৩য় দৃশ্য) সাদৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পার্থক্য এই—জনা শুধুই বাগাড়ম্বরময়ী, ক্রিয়াশীলা নহেন। অধিকন্তু ক্ষত্রিয় রমণীর মধ্যে বাঙালী মাতৃসুলভ শঙ্কাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। নায়ক প্রবীরও একজন ক্ষত্রিয় যুবক নহে, বাঙালী মায়ের অঞ্চলপুষ্ট আদুরে দুলাল! আর যে বিদূষক চরিত্রের জন্য গিরিশচন্দ্রের এত খ্যাতি সেই বিদূষক-চরিত্র কোনো চরিত্র না হইয়া প্রচ্ছন্ন ভক্তিবাদের প্রতীকে পরিণত। সরলবিশ্বাসী এই বিদূষকের বহু উক্তির মধ্যে রামকৃষ্ণদেবের সহজ উপদেশের প্রভাব অতি স্পষ্ট। পুরাণের মধ্যে যে শিক্ষাদান ও উপদেশ-প্রবণতা আছে, গিরিশচন্দ্রের সকল পৌরাণিক নাটকেই সেই প্রচারধর্মিতার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। উহাতে যে নাট্যরস ক্ষুণ্ণ হয় তাহা বলা বাহুল্য।

পৌরাণিক নাটক রচনার পটভূমি

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের মূল্যায়ন

"বলিতে কি প্রাচীন বাঙলার কথক ঠাকুরেরা কথকতার দ্বারা যাহা করিতেন, গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলি সেই প্রয়োজনই সিদ্ধ করিয়াছে। কথকগণ শুধু কথকতার দ্বারা অশিক্ষিত জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া পৌরাণিক আখ্যান-চরিত্র ও নীতি-উপদেশের উচ্চ আদর্শ জনসমাজে প্রচার করিতেন। গিরিশচন্দ্রও পৌরাণিক নাটকের দ্বারা জনসাধারণকে ভারতীয় জীবন ও সাধনার নীতিগুলিকে সুকৌশলে প্রচার করিয়াছিলেন [শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]।"

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় আলোচ্য। ইহার নাম 'গৈরিশ ছন্দ'। গিরিশচন্দ্র তাঁহার পৌরাণিক ও অবতারমূলক নাটকগুলিতে এই ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অবশ্য উহার আবিষ্কারের গৌরব তাঁহার নহে। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাচার নক্শা'র প্রচ্ছদপত্রে নয়-পঙ্ক্তির ঐরূপ ছন্দোযুক্ত একটি কবিতা আছে। নাটকে গিরিশচন্দ্রের পুর্বে ইহার অল্প-স্বল্প ব্যবহার করিয়াছিলেন ব্রজমোহন রায় ও রাজকৃষ্ণ রায়। কিন্তু গিরিশচন্দ্রই উহার ব্যাপক ব্যবহার করেন, এইজন্য ইহা 'গৈরিশ ছন্দ' নামেই পরিচিত। গিরিশ-পরবর্তী যুগের বহু নাট্যকার পৌরাণিক নাটকে—এমন কি ঐতিহাসিক নাটকেও—এই ছন্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতে হয়, এই ছন্দ অভিনেতা-অভিনেত্রীর পক্ষে উপাদেয় ও লোভনীয় বটে, কিন্তু রসবিচারে ইহা গিরিশ-নাটকে কখনও কাব্যশ্রীর মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। 'জনা'র দুই-একটি সংলাপ ব্যতিক্রম মাত্র। মোহিতলাল যে ইহাকে "মিলহীন doggerel" বলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।

গৈরিশ ছন্দ

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' ও 'পাণ্ডব-গৌরব' 'জনা'র তুলনায় অধিকতর নাট্যগুণসম্পন্ন। 'বিল্বমঙ্গল'-এ যে নাট্যরস প্রথম দিকে ঘনীভূত হইয়াছিল, পরের দিকে উপদেশ-মুখরতায় ও প্রচারধর্মিতায় তাহা একেবারেই উড়িয়া গিয়াছে। গিরিশচন্দ্র অজস্র গান লিখিয়াছেন। একমাত্র বিল্বমঙ্গলের গানগুলিই সুরচিত এবং তাহার চেয়েও বড় কথা—সুপ্রযুক্ত। অন্যান্য নাটকের একক, দ্বৈত এবং সমবেত গীতগুলি যাত্রার প্রভাবে লিখিত এবং যাত্রার মতোই যত্রতত্র নির্বিচারে প্রযুক্ত। 'শংকরাচার্য' ও 'তপোবল' নিকৃষ্ট শ্রেণীর নাটক। মধুসূদন ও দীনবন্ধু যে-নাট্যসম্ভাবনার আভাস দিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র উহাকে উজ্জ্বলতর না করিয়া নাট্যধারাকে প্রাচীন অন্ধ সংস্কারপন্থী ভক্তিবাদের

পৌরাণিক নাটকে গান ও অলৌকিকতা

অলৌকিকতার মোহে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছেন। বাহিরে উহার যে রঙ ছিল উহা কৃত্রিমতার রঙ—একটা বিশেষ সংকীর্ণ কালের মধ্যে উহা মানুষের মনোহরণ করিয়াছিল ; কিন্তু মহাকালের ধারায় সেই রঙ পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বৎসরের মধ্যেই ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

সমকালীন যুগের দাবি মিটাইতে গিয়া গিরিশচন্দ্র কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ইতিহাসাশ্রিত নাটকও কয়েকটি আছে। উহাদের মধ্যে 'সিরাজদ্দৌলা', মীর কাসিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজী'র নামই বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে বাঙলা দেশে যে প্রবল রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা দিয়াছিল এবং স্বাদেশিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল, ঐ নাটক তিনটি উহারই পরিবেশে রচিত। তাই ঐ সকল নাটকে ইতিহাস এবং নাটক যত না আছে, তাহার চেয়েও বেশী রহিয়াছে বিদেশী শাসক-শক্তির প্রতি ঘৃণা ও জাতীয়তাবাদের উচ্ছ্বাস। এই কারণে ঐতিহাসিক নাটক রচনাতেও গিরিশচন্দ্র ব্যর্থতাই বরণ করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে কিছুটা ঐতিহাসিক কাহিনী অনুসরণের প্রয়াস আছে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের অনুরূপ নামধেয় গ্রন্থই উহার একমাত্র উৎস। ঘটনা-বিন্যাসে তিনি উহারই উপর বিশ্বস্তভাবে নির্ভর করিয়াছেন। তথাপি যাত্রার প্রভাবে 'করিম চাচা' ও 'জহরা' এই দুইটি অনৈতিহাসিক চরিত্র সৃষ্টি করিয়া নাটকটিকে তিনি মেলোড্রামায় পর্যবসিত করিয়াছেন। উহাদের ভিতর দিয়া বহু অসম্ভাব্য ব্যাপার নাটকে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। জগৎশেঠের বৈঠকখানায় ষড়যন্ত্রকারীদের গোপন আলোচনায় নবাবভক্ত করিম চাচার উপস্থিতি অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। প্রতিহিংসাপরায়ণা জহরা তো অসম্ভাব্যরূপে সিরাজের অন্দরমহল হইতে ইংরেজ শিবিরে যখন তখন প্রবেশ করিতেছে। ফাকর দানশা সিরাজের আমলে জীবিত না থাকিলেও ঐ চরিত্রটিকে তিনি নাটকে টানিয়া আনিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহাকে পূর্ববঙ্গের 'বাঙাল' সাজাইয়া চরিত্রটিকেই লঘু করিয়া ফেলিয়াছেন। মোট কথা, "অহেতুক স্বাদেশিক উচ্ছ্বাস, স্থানকালপাত্রের কালানৌচিত্য দোষ (anachronism), নাটকীয় বাস্তব ঘটনাকে মেলোড্রামাটিক ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া এবং বিশ্বাস-অবিশ্বাস, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকের সীমাকে অবহেলাভরে লঙ্ঘন করিয়া যাওয়ার অনুচিত ঝোঁক গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক

গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটক

নাটকগুলিকে আধুনিক পাঠক ও দর্শকের রুচির প্রতিকূল করিয়া তুলিয়াছে [শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]।”

গিরিশচন্দ্রের পারিবারিক ও সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে ‘প্রফুল্ল,’ ‘বলিদান’ ও ‘শাস্তি কি শান্তি’ই সমধিক খ্যাত। ‘প্রফুল্লই তাঁহার প্রথম পারিবারিক নাটক। অপরেশচন্দ্রের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি, সামাজিক নাটক লেখা সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র নাকি বলিয়াছিলেন, “realistic বিষয় নিয়ে নাটক লেখা আর নর্দমা-ঘাঁটা এক।” উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্রের প্রবণতা যে কোন্ দিকে ছিল এবং তাঁহার লেখক-মানসের স্বরূপ-যে কী, মন্তব্যটি হইতে তাহা জানিতে পারি। তবু তিনি অনিচ্ছাতেই—সম্ভবত রঙ্গমঞ্চের তাগিদেই—সামাজিক ও পারিবারিক তথা ‘realistic’ নাটক লিখিয়াছিলেন। কাহিনী গ্রন্থনে, খুন-জখম-হত্যা আত্মহত্যার বাড়াবাড়িতে তিনি দীনবন্ধুকে অনুকরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দীনবন্ধুর মতো নাটকীয় চরিত্র-চিত্রণের দক্ষতা তাঁহার ছিল না। তিনটি নাটকই কলিকাতার মধ্যবিত্ত পারিবারকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। ‘বলিদান’-এ রহিয়াছে পণ-প্রথা সমস্যা, ‘শাস্তি কি শান্তি’তে বাল-বিধবা সমস্যা। ‘প্রফুল্ল’তে ক্ষীণভাবে মদ্যপান, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রচার থাকিলেও উহা মূলত যৌথ পরিবারের ভাঙনের কাহিনী। তিনটি নাটকেই ট্র্যাজিডি রচনার প্রয়াস আছে, কিন্তু ‘করুণাময়’ ‘প্রসন্নকুমার,’ ‘যোগেশ’ কেহই আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ সংগ্রামশীল নায়ক নহেন; তাই নাটকগুলি মেলোড্রামাই হইয়াছে। ঐ তিনটি নাটক করুণ, কিন্তু ট্র্যাজিক নহে। ট্র্যাজিডিতে ভয়, বিস্ময়, করুণা আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া রাখে—কাঁদাইলেও কেবলই কাঁদায় না। কিন্তু করুণাময়, প্রসন্ন কুমার ও যোগেশ কেবলই কাঁদাইয়াছেন। ‘প্রফুল্ল’ নাকি একটি শ্রেষ্ঠ নাটক! কিন্তু যে-নাটকের নাটকের মধ্যে দ্বন্দ্ব নাই, প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামের স্পৃহা নাই, ব্যাংক ফেলের কথা শুনিয়া ব্যাংকে গচ্ছিত টাকার কিছু অংশও উদ্ধার করা যায় কিনা তাহা না ভাবিয়া যিনি অপরিমিত মদ্য পান করিতে শুরু করিলেন এবং সমগ্র নাটকে কেবল মদেই আকণ্ঠ ডুবিয়া রহিলেন তেমন নায়কের সাজানো বাগান যদি শুকাইয়া যায় তবে সামাজিকবর্গের মনে কোনো আলোড়নই দেখা দেয় না, সেই

গিরিশচন্দ্রেরপারিবারিক ও সামাজিক নাটক

সঙ্গে নাট্যরসও শুকাইয়া যায়। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য : "গিরিশের সামাজিক নাটকে প্রথম বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, ইহাতে কলিকাতার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ জীবনের কাহিনী মাত্র স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় বিশেষত্ব ব্যাংক-ফেল্, ঋণের দায়ে ডিক্রীজারি, চাকুরিহানি, গৃহবিক্রয়, চুরির অভিযোগ, কন্যার পতিবিয়োগ ইত্যাদি সমস্ত বিপৎপাত একসঙ্গে অথবা পর পর দ্রুতবেগে ঘটিয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে গৃহকর্তা স্ত্রীলোকের অধিক মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছে। তৃতীয় বিশেষত্ব বিপৎপাতের মূলীভূত চক্রান্তের স্রষ্টা হইতেছে নায়কের ভ্রাতা, বাল্যবন্ধু অথবা ভ্রাতৃস্থানীয় স্নেহাস্পদ ব্যক্তি। তাহার সঙ্গে উকিল অ্যাটর্নি দালালের যোগ থাকিবেই। ভাগ্যহত নায়ক বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়াও ঘটনাবলীর পরিণতি সহজ মানুষের মতো লক্ষ্য ও অনুমান করিয়া যাইবে। চতুর্থ বিশেষত্ব নীলদর্পণের আদর্শে নাটকের শেষে আত্মহত্যা, হত্যা এবং 'পতন ও মৃত্যু' ইত্যাদির প্রাচুর্য থাকিবে। নাটকের ভাগ্যহত পাত্রপাত্রীকে সংসার-ভূমি হইতে একেবারে নিকাশ করিয়া তবেই যবনিকা-পতন হইতেছে গিরিশচন্দ্রের নাট্যকৌশল।" বলা বাহুল্য, এই নাট্যকৌশল যাত্রা-শৈলীকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। গিরিশচন্দ্র মূলত একজন যাত্রা-নাটকের লেখকই ছিলেন, ইহার অতিরিক্ত কিছু নয়। বাংলা নাট্যশিল্প তাঁহার দ্বারা উন্নততর হয় নাই, বরং জনরুচির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া প্রতিক্রিয়াশীলতার পথেই উহাকে তিনি টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। তবে, যেকালে বাংলা নাটকের অভাব ছিল সেকালে তিনি গীতাভিনয়ের আধারে অজস্র নাটক লিখিয়া বাঙলা-রঙ্গমঞ্চকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন—নাট্যকার হিসাবে ইহাই গিরিশ-চন্দ্রের কৃতিত্ব।

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের বিশেষত্ব

প্রশ্ন ১২। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কয়েকটি নাটকের পরিচয় প্রসঙ্গে তাঁহার নাট্যরচনার মূল্যায়ন কর।

উত্তর। নাট্যকাররূপে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) ছিলেন গিরিশ-চন্দ্রের প্রবল প্রতিবাদ। যে-অলৌকিকতা ও ভক্তিবাদের মোহে বাংলা নাটকের উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বার গিরিশচন্দ্র রুদ্ধ করিয়াছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাস ও জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে উহাকেই উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার আদর্শ কখনও মঞ্চ-কর্তৃপক্ষের ব্যবসায়িক লাভালাভের নিকট

অথবা জনমনোরঞ্জনের নিকট আত্মসমর্পণ করে নাই। পূর্ববর্তী যে-কোনো নাট্যকার অপেক্ষা পাশ্চাত্ত্য নাট্যশৈলীকে তিনি অধিকতর মাত্রায় সাফল্যের সঙ্গে বাংলা নাটকে ব্যবহার করিয়াছিলেন। নাটকীয় চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের যে-অভাব ছিল, দ্বিজেন্দ্রলালই সর্বপ্রথম সেই অভাব পুরণ করেন। বস্তুত তাঁহার নাটকেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাসঞ্জাত আধুনিক মানস জয়ী হইয়াছে।

নাটকের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাব প্রহসনকাররূপে। 'কল্কি-অবতার' (১৮৯৫), 'বিরহ' (১৮৯৭), 'ত্র্যহস্পর্শ' (১৯০০), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২), 'পুনর্জন্ম' (১৯১১), 'আনন্দ বিদায়' (১৯১২) প্রভৃতি প্রহসন তাঁহার রচিত। আমাদের সমাজে যে-সকল ভণ্ডামি, কপটাচার, কুসংস্কার এবং উৎকট বিদেশীয়ানা আছে, উহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনই ছিল এই প্রহসনগুলির লক্ষ্য। হাস্যরসাত্মক রচনায় তাঁহার মার্জিত রুচি অবশ্য প্রশংসনীয়। প্রহসনগুলির প্রধান আকর্ষণ ছিল হাসির গান; এবং হাসির গান রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের সমকক্ষ আজিও কেহ বাংলা সাহিত্যে জন্ম-গ্রহণ করেন নাই। তবে তাঁহার সব প্রহসনই-যে নাট্যবিচারে উন্নত শ্রেণীর, একথা বলা চলে না। ইহাদের মধ্যে 'বিরহ' এবং 'পুনর্জন্ম'ই বহুলাংশে উপাদেয়। একমাত্র 'আনন্দ বিদায়' তাঁহার কলঙ্ক। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি যে আক্রমণ করা হইয়াছে তাহার অশালীনতা আমাদিগকে ব্যথিত করে।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসন

দ্বিজেন্দ্রলাল তিনটি পৌরাণিক নাটকও রচনা করিয়াছিলেন: 'পাষাণী' (১৯০০), 'সীতা' (১৯০৮) এবং 'ভীষ্ম' (১৯১৪—মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)। এইরূপ নাটক রচনায় তিনি পূর্বাগত ভক্তিবাদ ও অলৌকিকতার সংস্কারকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া পাশ্চাত্ত্য আদর্শে সেখানে মানবিক ধর্মকেই উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন; অবশ্য পৌরাণিক প্রসিদ্ধি ত্যাগ করায় কোনো কোনো সমালোচকের নিকট উহা নাটকীয় উৎকর্ষ আস্বাদনের পথে বাধাস্বরূপ মনে হইয়াছে। আমরা কিন্তু তাহা মনে করি না। পুরাণ-কাহিনীর মধ্যে কোনো নূতন ব্যঞ্জনা আরোপ করিলেই উহা রসবিরোধী হয় না। যদি হইত, তবে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ' নিকৃষ্ট কাব্য হইয়াই থাকিত। কারণ, উহাতে রাম-চরিত্র পুরাণ-বিরোধী এবং রাবণ-চরিত্রে নূতন ব্যঞ্জনা আরোপিত। 'পাষাণী' নাটকে অপূর্ণ বাসনার সংঘাতে অহল্যা-চরিত্রে যে-অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে, পারিপার্শ্বিকের সংঘাতে সেখানে নির্যাতিত মানবত্মার যে-জ্বালা অগ্ন্যুদ্‌গারের

দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটক

মতোই ফাটিয়া পড়িয়াছে, তাহা কি উৎকৃষ্ট নাট্যগুণসম্পন্ন নহে? তবে ভক্তিবাদী দেশে ঐরূপ নাটকের আদর হইবার কথা নহে, দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটকও তাই জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই।

নাট্যকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল যদি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া থাকেন তবে 'পরপারে' (১৯১২) নামক পারিবারিক ও 'বঙ্গনারী' (১৯১৬) নামক সামাজিক নাটক রচনায়। এই শ্রেণীর দুইটি নাটকই তিনি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ নাটক রচনায় তিনি দীনবন্ধু বা গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা নূতনতর কিছু করিতে পারেন নাই। বরং পূর্বসূরিদের নাটকে সংলাপে এবং চরিত্রচিত্রণে যেটুকু বাস্তবধর্মিতা আছে, দ্বিজেন্দ্রলালে তাহা নাই। সামাজিক নাটকে তিনি যেরূপ কবিত্বময় সংলাপ সৃষ্টি করিয়াছেন উহা অনাসৃষ্টিরই নামান্তর। 'পরপারে'র বিশ্বেশ্বরের যাত্রাসুলভ উক্তিগুলি আমাদের হাস্যোদ্রেকই করে, অথচ চরিত্রটি করুণ-রসাত্মক। বন্দুক, পিস্তল, ফাঁসি, আত্মহত্যা, খুন ইত্যাদি লোমহর্ষক ঘটনা তো আছেই।

পারিবারিক ও সামাজিক নাটক

পৌরাণিক বা পারিবারিক নাটকের তুলনায় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে অনেক বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বস্তুত কয়েকটি ঐতিসাহিক নাটকের জন্যই তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যে স্মরণীয়। 'তারাবাঈ' (১৯০৩), 'রানা প্রতাপসিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬), 'নূরজাহান' (১৯০৮), 'মেবার পতন' (১৯০৮), 'সাজাহান' (১৯০৯), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১) এবং 'সিংহল বিজয়' (১৯১৫—মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)—এই কয়টি ঐতিহাসিক নাটকই তাঁহার রচনা। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় তিনি পাশ্চাত্ত্য শৈলী অনুসরণের ব্যাপারে প্রচুর দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রবল হৃদয়াবেগ, চারিত্রিক দ্বন্দ্ব, জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস তাঁহার নাটকগুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতে হয়, কাহিনী গ্রন্থনে—বিশেষতঃ উপ-কাহিনী গ্রন্থনে তিনি বহু স্থলে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। অধিকন্তু কালানৌচিত্য ও পাত্রানৌচিত্য দোষ তাঁহার নাটকীয় রসসৃষ্টির প্রধান অন্তরায় হইয়াছে। সর্বোপরি কবিসুলভ subjective দৃষ্টি বহু নাটকীয় চরিত্রকে একেবারে মাটি করিয়া দিয়াছে। ইহাই দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক রচনার মারাত্মক ত্রুটি। আমরা যথাকালে এই সকল ত্রুটির উদাহরণ দিব।

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসি মাটক

বৈশিষ্ট্যহীন 'তারাবাঈ' নাটকটি বাদ দিলে 'রানা প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস' এবং 'মেবার পতন'-এর নাম আমরা একসঙ্গে উচ্চারণ করিতে পারি, এই কারণে যে, তিনটি নাটকের সুরই দেশাত্মবোধের উচ্চ গ্রামে বাঁধা। স্বদেশী আন্দোলনের পরিবেশেই এই নাটকগুলি রচিত। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে এই নাটকগুলি জনমনে প্রবল উদ্দীপনা ও প্রেরণা যোগাইয়াছিল। এই কারণে দ্বিজেন্দ্রলাল সেকালে কীর্তিমান নাট্যকার হইতে পারিয়াছিলেন। মুঘলের সঙ্গে দেশপ্রেমিক প্রতাপসিংহের সংঘর্ষ 'রানা প্রতাপসিংহ' নাটকের বিষয়বস্তু। এই নাটকে নাট্যকার ইতিহাসের যথাযথ অনুকরণে অনেকখানি সফল হইয়াছেন। কাহিনী-বিন্যাস ও সংঘাতের ভিতর দিয়া চমৎকার নাটকীয় রূপ গ্রহণ করিয়াছে। চরিত্রগুলিও আন্তর দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতে বিবৃতির পুতুল না হইয়া জীবন্ত মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। এ বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিংবা গিরিশচন্দ্র অপেক্ষা তিনি নিশ্চিতরূপেই অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সর্বোপরি, তিনি যাত্রা-শৈলী হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। কিন্তু বিপক্ষ সৈন্যের শিবিরে রাজকুমারীগণের বিনা বাধায় প্রবেশ এবং মেহেরউন্নিসার প্রতি অমরসিংহের আসক্তি স্বাভাবিকতার সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। 'দুর্গাদাস' নাটকে আওরঙ্গজেব ও রাজপুতবীর দুর্গাদাসের সংঘর্ষ চিত্রিত হইয়াছে। নাটকটিতে উদার আদর্শবাদ তাৎক্ষণিক মোহ সৃষ্টি করিলেও নাট্যরসকে অনেকখানি লঘু করিয়াছে। রানা প্রতাপের পুত্র অমরসিংহের জীবনের প্রধান ঘটনাবলীই 'মেবার পতন'-এর অবলম্বিত কাহিনী-বস্তু। এই নাটকে নাটকত্ব অপেক্ষা উচ্ছ্বাসই বেশী প্রকাশমান। উদার বিশ্ব-মৈত্রীর আদর্শ এবং "আবার তোরা মানুষ হ" গানটি এই নাটকের জয়প্রিয়তার মূল। নহিলে মানসী-চরিত্রকে তিনি যেভাবে মানসরাগে রঞ্জিত করিয়া তাহার উপর আধুনিক যুগের সেবাধর্মমূলক আবরণ আরোপিত করিয়াছেন তাহা কাহিনী ও ভাবের দিক হইতে অনৈতিহাসিক।

রানা প্রতাপ, দুর্গাদাস ও মেবার পতন

ইহার পর আমরা 'নূরজাহান', 'সাজাহান' ও 'চন্দ্রগুপ্ত'-এর নাম করিতে পারি। এই তিনটি নাটকই কোনোরূপ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নহে অর্থাৎ দেশপ্রেম বা বিশ্বমৈত্রী অথবা অনুরূপ ভাবাদর্শ দ্বারা ইহাদের রচনা নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। এই কয়টি নাটকেই ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া নাট্যকার বিভিন্ন মানবিক দ্বন্দ্বেরই অবতারণা করিয়াছেন। এই কয়টি নাটক নাট্যকারের

মানসরাগে ততখানি রঞ্জিত নহে, তাই এইগুলিই কিছু-কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও নাট্যরসে সঞ্জীবিত। হয় তো এই কারণেই 'সাজাহান' ও 'চন্দ্রগুপ্ত' এতকাল পরেও প্রবল বিক্রমে আমাদের মধ্যে বাঁচিয়া আছে। 'নূরজাহান' নাটকে ইতিহাস অবিকৃতভাবে অনুসৃত না হইলেও ইহার গঠন-রীতি অতি সুসম্পূর্ণ। স্থান-কাল-পাত্রের এমন ঐক্য, পার্শ্বচরিত্রগুলির সংঘাতে নায়িকা-চরিত্রের প্রস্ফুটন ও কাহিনীর অগ্রসৃতি এমন সুন্দররূপে দ্বিজেন্দ্রলালের আর-কোনো নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় না। নাটকটি নায়িকানির্ভর এবং নূরজাহানের নারী-প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার উচ্চাশার দ্বন্দ্বই নাটকটির প্রাণ। 'নূরজাহান' প্রবৃত্তির দুরন্ত ঝড়ের ধ্বংস-লীলার একটি করুণ ট্র্যাজিডি। আমাদের মতে, নাট্যবিচারে ইহাই দ্বিজেন্দ্র-লালের শ্রেষ্ঠ রচনা। 'সাজাহান' বহুপঠিত বহু অভিনীত নাটক। নাটকটি ট্র্যাজিডি। ইহার পরিণতিতে মৃত্যু নাই অথচ ইহা ট্র্যাজিডি। আধুনিক ট্র্যাজিডি নাটকে মৃত্যুকে অপরিহার্য বলিয়া মনে করে না। দ্বিজেন্দ্রলালই সর্বপ্রথম শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজিডির আদর্শকে অতিক্রম করিয়া বাংলা নাটকে আধুনিক ট্র্যাজিডির পত্তন করিলেন। ঐ নাটকের ট্র্যাজিডি উহার নায়ক সাজাহানের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যেই প্রস্ফুটিত। সাজাহান সম্রাট, অন্যায়কে তিনি ক্ষমা করিতে পারিতেছেন না, অথচ অন্যায়কারী আওরঙ্গজেবকে পুত্র-স্নেহবশতঃ শাস্তিও তিনি দিতে পারিতেছেন না, ইহাই ট্র্যাজিক। সাজাহান বাহিরেই পঙ্গু নহেন, অন্ধস্নেহে মনেও পঙ্গু। 'মহাপরাধ আওরঙ্গজেবকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করার মধ্য দিয়া সাজাহানের পিতৃজীবনের ট্র্যাজিডির বেদনা আরো করুণ হইয়া ফুটিয়া উঠে।' সাজাহানচরিত্র যে শেক্‌স্‌পীয়রের 'King Lear'-এর ছায়ায় রচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। হয় তো এই কথা স্মরণ করিয়াই মোহিতলাল সাজাহান-চরিত্রকে মুঘল বাদশাহ্ বলিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন, বলিয়াছেন—সাজাহান 'ভাবপ্রবণ বাঙালী ভদ্রলোক মাত্র।' আমাদের মনে হয়, চরিত্রটি কল্পনা করিবার বেলায় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহাকে মুঘল সম্রাটরূপেই কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সাজাহানের মুখে তিনি যে সকল দীর্ঘ উচ্ছ্বাসময় সংলাপ দিয়াছেন ("পিতা সব, আর পুত্রদের খাইও না, তাদের বুকের উপর রেখে ঘুম পাড়িও না" ইত্যাদি সংলাপ স্মর্তব্য), তাহাই ঐরূপ অভিযোগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছে। 'সাজাহান' নাটকের অন্যান্য কোনো চরিত্রই কিন্তু দ্বন্দ্বময় নহে। এমন কি, নাটকে সাজাহানের অপেক্ষা অনেক বেশী

নূরজাহান ও সাজাহান

স্থান জুড়িয়া থাকা সত্ত্বেও আওরঙ্গজেব-চরিত্রে আমরা তীব্র দ্বন্দ্বের পরিচয় দেখিতে পাই না। দারা ও নাদিরা যাত্রার ছায়ায় রচিত। যুদ্ধের গম্ভীর পরিবেশে পিয়ারার 'দিল্লীকা লাড্ডু' প্রার্থনা নিতান্তই অস্বাভাবিক বোধ হয়। সুজা-পিয়ারার এবং মহামায়া-যশোবন্তের দৃশ্যগুলি বাদ দিলেও নাটকের কোনো অঙ্গহানি হয় না। অতএব ঐরূপ অবান্তর দৃশ্য সংযোজন নাট্যকারের অক্ষমতারই পরিচায়ক।

'সাজাহান'-এর মতো 'চন্দ্রগুপ্ত'ও দ্বিজেন্দ্রলালের জনসমাদৃত নাটক। নাটকটির নায়ক-বিচার ও নামকরণ সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ থাকিলেও ইহাতে চাণক্য-চরিত্রে একটি নূতন আলোকপাত করা হইয়াছে। এ বিষয়ে নাট্যকার যে-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, নাটক-রচনায় তাঁহার সে-অধিকার আছে। চাণক্য-চরিত্রকে ইতিহাসের অনুগত করিয়াও তিনি তাঁহার মধ্যে স্নেহ ও ক্ষমতালিপ্সার যে-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা নাট্যরসসমুত্তীর্ণ। এই চরিত্রটি আজিও শ্রেষ্ঠ নটের শক্তি-পরীক্ষার মানদণ্ড। কিন্তু নাটকে ত্রুটি-যে নাই তাহা নহে। নাটকটিতে অ্যান্টিগোনাসের উপকাহিনীটি মূল কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। ঘটনার অসম্ভাব্যতাও (প্রহরীবেষ্টিত নন্দের পুরোদ্যানে চন্দ্রগুপ্তের একাকী প্রবেশ ও মাতাকে লইয়া প্রস্থান) অন্যতম ত্রুটি। কিন্তু চরিত্র-সৃষ্টির ব্যাপারেও অসংগতি দেখা যায়। যুদ্ধ ও রক্তপাত ভিন্ন যিনি আর কিছুই জানেন না সেই আলেকজাণ্ডারকে দিয়া অযৌক্তিকরূপে এখানে 'কবিত্বের কসরত' করানো হইয়াছে। ছায়ার মুখে নাট্যকার যে-ভাষা দিয়াছেন তাহা অশিক্ষিত পার্বত্য নারীর মুখে অশোভন হইয়াছে। তাহার প্রেম-ব্যাপারে সাদা-কালোর সমস্যার নামে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বর্ণবিদ্বেষের আভাস পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছে। হেলেন যখন পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতেছে তখন তাহার সংলাপের মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের যে-মিলনবাণী ধ্বনিত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে কালানৌচিত্যদোষতুষ্ট।

'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের বৈশিষ্ট্য

সর্বশেষে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের ভাষা সম্বন্ধে বলিতে হয়। তিনি বাংলা নাটকের জন্য এক আশ্চর্য গতি, ঝংকার ও কাব্যময় গদ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র কাব্যছন্দেও কবিতা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই, অথচ দ্বিজেন্দ্রলাল গদ্যে তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা একদিকে যেমন কৃতিত্ব, অন্যদিকে নাটকের পক্ষে তেমনি বিঘ্নকর। কারণ অতিমাত্রিক কাব্যধর্মী সংলাপে

যে কৃত্রিমতা থাকে, নাটকীয় চরিত্র প্রস্ফুটনের পক্ষে উহা পরিপন্থী। যেখানে হৃদয়বৃত্তির তরঙ্গবিক্ষোভ রহিয়াছে সেখানে এইরূপ কাব্যময় ভাষা সংগত হইয়াছে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের সর্বত্রই উহার প্রয়োগ করিতে গিয়া নাটককে অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনে হয়, নাটকীয় চরিত্র নহে, দ্বিজেন্দ্রলালই যেন তাহাদের হইয়া কথা বলিতেছেন! নাট্যকারের আত্মগুপ্তি-ধর্ম তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই, ইহাই নাট্যরচনায় দ্বিজেন্দ্র-লালের সর্বপ্রধান ত্রুটি।

দ্বিজেন্দ্র-নাটকে সংলাপের ভাষা

নাট্যকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল যে খুব একজন বড় নাট্যকার তাহা বলা চলে না। তাঁহার অনাটকীয় Subjective দৃষ্টিভঙ্গিই ইহার কারণ। চরিত্র-চিত্রণে, সংলাপ রচনায় তিনি নিজস্ব আদর্শকেই নাটকে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়াছেন। তাঁহার নাটকে কাহিনীগ্রন্থনের দোষ আছে, কালানৌচিত্য দোষ আছে, ঘটনার অসম্ভাব্যতার ত্রুটিও রহিয়াছে। তথাপি নাট্যকার হিসাবে তাঁহার বড় কৃতিত্ব এই যে, তিনিই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্ত্য শৈলীর সার্থক অনুসরণ করিয়া নাটকে আধুনিক বিংশ শতকীয় মানসিকতার সূত্রপাত করিয়াছেন। পুর্বস্থরিদের বিবৃতিবহুল ঐতিহাসিক নাটককে অতিক্রম করিয়া তিনি জীবনরসপূর্ণ নাটক রচনা করিতে পারিয়াছেন। নাটককে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের একটি হাতিয়ার করিয়া তুলিতে পারিয়া-ছিলেন, এই কারণেও চারণ-নাট্যকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

মূল্যায়ন

প্রশ্ন ১৩। বাংলা নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদের দান সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রচনা কর।

উত্তর। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৪-১৯২৭) দ্বিজেন্দ্রলালেরই সমকালীন নাট্যকার। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা নাটককে যেভাবে উচ্চ গ্রামে বাঁধিতে চাহিয়াছিলেন, উহার মধ্যে বহু নূতনত্বের সঞ্চার করিয়াছিলেন, ক্ষীরোদপ্রসাদে তাহারই অনুসৃতি দেখা যায়। তিনি প্রায় বিশ্বস্তভাবে প্রচলিত নাট্যধারার অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। জনরুচিরঞ্জন নাট্যকার হিসাবেই তিনি একটা সংকীর্ণ কালের সীমায় বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছিলেন। আজিকার দিনে একমাত্র 'আলমগীর' ভিন্ন তাঁহার সকল নাটকই বিস্মৃতপ্রায়।

'আলমগীর'-এর টিকিয়া থাকার গৌরব ততখানি নাট্যকারের নহে, যতখানি অনন্য অভিনেতা নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের অবিস্মরণীয় প্রতিভার।

অপেরা বা গীতিমুখর নাটক, পৌরাণিক নাটক, কাল্পনিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক—সব কয় শ্রেণীর নাটকই ক্ষীরোদপ্রসাদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সব নাটকেই রোমান্স এত বেশী প্রাধান্য লাভ করিয়াছে যে, তাঁহার সকল নাটককেই একটি শ্রেণীতে ফেলা যায়—রোমান্টিক নাটক। তথাপি আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা পূর্বোক্ত চারি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াই ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের আলোচনা করিব।

তাঁহার গীতিমুখর নাটকগুলির মধ্যে 'আলিবাবা' (১৮৯৭), 'কিন্নরী' (১৯১৮), 'বরুণা', 'প্রমোদ-রঞ্জন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যে 'আলিবাবা' তৎকালে অবিশ্বাস্যরূপে জনসমাদর লাভ করিয়াছিল। বস্তুত এইরূপ নাটকেই ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যপ্রতিভার স্বাভাবিক স্ফুরণ ঘটিয়াছে।

অপেরা বা গীতিমুখর নাটক

'আলিবাবা'র কাহিনীর স্বচ্ছন্দ গতি এবং লঘু কৌতুকরসই অপেরাটিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। কাহিনীটি রূপকথানির্ভর হওয়ায় ঘটনার সম্ভাব্যতা অসম্ভাবতার প্রশ্ন আমাদের মনে উঠে না। তথাপি গল্পের মাঝে মাঝে নাট্যকার চরিত্রগুলির মধ্যে গূঢ় ব্যঞ্জনা আনিতে পারিয়াছেন বলিয়াই 'আলিবাবা'র শিল্পচাতুর্য প্রশংসনায়। ইহার একক, দ্বৈত এবং সমবেত গানগুলির আকর্ষণও দুর্নিবার। 'কিন্নরী' এবং 'বরুণা' সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

'উলূপী', 'সাবিত্রী' (১৩০৯), ভীষ্ম (১৩২০), 'নর-নারায়ণ' (১৩৩৩) প্রভৃতি ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক নাটক। এই সকল নাটকেও রোমান্স-ধর্মিতা প্রবল। অর্জুন কর্তৃক পরিণীতা এবং পরে পরিত্যক্তা নাগকন্যা উলূপীর কাহিনী 'উলূপী' নাটকের বিষয়বস্তু। এই নাটকে কাহিনী-বিন্যাসের চমৎ-কারিত্ব আছে, আবার উলূপী-চরিত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিকাশের প্রয়াসও পরিলক্ষিত হয়। 'সাবিত্রী' নাটকটি গতানুগতিক। 'ভীষ্ম' নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদ গিরিশচন্দ্রকেই অনুসরণ করিয়াছেন। এই নাটকে কালের পরিধি অতিমাত্রায় বিস্তৃত, তাই ঘটনাগত ঐক্যেরও অভাব সুপ্রচুর। দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে কাহিনী পরস্পরসংযুক্ত না হইয়া যেন লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতেছে। ফলে একটা কেন্দ্রীয় রস কোথাও দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। কাহিনী-বিন্যাসের এই শৈথিল্য যাত্রারীতিরই লক্ষণ। যাত্রা-শৈলীর অনুকরণে নাটকে বহু

অবান্তর ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়াছে। গম্ভীর চরিত্রে তরল হাস্যরস-সৃষ্টির প্রয়াসও যাত্রার লক্ষণাক্রান্ত। অধিকন্তু যাত্রার মতো নাটকে অনাবশ্যকরূপে গান সংযোজিত হইয়াছে। অবশ্য এই নাটকে যাত্রাসুলভ অলৌকিকত্বকে নাট্যকার তেমন গুরুত্ব দান করেন নাই। বরং ভীষ্মের মধ্যে মানবীয় গুণ আরোপ করিয়া চরিত্রটিকে অনেকখানি বাস্তবতা দান করিয়াছেন। তথাপি নাটকটি উৎকৃষ্ট নাটক হয় নাই। পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে 'নরনারায়ণ'ই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। কিন্তু নাটকটি যে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত এমন কথাও বলা চলে না। নাটকটির প্রধান গুণ এই যে, শেক্‌স্‌পীয়রীয় শৈলীর অনুসরণে এখানে নায়ক কর্ণ-চরিত্রের ভিতর দিয়াই নাট্যকাহিনী বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে এবং ঐ চরিত্রে নাট্যকার প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বও সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। নাটকের অন্যান্য চরিত্র অবিকশিত। যাত্রার ধরণে ভাঁড়ামি সৃষ্টি করিতে গিয়া শকুনির মতো চরিত্রেও হাস্যকররূপে তরল কৌতুক রসের সৃষ্টি করিয়াছেন। নাটকটিতে কৃষ্ণভক্তির প্রাবল্যও যাত্রাশৈলীরই অনুসরণ মাত্র।

পৌরাণিক নাটক

'রঘুবীর', 'খাজাহান', 'রঞ্জাবতী', 'আহেরিয়া', 'রত্নেশ্বরের মন্দিরে' প্রভৃতি ক্ষীরোদপ্রসাদের কাল্পনিক নাটক। সব কয়টি নাটকেই রোমান্সের আধিক্য, চরিত্রের সংঘাত বা নাট্যকাহিনীর বিকাশ বলিয়া কোনো কিছুর অনুসন্ধান করিতে যাওয়া সেখানে বৃথা। ইহাদের মধ্যে 'রঘুবীর' নাটকটি এক সময়ে রঙ্গমঞ্চে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। উহার মূলে ছিল নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের অনবদ্য অভিনয়। কিন্তু অভিনয়ের উৎকর্ষ-গুণই নাটকের উৎকর্ষ-গুণের নির্দেশক নহে।

কাল্পনিক নাটক

ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে 'নন্দকুমার' (১৩১৪), 'প্রতাপ আদিত্য' (১৯০৩), 'আলমগীর' (১৯২১), 'পাদ্মিনী', 'চাঁদবিবি', 'বাংলার মসনদ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ রাজপুত-কাহিনীর আধারে 'পদ্মিনী' রচিত। বিজাপুরের মহীয়সী বীরাঙ্গনা চাঁদবিবির কাহিনী 'চাঁদবিবি' নাটকের উপজীব্য। মুর্শিদকুলি খাঁর দৌহিত্র বাংলার নবাব সরফরাজ খাঁ 'বাঙলার মসনদ'-এর নায়ক। অতিমাত্রিক রোমান্সপ্রবণতা তিনটি নাটককেই নাটক হইতে দেয় নাই। 'চাঁদবিবি'তে অতি-সচেতন আধুনিক যুগীয় স্বাধীনতার বাণী হিন্দুমুসলমান চরিত্রনির্বিশেষে এমনভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে যে, শত প্রয়াস সত্ত্বেও নাটকের প্রচারধর্মিতাকে চাপিয়া রাখা যায়

নাই। ইহার উপর উৎকট কল্পনাবিলাস ও ঘটনার অসম্ভাব্যতা তো আছেই। সে-যুগের স্বাদেশিক পরিবেশে 'প্রতাপ আদিত্য' নাটক অকল্পনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু নাট্যবিচারে নাটকটি আদৌ কোনো নাটকই হইয়া উঠে নাই। প্রতাপকে জাতীয় বীররূপে অঙ্কিত করিতে গিয়া তিনি কাহিনীর ঐতিহাসিকতাকে খর্ব করিয়াছেন, তারপর রোমান্সের বল্গাহীন পথে কল্পনাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। উহা সম্ভাব্যতার সীমাকে বহু স্থলেই অতিক্রম করিয়াছে। বিজয়াকে দিয়া নাট্যকার মেরী-মূর্তি ধরাইয়াছেন, নাট্যসমাপ্তিতে ব্রিটানিয়ার আবির্ভাব করাইয়াছেন। কল্পনার এই অতিচার যাত্রাতেই সম্ভব,—নাটকে নহে। নাটকটি সম্পর্কে যে-স্বদেশপ্রীতির দোহাই দেওয়া হয়, তাহাও কোনো নাটকীয় চরিত্রের বিকাশের ভিতর দিয়া উপস্থাপিত হয় নাই, মাত্র কয়েকটি সংলাপের উপরেই উহার অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। তুলনায় 'আলমগীর' উন্নততর ও সুষ্ঠুতর নাটক। বলিতে কি, 'আলিবাবা'র পর নাটক হিসাবে একমাত্র 'আলমগীর'-এর নামই করা চলে। অবশ্য ইহাতেও অনাটকীয়তার ছড়াছড়ি রহিয়াছে, অবতারণা করা হইয়াছে বহু অসম্ভাব্যতার। নাটকের সমাপ্তিতে যখন আমরা হিন্দুবিদ্বেষী আলমগীরের মুখে শুনি—"হে কবি, বছর যাক, যুগ যাক, বহু শতাব্দী চলে যাক, শতাব্দীর পারে, একদিন তোমার তুলিকামুখে আলমগীরের এ মিলন-অভিলাষ—হিন্দু-মুসলমানের মিলন-অভিলাষ মুখর হোক।"—তখন সন্দেহ থাকে না যে, এই উক্তি আলামগীরের নহে—'স্বদেশী' পরিবেশে পরিপুষ্ট নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের। নাটকীয় চরিত্রে নাট্যকারের এইরূপ উৎকট আত্মপ্রকাশ তাঁহার অক্ষমতাকেই প্রকটিত করে। দুর্ভেদ্য মুঘল হারেমে ভীমসিংহের উপস্থিতি এবং অন্যত্র ভীমসিংহকে বীরাবাঈ-এর স্তন্যদান অবাস্তব উপকথার সমতুল্য। একমাত্র আলমগীর এবং উদিপুরীর মধ্যে নাট্যকার চমৎকারভাবে যে-দ্বন্দ্বের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাই এই নাটকটির শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। বস্তুত এই দুইটি চরিত্র-চিত্রণ উচ্চ শ্রেণীর নাট্য-প্রতিভার নিদর্শন। ক্ষীরোদপ্রসাদের সামগ্রিক নাট্যবিচার সম্পর্কে বলা চলে—"ঘটনা, চরিত্র ও সংস্থিতির কোনো কাণ্ডজ্ঞান তাঁহার ছিল না—তাঁহার নাটকের action কল্পনার অতিচারের দ্বারা প্রায়ই দূষিত হইয়াছে; ভাবের কবিত্বময় উচ্চতা—একরূপ নিছক Idealism —তাঁহার নাটকগুলিকে উৎকট রোমান্সে পরিণত করিয়াছে [মোহিতলাল]।" এই কারণেই বাংলা নাট্যসাহিত্যে কোনরূপ সাহিত্যিক উৎকর্ষের নিদর্শন তিনি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

ঐতিহাসিক নাটক

প্রশ্ন ১৪। দ্বিজেন্দ্র-ক্ষীরোদপ্রসাদের সমকালীন নাট্যসাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে সাম্প্রতিক কালের নাট্যসাহিত্য পর্যন্ত বিশিষ্ট নাট্যকারগণের নাট্যকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর। নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্র উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রতিভার নিদর্শন রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রায় এক শত নাটক রচনা করিয়াছিলেন। উহা কেবল বাংলা রঙ্গমঞ্চকেই বাঁচাইয়া রাখে নাই, বহু বাঙালী লেখকের নাটক রচনার প্রেরণাস্বরূপও হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের এই গৌরব কোনোদিন ম্লান হইবার নহে। দ্বিজেন্দ্রলাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ যে আন্তর প্রেরণা হইতেই নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা নহে। রঙ্গমঞ্চের অভিনীত নাটকও উহার উৎসমূলে কাজ করিয়াছে। শেষোক্ত দুইজন নাট্যকারের নাটক রঙ্গমঞ্চে যে আলোড়ন আনিয়াছিল উহার প্রভাবই দূরসঞ্চারী হইয়া আজিও অব্যাহত রহিয়াছে। সেই প্রভাবেই বহু লেখক নাটক রচনায় অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা বড় কম নহে। আমরা উহারই মধ্যে কয়েকজন লেখকের নাট্যকৃতির সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

গিরিশচন্দ্রের শিষ্যগণের মধ্যে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৭৫—১৯৩৪) ছিলেন অন্যতম। ১৯০৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পেশাদারী নাট্যশালার সহিত সংযুক্ত ছিলেন। 'সুদামা' (১৯২২), 'কর্ণার্জ্জুন' (১৯২৩), 'শ্রীকৃষ্ণ' (১৯২৬), 'চণ্ডীদাস' (১৯২৬), শ্রীরামচন্দ্র (১৯২৭), 'ফুল্লরা' (১৯২৮), 'শ্রীগৌরাঙ্গ' (১৯৩১) প্রভৃতি তাঁহার পৌরাণিক ও ভক্তিরসাত্মক নাটক ; 'অযোধ্যার বেগম' (১৯২১), 'মগের মুলুক' (১৯২৭), প্রভৃতি তাঁহার ঐতিহাসিক নাটক ; 'আহুতি' (১৯১৪), 'রাখীবন্ধন' (১৯২০) 'ইরাণের রানী', (১৯২৪) প্রভৃতি তাঁহার কাল্পনিক নাটক ; 'শুভদৃষ্টি' (১৯১৫), 'ছিন্নহার' (১৯২০) প্রভৃতি তাঁহার পারিবারিক নাটক। ইহা ছাড়া তাঁহার রচিত কয়েকটি গীতিমুখর নাটকও আছে। তিনি সর্বসুদ্ধ ২৯ খানি নাটকের রচয়িতা। সবগুলি নাটকই মঞ্চের প্রয়োজনের এবং তৎকালীন দর্শকের রুচির দিকে চাহিয়াই লেখা। উহাদের মধ্যে নাট্যরস বিশেষ কিছু নাই। 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকটি তৎকালে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল মাত্র। অপরেশচন্দ্র নাটকের সংখ্যাই বাড়াইয়াছেন, গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি কিছুই করিতে পারেন

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নাই। তবে একটি বিষয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যে তিনি পথিকৃৎ। তিনিই প্রথম বিদেশী নাটকের সার্থক বঙ্গীকরণ করিয়াছিলেন। ইবসেনের 'The Warriors of Helgeland'-এর অনুসরণে রচিত 'রাখীবন্ধন' নাটকটি ইহার উদাহরণ। 'আহুতি' নাটকও 'The Sign of the Cross'-এর বঙ্গীয় রূপ। 'মা', 'পোষ্যপুত্র' প্রভৃতি কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপও তিনি দিয়াছিলেন।

অপরেশচন্দ্রের সমকালেই গতানুগতিক ধারায় আর যে কয়জন নাট্যকার নাটক রচনা করিয়াছিলেন তাঁহারা হইলেন প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭২-১৯৪৯), ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিশিকান্ত বসুরায় ও বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত। নাট্যকার হিসাবে ইঁহারা কেহই কৃতিত্বের, অধিকারী নহেন, মঞ্চসফল নাটক-রচয়িতা মাত্র। প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর নাটকের মধ্যে রাজা সীতারাম রায়ের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'ভাগ্যচক্র' ও হামিরের কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'চিতোরোদ্ধার' ঐতিহাসিক নাটক। পারিবারিক নাটক 'জয়-পরাজয়' যাত্রা-শৈলীর কথাই মনে করাইয়া দেয়। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিবারিক নাটক 'বাঙালী' এবং দেশাত্মবোধ নাটক 'প্যালারামের স্বদেশিতা' একদা জনসমাদৃত হইয়াছিল। তিনি 'কেলোর কীর্তি' প্রভৃতি কয়েকটি প্রহসনেরও রচয়িতা। শেষের দিকে (১৯২৯-৩০) তিনি ইংরেজী 'The Bells' নাটককে বঙ্গীকৃত করিয়াছিলেন 'শঙ্খধ্বনি' নাটকে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হিন্দু-বীর', 'মোগল-পাঠান', 'আলেকজাণ্ডার' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক এবং 'সরমা' প্রভৃতি পৌরাণিক নাটকও একদা মঞ্চসাফল্য অর্জন করিয়াছিল। কিন্তু উহাদের মধ্যে নাটকীয় গুণ কিছুই ছিল না। বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'মিশরকুমারী'র মঞ্চ-সাফল্য ছিল প্রায় অবিশ্বাস্য। উহাতে বর্ণবিদ্বেষ সম্বন্ধে যে তীব্র কটাক্ষ আছে, 'সাদা'র শোষণে অত্যাচারিত 'কালা'র যে-প্রতিবাদ আবন-চরিত্রের সংলাপে ধ্বনিত হইয়াছে, কৃষ্ণকায় ভারতীয়গণের উপর শ্বেতকায় ইংরেজের শোষণের পটভূমিকায় উহা সেই সময়ে একটা তাৎক্ষণিক উত্তেজনা সৃষ্টি করিত। কিন্তু মঞ্চসাফল্যের দিক হইতে নিশিকান্ত বসুরায়ই সম্ভবত এই চারিজনের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। তাঁহার 'বঙ্গে বর্গী', 'দেবলাদেবী' ও 'ললিতাদিত্য' এই তিনখানি ঐতিহাসিক নাটক একদা বঙ্গরঙ্গমঞ্চে তুমুল আলোড়ন আনিয়াছিল। পূর্বসূরিগণের পারিবারিক নাটকের

প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরদা প্রসন্ন দাসগুপ্ত ও নিশিকান্ত বসুরায়

তুলনায় হয়ত নিকৃষ্টতর তাঁহার পারিবারিক নাটক 'পথের শেষে' (১৯২৯) কিছুকাল আগেও পল্লীতে পল্লীতে প্রায়শই অভিনীত হইত। ঘটনা-সংস্থান এবং নাট্যসংলাপে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। নিশিকান্তের রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষার প্রভাব খুব বেশী। এমন কি, 'দেবলাদেবী'র 'মতিয়া' চরিত্রটি 'সিংহল-বিজয়'-এর লীলা-চরিত্রের হুবহু অনুকরণ বলিয়া মনে হয়।

প্রায় সমকালেই আর-কয়েকজন নাট্যকার বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে কিছুটা নূতনত্বের আস্বাদ আনিবার প্রয়াসে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মঞ্চের প্রয়োজনেই তিনি তাঁহার প্রথম নাটক 'সীতা' (১৯২৪) রচনা করিয়াছিলেন। প্রায় এক-একটি দৃশ্যেই এক একটি অঙ্ক শেষ করিয়া নাটকের আঙ্গিকে নবধারা সৃষ্টিপূর্বক নাট্যকাহিনীতে তিনি একটি দৃঢ়তর সংহতি রচনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। নাদির শাহ-এর কাহিনী অবলম্বনে রচিত ঐতিহাসিক নাটক 'দিগ্বিজয়ী'তেও (১৯২৮) তিনি অনুরূপ ইবসেনীয় নাট্যশৈলীর প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এই নাটকটিই তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। 'নন্দরাণীর সংসার', 'পরিণীতা' 'মাকড়শার জাল' প্রভৃতি তাঁহার রচিত পারিবারিক নাটক। 'মহাশিলা', 'বাংলার মেয়ে', 'পতিব্রতা', 'পথের সাথী' প্রভৃতি উপন্যাসের নাট্যরূপও তিনি দিয়াছিলেন। যোগেশচন্দ্র তাঁহার নাটকগুলিকে—বিশেষত 'দিগ্বিজয়ী'কে—কিছু পরিমাণ সাহিত্যগুণান্বিতও করিতে পারিয়াছিলেন।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

শ্রীমন্মথ রায়ের প্রথম নাটক একটি একাঙ্কিকা—'মুক্তির ডাক' (১৯২৪)। তাঁহার দ্বিতীয় নাটক 'চাঁদ সদাগর'। মধ্যযুগীয় মনসামঙ্গলের কাহিনী ইহার উপজীব্য। দেবতার বিরুদ্ধে যে অপরাজেয় মানবাত্মার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ঐ কাহিনীর মধ্যে ফল্গুধারার মতো প্রবহমান ছিল, মন্মথ রায় তাঁহার নাটকে উহাকেই প্রাধান্য দিয়া বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এক নূতনতার স্বাদ আনিলেন। তাঁহার নাটকের কাব্যময় ভাষা দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষার অনুসারী। তিনি তাঁহার নাটকে অন্তর্দ্বন্দ্বকে সুনিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছেন। 'সাবিত্রী', 'দেবাসুর' (১৯২৮) ও 'কারাগার' (১৯৩০) তাঁহার পৌরাণিক নাটক। 'দেবাসুর' ও 'কারাগার'-এ তিনি সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশকে পৌরাণিক পরিমণ্ডলের

শ্রীমন্মথ রায়

মধ্যে সুসমঞ্জসরূপে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া বাংলা পৌরাণিক নাটকের ধারাকে নূতনতর খাতে প্রবাহিত করিলেন। 'কারাগার' তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। এই নাটকে পুরাণের ভক্তিবাদকে তিনি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পরিবর্তে সমকালীন ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামের মর্মবস্তুকে উহার মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলনে সহস্র সহস্র দেশবাসী কারাবরণ করিয়াছিলেন, সেই পথেই মুক্তি ত্বরান্বিত হইতেছিল। ইহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই একটি গানে—'হত্যায় আসে হত্যা-নাশন, শৃঙ্খলে তার মুক্তি-ভাষণ, তমোময় কারা করি বিদারণ জাগিছে জ্যোতির্ময়।' অথচ পুরাণ-বিরোধী ভাব কোথাও নাট্যরসকে ক্ষুণ্ণ করে নাই। অধিকন্তু কংসের অন্তর্দ্বন্দ্ব চিত্রণে তিনি চমৎকার দক্ষতা দেখাইয়াছেন। পুরাণের মধ্যেও আধুনিকতার সঞ্চার—মন্মথ রায়ের ইহাই নাট্যকৃতিত্ব। 'অশোক' (১৯৩৪), 'মীরকাশিম', 'জীবনটাই নাটক', 'অমৃত অতীত' প্রভৃতি অন্যান্য নাটকে ঐরূপ কৃতিত্বের কোনো স্বাক্ষর দেখা যায় না। 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র 'মহুয়া' পালা অবলম্বনে রচিত তাঁহার 'মহুয়া' নাটকটি বিশেষ মঞ্চসাফল্য লাভ করিয়াছিল।

শিবাজার কাহিনী অবলম্বনে 'গৈরিক পতাকা' (১৯৩০) নাটক লিখিয়াই শচীন্দ্রনাথ নাট্যকার হিসাবে প্রথম খ্যাতি লাভ করেন। নাটকটির মধ্যে প্রবল স্বাদেশিকতার সুর ছিল, কিন্তু গতানুগতিক ঐতিহাসিক নাটকের অনুবর্তন ভিন্ন অন্য কোনোরূপ নাট্যগুণ ছিল না। তাঁহার 'সিরাজদ্দৌলা', 'ধাত্রী পান্না', 'রাষ্ট্র-বিপ্লব', 'কামাল আতাতুর্ক' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকও নিষ্প্রাণ। ইহাদের মধ্যে 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকটি তৎকালীন হিন্দু-মুসলিম মিলনের আবেগপূর্ণ আন্দোলনের দিনে আশ্চর্যরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। গ্রামে গ্রামান্তরে ইহার অভিনয় হইয়াছে; এমন কি, যাত্রার দলেও ইহার প্রচুর অভিনয় হইয়াছে। অবশ্য নাটকটি যাত্রা-শৈলীরই অন্তর্গত। ইহাকে যাত্রার নাটক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নাটকে উচ্ছ্বাস আছে প্রচুর, কিন্তু সংঘাত নাই, অন্তর্দ্বন্দ্ব নাই। 'আলেয়া' নাটকের একটি প্রধান চরিত্র। চরিত্রটি সম্পূর্ণ অসম্বদ্ধ; উহার ক্রিয়াকলাপের মধ্যে কোনো অর্থই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাঙালী দর্শকের রসপিপাসা-যে কিছুকাল আগে পর্যন্ত যাত্রার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই, 'সিরাজদ্দৌলা' ইহার জীবন্ত প্রমাণ। 'ধাত্রীপান্না'য় কোনো রকমে শুধু কাহিনীটিই বলা হইয়াছে। একমাত্র ভাষা ভিন্ন রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বনবীর'

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

নাটকের ঊর্ধ্বে উহা উঠিতে পারে নাই। 'রাষ্ট্র-বিপ্লব'-এ আমরা রাষ্ট্র-বিপ্লবের গতি-প্রকৃতিই আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু নিরাশ হইয়াছি। উহা শাহ্‌জাহান-পুত্র দারার জীবনী মাত্র হইয়াছে। 'কামাল আতাতুর্ক' নিতান্তই অনুল্লেখ্য রচনা। 'ঝড়ের রাতে', 'রক্তকমল', 'তটিনীর বিচার', 'স্বামী-স্ত্রী', 'সংগ্রাম ও শান্তি', 'নার্সিং হোম', 'কাঁটা ও কমল' প্রভৃতি শচীন্দ্রনাথের পারিবারিক নাটক। ভাবের দিক হইতে নাটকগুলিকে আধুনিক করিয়া তুলিবার যে প্রয়াস আছে, উহা অবাস্তব action-এর অতিচারে পর্যবসিত হইয়াছে। ঐগুলিতে যে-সমাজের চিত্র দেখিতে পাই তাহার অস্তিত্ব এদেশে বিরল, উহা একান্তভাবেই লেখকের কল্পনাপ্রসূত। অধিকন্তু নাটকগুলির নায়ক-চরিত্র কোনো-না-কোনো বিশিষ্ট অভিনেতার মুখ চাহিয়া অঙ্কিত; অতএব চরিত্র-চিত্রণে আমরা কেবল সেই অভিনেতাদের আঙ্গিক অভিব্যক্তি ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, নাটকগুলি সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম, মানবজীবনের বিকৃত মুখভঙ্গিমাত্র। নাটকগুলি মঞ্চসাফল্য অর্জন করিয়াছিল, তাই শচীন্দ্রনাথ নাট্যকাররূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন; বাংলা নাট্যসাহিত্যে উন্নততর কিছুই তিনি দান করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাই অল্প কালের মধ্যে তাঁহার নাটকাবলী লোকবিস্মৃতির গর্ভে লীন হইতেছে।

অনেকগুলি নাটক লিখিলেই-যে এখানে নাট্যকার-খ্যাতি লাভ করা যায় তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ—জলধর চট্টোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ রাহা এবং শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত। একদা জলধর চট্টোপাধ্যায় নাটকের ক্ষেত্রে প্রায় একছত্রাধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। 'রীতিমত নাটক', 'পি. ড্যব্লিউ. ডি.', 'সত্যের সন্ধান', 'সিঁথির 'সিদূঁর', 'আঁধারে আলো', 'শক্তির মন্ত্র', 'ডাক্তার শুভংকর' প্রভৃতি বহু নাটক তিনি লিখিয়াছেন। নাটকগুলি অবাস্তব, উহাদের কাহিনী অসম্বদ্ধ, চরিত্র-চিত্রণের বালাই কোথাও নাই। বাঙালী দর্শক-যে কী করিয়া এইসকল পদার্থহীন রসহীন নাটক সহ্য করিতেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। সুধীন্দ্রনাথ 'মোগল মসনদ', 'মহারাষ্ট্র' প্রভৃতি কতকগুলি নাটকের রচয়িতা। ইহার নাট্যরচনাও গতানুগতিক। এই ত্রয়ীর মধ্যে শ্রীমহেন্দ্র গুপ্তের নাটকই কিছুটা উল্লেখ্য। নাট্যকার হিসাবে সব দিক হইতেই ইনি গিরিশচন্দ্রের উত্তরসূরি। লিখিয়াছেন প্রচুর কিন্তু কোনো নাটকই সাহিত্যগুণসম্পন্ন নহে। 'উত্তরা', 'গঙ্গাবতরণ', 'গয়াতীর্থ', 'শ্রীদুর্গা', 'অলকনন্দা', 'সারথি শ্রীকৃষ্ণ' প্রভৃতি পৌরাণিক

জলধর চট্টোপাধ্যায়
সুধীন্দ্রনাথ রাহা ও
শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত

নাটকগুলির ভাষা কিছুটা মার্জিত হইলেও অলৌকিকতা ও অনাটকীয়তায় কণ্টকিত। 'মহারাজা নন্দকুমার', 'টিপু সুলতান', 'শত বর্ষ আগে', 'সোনার বাংলা', 'অভিযান', 'সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত', 'বিজয়নগর', 'হায়দার আলি', 'রায়গড়' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে তিনি কোনো রকমে কাহিনীটি মাত্র বিবৃত করিয়া নাট্যকারের দায় সারিয়াছেন। 'টিপু সুলতান', 'মহারাজা নন্দকুমার', 'শত বর্ষ আগে' প্রভৃতি কয়েকটি নাটকে জাতীয়তার সোচ্চার ঘোষণা আছে বলিয়া একদা উহারা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। 'কঙ্কাবতীর ঘাট', 'স্বর্গ হতে বড়' প্রভৃতি পারিবারিক নাটকেও নাট্যরসবিরোধী বহু অবাস্তব বিষয়ের সন্নিবেশ রহিয়াছে। কাহিনীর মধ্যে বহু অসংলগ্নতাও পীড়াদায়ক বলিয়া বোধ হয়। নাট্যকার এখনও জীবিত। কিন্তু ইহারই মধ্যে তাঁহার নাটকের কথা জনমানস হইতে প্রায় মুছিয়া গিয়াছে। নাট্যকারের পক্ষে ইহা অবশ্যই কৃতিত্বের কথা নহে।

জনরুচির নিকট আত্মসমর্পণের অপর দৃষ্টান্ত শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য। 'মেঘমুক্তি', 'মাটির ঘর', 'বিশ বছর আগে', 'রক্তের ডাক', 'খেলা ভাঙার খেলা', 'খবর বলছি', 'ক্ষুধা' প্রভৃতি তাঁহার পারিবারিক নাটক। একমাত্র মধুর সংলাপ ভিন্ন তাঁহার নাটকে আকর্ষণীয় আর কিছুই নাই। প্রধানত রোমান্সের অতিরেকই তাঁহার নাটকগুলির নাট্যরস ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। কাহিনীর পরিধিও সংকীর্ণ। বিবাহিতা নায়িকার পুর্বপ্রণয়ী, প্রায় নপুংসক নায়ক, মদ্য, রিভলবার, খুন—বহু নাটকের কাহিনীই প্রায় ইহারই মধ্যে ঘুরপাক খাইয়াছে। এই প্রসঙ্গে

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য ও
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

'মেঘমুক্তি', 'মাটির ঘর', 'রক্তের ডাক' প্রভৃতির উল্লেখই যথেষ্ট। সম্ভবত 'মাটির ঘর'ই তাঁহার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাটক। এই নাটকে গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান'-এর কাহিনীর প্রভাব অতিরিক্ত মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। করুণাময় এখানে সত্যপ্রসন্নে রূপান্তরিত, তাঁহার তিন কন্যা তন্দ্রা-নন্দা-ছন্দায় পরিণত, করুণাময়ের কন্যাদের করুণ পরিণতির মতো এই নাটকেও কেহ বিষ খাইয়াছে, কেহ পাগল হইয়া গিয়াছে। 'বলিদান' যেমন নিকৃষ্ট মেলোড্রামা, 'মাটির ঘর'ও তাই; অথচ ইহা এক সময়ের জনপ্রিয় নাটক। বরং আমরা বিধায়কের 'সেই তিমিরে', 'তাই তো' প্রভৃতি প্রহসনের প্রশংসা করিব। তাঁহার মধুর সংলাপ প্রহসন শ্রেণীর নাটকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। এই শ্রেণীর বিদ্রূপাত্মক নাটক রচনায় শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সত্যই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। তাঁহার 'ঋণং

কৃত্বা' (১৯৩৫), 'মৌচাকে ঢিল' (১৯৩৮), 'ঘৃতং পিবেৎ' (১৯৩৯), 'পারমিট' প্রভৃতিকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন বলিতে সম্ভবত কাহারও দ্বিধা থাকিবার কথা নহে।

সমকালেই বাংলা নাটকের ক্ষেত্র আর একটি দিকে প্রসারিত হইয়াছে—উহা জীবনী-নাটক। 'বনফুল' (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) এ বিষয়ে পথিকৃৎ। তাঁহার 'শ্রীমধুসূদন' (১৯৩৯) ও 'বিদ্যাসাগর' (১৯৪১) নাটক দুইটির বহু ক্ষেত্রেই চমৎকার নাট্যরসের সমাবেশ ঘটিয়াছে। এ প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রামমোহন' এবং বিধায়কের 'এণ্টনি কবিয়াল' (১৯৬৭)-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

জীবনী নাটক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং উহার পরবর্তীকালের বহু ঘটনা আমাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে এক গুরুতর পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। এই ইতিহাস ভাঙনের ইতিহাস, দ্বিধা-সংশয়ের ইতিহাস, বহু সৎ মূল্যবোধের অস্বীকারের ইতিহাস। ইহারই সঙ্গে দেখা দিয়াছে প্রবল সমাজ-সচেতনতা। এই দুইয়ের মিশ্র ফলস্বরূপ বাংলায় আমরা যে-সকল নাটক পাইতেছি উহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য সমাজ-সচেতনতা। উহারই প্রকাশ আমরা প্রথমে দেখিতে পাই শ্রীবিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' (১৯৪৪) নাটকে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় নাটকটি রচিত। কিন্তু ইহা নাটক হইয়া উঠিতে পারে নাই, নাট্যচিত্র মাত্র। 'মরা চাঁদ', 'গোত্রান্তর' প্রভৃতি তাঁহার পরবর্তী রচনাগুলি বরং অনেক বেশী নাট্যগুণসম্পন্ন। এই শ্রেণীর অপর নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী। তাঁহার 'পথিক', 'উলুখাগড়া', 'দুঃখীর ইমান', 'ছেঁড়া তাঁর' প্রভৃতি নাটকের বলিষ্ঠ সমাজ-সচেতনতাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেকের ক্ষুব্ধ মন্তব্য এই যে, নানা সমস্যার বাস্তব রূপ এই সকল নাটকে আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে উপস্থাপিত হইলেও ইহাদের একখানিও উৎকৃষ্ট নাটক নহে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' সত্যই একখানি উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটক। সমাজ-শোষণের ও নির্যাতনের পটভূমিকায় এই নাটকে এক চাষী দম্পতির জীবনকে যে-গভীর দ্বন্দ্বময় রূপ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ইহা বাংলা নাট্যসাহিত্যের একখানি উৎকৃষ্ট ট্র্যাজিডি হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রসঙ্গে জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'পরিচয়' এবং 'প্রশ্ন' নাটক দুইটিরও উল্লেখ করিতে পারি। সামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও 'পরিচয়' একটি

নবনাট্য আন্দোলন : শ্রীবিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীউৎপল দত্ত

উৎকৃষ্ট ট্র্যাজিডি। সলিল সেন অবশ্য 'নতুন ইহুদী'তে যে সম্ভাবনা লইয়া দেখা দিয়াছিলেন, 'মৌ-চোর', 'ডাউন ট্রেন' প্রভৃতি তাঁহার পরবর্তী নাটকে আমরা উহার বিশেষ চিহ্ন দেখিতে পাই না। অতি সাম্প্রতিক কালে উৎপল দত্তের কয়েকটি নাটক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ছায়ানট,' 'অঙ্গার,' 'ফেরারী ফৌজ', 'কল্লোল' প্রভৃতি তাঁহার রচিত নাটক। অনেকে তাঁহার নাটকে একটি বিশেষ মতবাদের সোচ্চার ঘোষণা শুনিতে পান। তৎসত্ত্বেও নাটক হিসাবে 'অঙ্গার' এবং 'কল্লোল' যে নাট্যগুণসম্পন্ন নহে, একথা বলা চলে না। অবশ্য আমরা যদি নাটকের একটা বিশেষ আদর্শকে আঁকড়াইয়া থাকি তবে সে আলাদা কথা। কিন্তু সাহিত্যের সকল শাখার মতোই নাটকের আদর্শও যুগে যুগে বদলায়। সুতরাং শেক্‌স্‌পীয়র বা ইবসেনের নাট্যাদর্শের তুলাদণ্ডে সকল নাটকের বিচার সমীচীন নহে।

সাম্প্রতিক কালের নাটক আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশ পেশাদারী মঞ্চ আজিও সেই গতানুগতিক নাটকের আবর্তে ঘুরপাক খাইতেছে বটে, কিন্তু উহার বাহিরে নূতন নূতন নাটক রচনার প্রেরণাও দেখা যাইতেছে। শ্রীদিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজোছন দস্তিদার, শ্রীবীরু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উহারই স্বাক্ষরবাহী। কিছুকাল হইল বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বিদেশী নাটকের বঙ্গীকরণ-এর প্রবণতা দেখা দিয়াছে। ইবসেনের অনুসরণে 'পুতুল খেলা' (The Doll's House), 'প্রেত' (Ghosts), 'দশচক্র' (An Enemy of the People), 'বনহংসী' (The Wild Duck), শেখভের অনুসরণে 'আমের মঞ্জরী' (The Cherry Orchard), 'শঙ্খচিল' (The Seagull), গোর্কির অনুসরণে 'নীচের মহল' (The Lower Depths), পিরানদেল্লোর অনুসরণে 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' (Six Characters in search of an Author) প্রভৃতি নাটক ইতিমধ্যেই বিদগ্ধজনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার ফলে মৌলিক ভালো বাংলা নাটক হয় তো বিশেষ কিছু সৃষ্টি হইতেছে না, কিন্তু এইরূপ বঙ্গীকরণের গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকার কথাও অনস্বীকার্য। এই সকল নাটকই হয় তো ভবিষ্যতে উৎকৃষ্ট মৌলিক বাংলা নাটক রচনার প্রেরণা যোগাইবে। আমরা আশাবাদী, সেই সুদিনের প্রত্যাশা অবশ্যই করিব।

বিদেশী নাটকের বঙ্গীকরণ

১৫। সূচনাকাল হইতে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলা পৌরাণিক নাটকের রূপগত ও ভাবগত ধারার পরিচয় দাও।

উত্তর। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির দীপ্যমান স্পর্শ হইতেই আধুনিক গীতি-কবিতা ও মহাকাব্য, উপন্যাস ও ছোটগল্প প্রভৃতি সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মতো নাটকের দীপশিখাটিও অমরা প্রথম জ্বালাইয়া ধরিয়াছিলাম। ইংরেজী নাট্যমঞ্চ এদেশে যে উত্তাপ ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছিল, উহাই-যে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের মধ্যে নাটক রচনার প্রেরণা যোগাইয়াছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। মূলত শেক্স্পীয়র প্রভাবিত হইলেও বাংলা নাটক কিন্তু কাহিনীর জন্য ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর দিকে হাত বাড়ায় নাই, পুরাণ-কাহিনীকেই উহার উপজীব্য করিয়াছিল। ইহার কারণ দেশীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই নিহিত। বাঙলা দেশে পুর্ব হইতেই যাত্রার প্রচলন ছিল। জাতির ধর্মীয় সংস্কারের অনুগামী ভক্তিবাদ ও অলৌকিকতাবাদের রসেই ছিল উহা পরিপুষ্ট। বাঙালী যখন নাটক সৃষ্টি করিতে বসিল তখন সে একদিকে এই ঐতিহ্যকে অস্বীকার করিতে পারিল না, আবার তাহার ইংরেজী শিক্ষিত মন যাত্রাকেও সম্পুর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারিল না। ফলে বাংলা নাটক বহুকাল ধরিয়া এক মিশ্র উপাদানের সাহিত্যই হইয়া রহিয়াছে। উহার বাহিরটা বিলাতী রাংতায় মোড়া, ভিতরে দৈবনির্ভর ভক্তিরসের উচ্ছ্বাস। তাই বাংলায় প্রথম যে-নাটক সৃষ্ট হইল উহার বিষয়বস্তু পৌরাণিক। ১৮৫২ সালে তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' দিয়াই উহার যাত্রারম্ভ। মহাভারতের সুভদ্রা-হরণ কাহিনী ইহার বিষয়বস্তু। পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শে কাহিনীটি অঙ্কে ও দৃশ্যে বিভক্ত—বিলাতী নাটকের অনুসরণ এই পর্যন্ত। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, চরিত্রের দ্বন্দ্ব ও বিকাশ প্রভৃতি ইহাতে অনুপস্থিত। ইহার পরে আমরা পাই হরচন্দ্র ঘোষের 'কৌরব বিয়োগ' (১৮৫৮) ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'সাবিত্রী-সত্যবান' (১৮৫৮)। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৬০) এই ধারার নাটকে কিছুটা নূতনত্বের স্বাদ আনিল। ইহাতে সংস্কৃত নাট্যশৈলীর অনুবর্তন থাকিলেও এই প্রথম পৌরাণিক নাটকে সচেতনভাবে মানবিক প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব উপস্থাপনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। মধুসূদনের 'পদ্মাবতী' (১৮৬০), গ্রীক-পুরাণাশ্রিত হইলেও ইহা পৌরাণিক নাটকই বটে। পরবর্তী কয়েকটি পৌরাণিক নাটক হইল রামনারায়ণের 'রুক্মিণীহরণ' (১৮৭১) 'কংসবধ' (১৮৭৫),

প্রথম পর্বের পৌরাণিক নাটক : রামনারায়ণ ও মধুসূদন

'ধর্মবিজয়' (১৮৭৫) প্রভৃতি। রামনারায়ণ পর্যন্ত পৌরাণিক নাটকগুলিকে আমরা প্রথম পর্বের বাংলা পৌরাণিক নাটক বলিতে পারি। এই পর্বের নাটকগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, রূপের দিক হইতে ইহারা অঙ্কে ও দৃশ্যে বিভক্ত পুরাণ-কাহিনীর সংলাপময় অনুসরণ মাত্র। মধুসূদন, কালীপ্রসন্ন, হরচন্দ্র ও রামনারায়ণের নাটকে সংস্কৃত নাট্যশৈলীর প্রভাবও প্রচুর। ভাষা অতিমাত্রায় সংস্কৃতগন্ধী ও কৃত্রিম। ইঁহাদের মধ্যে একমাত্র মধুসূদনই ভক্তিবাদের আবেগ পরিহার করিয়া নাটকীয় চরিত্রে মানবিক অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রস্ফুটনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এজন্য প্রথম পর্বের পৌরাণিক নাট্যকারদের মধ্যে মধুসূদনের স্থান সর্বোচ্চ।

উনিশ শতকের উত্তরার্ধের প্রথম দিকেই এদেশে হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণের জোয়ার বহিতে শুরু করিয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয়, কাব্যে এবং উপন্যাসে উহার প্রচার বড় একটা দেখা যায় নাই। রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেম-নবীনের কাব্য এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম দিককার উপন্যাসগুলি উহার প্রমাণ। কিছু পরবর্তীকালে নবীনচন্দ্রের কাব্য-ত্রয়ীতে (১৮৮৭-১৮৯৬) এবং বঙ্কিমের শেষ দুইটি উপন্যাসে (১৮৮৩ ও ১৮৮৮) এবং কতকগুলি প্রবন্ধে হিন্দু সংস্কৃতির মহিমা প্রচারের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু নাটকে উহার পূর্বেই হিন্দুধর্মের ভক্তিবাদ প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। মনোমোহন বসুই উহার প্রবক্তা। ইহার কারণ কাব্য-উপন্যাসের যোগ কেবল শিক্ষিতবর্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু নাটক ও অভিনয়-এর সংযোগ অগণ্য জনসাধারণের সঙ্গে। পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষাবঞ্চিত সেই জনসাধারণ তাই যুক্তিবাদ, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি আধুনিক চেতনায় উদ্দীপ্ত হইতে পারে নাই। তাহারা মধ্যযুগীয় ধর্মীয় পরিমণ্ডলেই অলৌকিকতাবাদ ও দেবমাহাত্ম্যকীর্তনের মধ্যেই বাস করিতেছিল। এইরূপ সংস্কারাবদ্ধ জনমানবকে উদ্দীপ্ত করিতে হইলে পুরাণরসাশ্রিত ভক্তিবাদের পথ ছাড়া আর কোন পথই ছিল না। যুগের ধারায় জনরুচিকে উন্নত না করিয়া সহজ খ্যাতির লোভে মনোমোহন তাই গীতাভিনয়ের ধারায় পৌরাণিক নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই কারণেই তাঁহার 'রামাভিষেক' (১৮৬৭), 'সতী' (১৮৭৩), 'হরিশ্চন্দ্র' (১৮৭৫), 'পার্থপরাজয়' (১৮৮১), 'রামলীলা' (১৮৮৯) প্রভৃতি নাটক খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। রাজকৃষ্ণ রায়—'পতিব্রতা' (১৮৭৫)' 'অনলে বিজলী', 'প্রহ্লাদ-চরিত্র'

পৌরাণিক নাটকে ভক্তির উচ্ছ্বাস

(১৮৮৪) ও অতুলকৃষ্ণ মিত্র—'নন্দোৎসব', 'নন্দবিদায়' এই ধারারই বাহক। এই ধারাকেই কিছুটা সাহিত্যিক নৈপুণ্যের ভিতর দিয়া দুকূলপ্লাবিনী করিয়া তুলিলেন গিরিশচন্দ্র। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন বলিয়া জনগণের রুচি ও চাহিদা সম্পর্কে তাঁহার বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। নাটককে সহজেই মঞ্চসফল করিয়া তুলিবার জন্য তিনি জনরুচির নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। পূর্বসূরি মনোমোহন ও রাজকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলির ('পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'—১৮৮৩, 'দক্ষযজ্ঞ', 'জনা'—'১৮৯৩' 'পাণ্ডব-গৌরব'—১৯০০, 'তপোবল'—১৯১১) ও অবতারমূলক এবং ভক্ত-চরিতমূলক নাটকগুলির ('চৈতন্য-লীলা'—১৮৮৪, 'নিমাই সন্ন্যাস'—১৮৮৫, 'বিল্বমঙ্গল'—১৮৮৬, 'পূর্ণচন্দ্র'—১৮৮৮, 'শংকরাচার্য'—১৯১০) পার্থক্য এই যে, গিরিশচন্দ্রের নাটকে যাত্রারীতির সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যরীতির কিছুটা মিশ্রণ রহিয়াছে। অন্যথা তাঁহার নাটকে যাত্রাসুলভ অবান্তর গীতিবাহুল্য, অবাস্তব চরিত্রচিত্রণ, উপদেশপ্রচারপ্রাধান্য—প্রাচীন প্রথার অনুবর্তনমূলক সব কয়টি লক্ষণই রহিয়াছে। মধুসূদন তাঁহার পৌরাণিক নাটকে যে-আধুনিক মানসিকতার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র উহাকে সজ্ঞানে অস্বীকার করিয়া বাঙালী দর্শকগণকে হরিকীর্তনের আসরে টানিয়া নামাইলেন। ঘড়ির কাঁটাকে পিছনের দিকে ঘুরাইয়া দিবার এই প্রতিক্রিয়াশীলতাকে মহাকাল কিন্তু ক্ষমা করেন নাই; তাঁহার মৃত্যুর কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক জনমানস মঞ্চ হইতে চিরকালের মতো নেপথ্যে প্রস্থান করিয়াছে।

দ্বিতীয় পর্বের পৌরাণিক নাটক : মনোমোহন, রাজকৃষ্ণ এবং গিরিশচন্দ্র

এই দ্বিতীয় পর্বের পৌরাণিক নাটকগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের মধ্যে যাত্রাসুলভ গীতি ও কাহিনী-বাহুল্য যেমন রহিয়াছে তেমনি ভক্তি ও করুণ রসের অতিনাটকীয়তাও রহিয়াছে। তত্ত্ব-উপদেশ প্রচারের প্রবণতা এই সকল পৌরাণিক নাটকের নাট্যগুণকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। হাস্যরস-সৃষ্টির নামে বিকৃতরুচির ভাঁড়ামি দ্বারা লোকরঞ্জনের উৎকট প্রয়াস সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত। গিরিশ-নাটকে ইংরেজী ধরনে চরিত্রসৃষ্টির প্রয়াস রসাভাসের হেতু হইয়াছে; কারণ তাঁহার শিল্পি-মানস ও প্রতিভা কোনোটাই পাশ্চাত্ত্য নাটকের প্রাণবস্তু স্বীয়করণের অনুকূল ছিল না।

পৌরাণিক নাটকে অতিনাটকীয়তা

অলৌকিক ভক্তিবাদে আচ্ছন্ন দ্বিতীয় পর্বের পৌরাণিক নাট্যকারগণ যে বাংলা নাটককে হরিকীর্তনের আসরে পরিণত করিয়াছিলেন, সেই নাটককে আধুনিক মানবিকতাবাদের মধ্যে মুক্তি দিলেন তৃতীয় পর্বের নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল। তিনি তাঁহার 'পাষাণী' (১৯০০), 'সীতা' (১৯০৮) ও 'ভীষ্ম' (১৯১৪) নাটকে পৌরাণিক চরিত্রের মধ্যে মানবধর্ম আরোপ করিলেন। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি মানবপ্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাতে নাটকীয়রূপে প্রাণচঞ্চল। তিনি ভক্তিরসকে বর্জন করিলেন, অলৌকিকতাকে বর্জন করিলেন, এক কথায় যাত্রার ধারাকে অস্বীকার করিলেন। নাটক হিসাবে হয় তো ইহাদের ন্যূনতা স্বীকার্য, কিন্তু এই শ্রেণীর নাটকের ধারায় দ্বিজেন্দ্রলাল যে একটা পরিবর্তন আনিয়াছিলেন ইহাও অস্বীকার করা চলে না। এই ধারার নাট্যকার হইয়াও ক্ষীরোদপ্রসাদ দোদুল্যমানতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার 'ভীষ্ম' (১৩২০) ও 'নরনারায়ণ' (১৩৩৩) এই দুইটি উল্লেখ্য নাটকে একদিকে ভক্তিবাদ ও মানবিকতাবাদ সমান্তরাল ধারায় প্রবহমান। 'ভীষ্ম' নাটকে যেমন যাত্রাশৈলীর প্রাধান্য, 'নরনারায়ণে' তেমনি কর্ণ-চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বে আধুনিক মানসের প্রতিফলন। পরবর্তী কয়েকজন নাট্যকার কিন্তু সহজ খ্যাতির লোভে পুরাতন ধারাকেই অনুসরণ করিয়াছেন। তবে সেই ধারায় যাত্রারীতির প্রাবল্য কিছুটা কম। ইহাদের মধ্যে অপরেশচন্দ্র ('কর্ণার্জুন'—১৯২৩, 'শ্রীকৃষ্ণ'—১৯২৬, 'শ্রীরামচন্দ্র'—১৯২৭, 'শ্রীগৌরাঙ্গ'—১৯৩১), ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ('ক্ষত্রবীর'), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ('সরমা') প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। যোগেশচন্দ্রের 'সীতা' (১৯২৪) নাটকে আধুনিকতার লক্ষণ বিদ্যমান। অতঃপর মন্মথ রায় পৌরাণিক ধারায় এক আশ্চর্য পরিবর্তন সাধন করিলেন। তিনি তাঁহার 'দেবাসুর' (১৯২৮), 'কারাগার' (১৯৩০) প্রভৃতি নাটকে সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিবেশকে পৌরাণিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে সংমিশ্রিত করিলেন। তাঁহার নাটকেই আধুনিক মানসের পূর্ণ জয় সূচিত হইল। পুরাণের এই আধুনিক ব্যাখ্যায় পুরাণই নবরূপে জীবিত হইয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আরও পরবর্তী নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত সুলভ খ্যাতির মোহে গিরিশচন্দ্রেরই অনুবর্তী হইয়াছেন। তাঁহার 'উত্তরা', 'গঙ্গাবতরণ', 'গয়াতীর্থ', 'সারথি শ্রীকৃষ্ণ', 'মদনমোহন' প্রভৃতি নাটক 'মডার্ন'

তৃতীয় পর্বের পৌরাণিক নাটক: দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ

পৌরাণিক পরিমণ্ডলে আধুনিক জীবনবাদ

গীতাভিনয় মাত্র। ঐ পর্বের নাটকগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, অধিকাংশ নাট্যকারের মধ্যেই যাত্রাশৈলীকে বর্জন করিবার একটা প্রবণতা রহিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল, যোগেশচন্দ্র ও মন্মথ রায় তাঁহাদের নাটকে মানবিকতাবাদ ও চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বকেই প্রাধান্য দিয়াছেন ; আবার অপরেশচন্দ্র, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি অলৌকিকতা ও ভক্তিবাদেরই অনুসারী। তবে শেষোক্তগণের নাটকে দ্বিতীয় পর্বের নাট্যকারগণের মতো বিবৃতিমুখিতা থাকিলেও তত্ত্বোপদেশমুখিতা নাই। ইহা হয় তো যুগধর্মেরই প্রভাব। সাহিত্য যে প্রচারমাত্র নহে, সম্ভবত ইহা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন।

কিন্তু কাল বদলাইতেছে, যুগধর্মেরও পরিবর্তন ঘটিতেছে, জনসাধারণের রুচিও রূপান্তরিত হইতেছে। আজিকার দিনে সমাজ-সচেতনতা এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, পুরাণ-রস আর মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে না। অতি সাম্প্রতিক অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালের নাট্যকারগণ তাই পৌরাণিক নাটক রচনায় কোনো প্রেরণাই অনুভব করিতেছেন না। মন্মথ রায়ের মতো পুরাণের যুগোপযোগী নূতন ব্যাখ্যা যদি কেহ করিতে পারেন তবেই পৌরাণিক নাটক সম্বন্ধে আধুনিক জনমানস আকৃষ্ট হইতে পারে ; নচেৎ উহার দিন ফুরাইয়াছে, উহাকে জাদুঘরেই তুলিয়া রাখিতে হইবে।

পৌরাণিক নাটকের অবক্ষয়

১৬। সূচনাকাল হইতে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের গতি-প্রকৃতির পরিচয় দাও।

উত্তর। ইংরেজী নাট্যশালার রঙ্গ দেখিয়া আমরা উহারই অনুকরণে রঙ্গশালা নির্মাণে উদ্যোগী হইয়াছিলাম। তেমনি ইংরেজী নাটকও—বিশেষত শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক—তৎকালে শিক্ষিতবর্গের প্রাণমন আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়র প্রধানত ঐতিহাসিক নাট্যকার হইলেও প্রথম বাংলা নাটক 'কীর্তিবিলাস'-এর (১৮৫২) পর সার্থক ঐতিহাসিক নাটক রচনার জন্য আমাদিগকে আরও নয় বৎসর কাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। সামাজিক প্রহসন ও পৌরাণিক নাটকের যুগ পার হইয়া আমরা ঐতিহাসিক নাটকের যুগে পদার্পণ করিয়াছিলাম। বহুমুখী প্রতিভাধর মধুসূদনই বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের প্রথম স্রষ্টা ('কৃষ্ণকুমারী'—১৮৬১)। তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী'র কাহিনী টডের 'রাজস্থান' হইতে গৃহীত। 'রাজস্থান'-এর কাহিনীগুলি যে প্রধানত কিংবদন্তীমূলক, আধুনিক গবেষণায় তাহা স্বীকৃত। কিন্তু তৎকালে ঐ গ্রন্থ

ইতিহাসরূপেই স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। সুতরাং 'কৃষ্ণকুমারী'কে ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে। নাটকের প্রয়োজনে উপকাহিনী কোনো কল্পিত ব্যাপার হইতে পারে, কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী'তে প্রধান ঘটনাবিন্যাসে মধুসূদন 'রাজস্থান'কে প্রায় বিশ্বস্তরূপেই অনুসরণ করিয়াছেন। এই নাটকে কেবল পাশ্চাত্ত্য আঙ্গিকই অনুসৃত হয় নাই, গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া পাশ্চাত্ত্য ট্র্যাজিডি রচনারও প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক নাটকের প্রথম পর্বে আমরা এই একটি মাত্র নাটকই পাইতেছি। এই পর্বের নাটকে পাশ্চাত্ত্য নাট্যশৈলীর সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য নাটকের ভাববস্তুর সংমিশ্রণের প্রয়াসই প্রধান। ট্র্যাজিডি রচনার মূলেও ঐ একই প্রেরণা বর্তমান। অর্থাৎ সকল দিক দিয়া পাশ্চাত্ত্য নাটকের আদর্শকে তুলিয়া ধরিবার একটা প্রয়াস এই পর্বের ঐতিহাসিক নাটকের বৈশিষ্ট্য।

প্রথম পর্বের ঐতিহাসিক নাটক : নাট্যকার মধুসূদন

ঐতিহাসিক নাটকের দ্বিতীয় পর্বের শুরু জ্যোতিরিন্দ্রনাথে। ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন করিয়া দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত করাই ছিল তাঁহার নাট্যরচনার মৌল প্রেরণা। 'পুরুবিক্রম' (১৮৭৪), 'সরোজিনী' (১৮৭৫), 'অশ্রুমতী' (১৮৭৯) ও 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২) নাটকগুলি সেই প্রেরণারই ফল। লক্ষ্য করিবার বিষয়, চারিখানির মধ্যে দুইখানির ('সরোজিনী' ও 'অশ্রুমতী') কাহিনীই রাজপুত-কাহিনী হইতে গৃহীত। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'র উৎসস্থলও ছিল উহাই। ইহার কারণ, রাজপুত জাতির শৌর্য ও আত্মত্যাগের মধ্যেই নাট্যকারগণ দেশপ্রীতির দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাই রাজপুত-কাহিনীই প্রধানত দেশপ্রেমের প্রতীক বিবেচিত হইয়াছিল। এই শ্রেণীর নাটক রচনা করিবার কারণ, তখন দেশের চারিদিকে একটা স্বাদেশিক চেতনা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, নাট্যকারগণের উপর সেই প্রভাব অনিবার্যরূপেই ক্রিয়াশীল হইয়াছিল। নাটকগুলি যত-না নাটক হইয়াছে, তদপেক্ষা বেশী হইয়াছে স্বদেশপ্রেম প্রচারের বাহন। মধুসূদনের নাটকে অবশ্য ইহার বীজ নিহিত ছিল, কিন্তু প্রতিভাবান বলিয়া তিনি উহাকেই সর্বস্ব করিয়া তুলেন নাই। তিনি নাটক লিখিতে চাহিয়াছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চাহিয়াছিলেন নাটকের আকারে দেশপ্রেমের উদ্বোধন। রচনাকালের দিক হইতে এই ধারার দ্বিতীয় প্রধান নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ। তাঁহার 'প্রতাপ আদিত্য' ১৯০৩ সালের রচনা। এই নাটকে

দ্বিতীয় পর্বের ঐতিহাসিক নাটক : নাট্যকার— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

অনৈতিহাসিক ব্যাপার আছে, এমন কি অলৌকিক ব্যাপারও রহিয়াছে, নাটক হিসাবে ইহা ব্যর্থ, তথাপি এক সময়ে উহা প্রচুর জনসমাদর লাভ করিয়াছিল।

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ

'নন্দকুমার' (১৩১৪), 'আলমগীর' (১৯২১), 'পদ্মিনী', 'চাঁদবিবি' 'বাংলার মসনদ' প্রভৃতি তাঁহার রচিত অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটক। যখন এই নাটকগুলি রচিত হয়, তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কাল। সে সময়ে জাতীয়তাবাদের উপজাতরূপে এদেশে আর-একটি বিষয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। উহা হিন্দু-মুসলমানের মিলন আন্দোলন। ক্ষীরোদপ্রসাদ কালাতিক্রমণ দোষ করিয়াও তাঁহার 'আলমগীর' ও 'চাঁদবিবি' নাটকে হিন্দু-মুসলিম মিলনগীতি গাহিয়াছেন। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির ধ্রুবপদই হইয়া উঠিয়াছিল দুই সম্প্রদায়ের মিলনবাণী। অবশ্য 'আলমগীর'-এ ক্ষীরোদপ্রসাদ 'আলমগীর' ও 'উদিপুরী'র চরিত্রে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে নাটকীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। এই ধারার তৃতীয়, এবং সম্ভবতঃ আজ পর্যন্ত বাংলা নাট্য-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ, নাট্যকার হইলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁহার প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'রানা প্রতাপসিংহ' ১৯০৫ সালের রচনা। 'দুর্গাদাস' (১৯০৫), 'নূরজাহান' (১৯০৮), 'মেবার পতন' (১৯০৮), 'সাজাহান' (১৯০৯), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১), 'সিংহল বিজয়' (১৯১৫) প্রভৃতি তাঁহার রচিত অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটক। তাঁহার প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'তারাবাঈ' (১৯০৩) নিতান্তই পরীক্ষামূলক ও বিশেষত্বহীন রচনা। 'রানা প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস' ও 'মেবার পতন' এই তিনটি নাটকের বিষয়বস্তু দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবাদ হইলেও দ্বিজেন্দ্র-লালের অন্যান্য নাটক ঐরূপ বাহ্য প্রেরণা হইতে মুক্ত। এই প্রসঙ্গে 'সাজাহান' ও 'চন্দ্রগুপ্ত'-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাটক হিসাবে ইহাদের বহু ত্রুটি রহিয়াছে। এই দুইটি নাটকের (দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য নাটকেরও বটে) সংলাপের ভাষা অতিমাত্রায় কাব্যধর্মী বলিয়া উহা নাট্যরসবিরোধী। অধিকন্তু সকল শ্রেণীর চরিত্রের মুখেই একই রূপ ভাষা চরিত্রগুলির বাস্তবতা নষ্ট করিয়াছে। উপকাহিনী গ্রন্থনেও দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যর্থ হইয়াছেন। সর্বোপরি নাটকের মধ্যে আদর্শবাদের প্রাধান্যের প্রবণতায় নাট্যকারের আত্মগুপ্তি-ধর্ম তিনি পালন করিতে পারেন নাই। তথাপি দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম নাট্যকার যিনি বাংলা নাটকের রূপ ও রীতি বিশেষভাবে মার্জিত করিয়া উহাকে বহুলাংশে সাহিত্যগুণ-

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল

সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি কেবল বিবৃতি-সর্বস্ব নহে, ঘটনার সংঘাতে এবং চরিত্র-দ্বন্দ্বে জীবনরসে ভরপুর। সাজাহান, চাণক্য ও নূরজাহান এই তিনটি চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি উচ্চ নাটকীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

এই পর্বের অন্যতম উল্লেখ্য নাট্যকার গিরিশচন্দ্র। সম্ভবত ক্ষীরোদ-প্রসাদের 'প্রতাপ আদিত্য' (১৯০৩) এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'রানা প্রতাপসিংহ' (১৯০৫) ও 'দুর্গাদাস' (১৯০৫) নাটকের জনপ্রিয়তাই তাঁহাকে 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯০৬), 'মীরকাশিম' (১৯০৬) এবং 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৭) নাটক রচনায় অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছিল। এই নাটকগুলির মূল সুর দেশপ্রেম। এই সকল নাটকে কালানৌচিত্য দোষের সঙ্গে তরল উচ্ছ্বাস এবং অস্বাভাবিকতা মিশ্রিত হইয়া নাটকগুলিকে মেলো-ড্রামায় পরিণত করিয়াছে। কিছু ঐতিহাসিক নাটক তিনি ইহার পুর্বেই রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি হইল 'আনন্দ রহো' (১৮৮১), 'চণ্ড' (১৮৯০), 'কালাপাহাড়' (১৮৯৬), 'সৎনাম' (১৯০৪) প্রভৃতি। 'আনন্দ রহো'তে আকবর, মানসিংহ প্রভৃতি কয়েকটি নাম ভিন্ন ঐতিহাসিকতা কিছুই নাই। নাট্যগুণ তো নাই-ই। 'চণ্ড' নাটকের উৎস 'রাজস্থান'। 'কালাপাহাড়' ও 'সৎনাম'-এ যৎসামান্য ঐতিহাসিক উপাদান মাত্র রহিয়াছে। তাঁহার এই নাটকগুলিতে যাত্রার প্রভাবও প্রচুর। ঐতিহাসিক নাট্যকার হিসাবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরেই তাঁহার আবির্ভাব। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'পুরুবিক্রম' রচিত হইয়াছিল ১৮৭৪ সালে, আর গিরিশচন্দ্রের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'আনন্দ রহো'র রচনার কাল ১৮৮১। অথচ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যাত্রার প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র 'সৎনাম' পর্যন্ত রচনায় যাত্রার প্রভাবের উর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। আসলে ইতিহাস ছিল গিরিশচন্দ্রের পক্ষে একটা বাহিরের আবরণ মাত্র। অন্তরালে তাঁহার শিল্পিমানসের গীতাভিনয়প্রবণতাই জয়ী হইয়াছে। অপরেশচন্দ্র ('অযোধ্যার বেগম'—১৯২১, 'মগের মুলুক—১৯২৭), প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ('ভাগ্যচক্র', 'চিতোরোদ্ধার') সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ('হিন্দুবীর', 'মোগল পাঠান' ও 'আলেকজাণ্ডার') ও নিশিকান্ত বসুরায় ('বঙ্গে বর্গী', 'দেবলাদেবী' ও 'ললিতাদিত্য') রচনারীতির দিক হইতে এই পর্বেরই নাট্য কার। তবে ইহারা গিরিচন্দ্রের যাত্রাশৈলী ত্যাগ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র

অনুসরণেই নাটক রচনা করিয়াছেন। এই পর্বের নাটক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রেরণায় 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'নূরজাহান' 'আলমগীর' প্রভৃতি সামান্য কয়েকটি মাত্র নাটক লিখিত হইয়াছে ; বেশীর ভাগ নাটকের মৌল প্রেরণা দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু-মুসলিম মিলন-বাণী। নাটক রচনায় কল্পনার অতিচার আছে, কালানৌচিত্য ও পাত্রানৌচিত্য দোষও রহিয়াছে। তবে গঠনের দিক হইতে নাটক আগের চেয়ে অনেক বেশী পরিচ্ছন্ন হইয়াছে। ভাষাও অধিকতর মার্জিত। ইহা ভিন্ন নাটকীয় চরিত্রে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির কিছুটা প্রয়াসও পরিলক্ষিত হয়। বাংলায় প্রথম ঐতিহাসিক নাটক ('কৃষ্ণকুমারী') রচিত হইয়াছিল শেকস্‌পীয়রের আদর্শে। নাট্যকার হয়তো সর্বাংশে সফল হন নাই, কিন্তু আদর্শটি সম্মুখেই ছিল। দ্বিতীয় পর্বের ঐতিহাসিক নাটকে কিন্তু সেই অনুসরণের দৃষ্টান্ত প্রায় অনুপস্থিত। সেখানে ঐতিহাসিক কাহিনীর আধারে দেশপ্রেমের তরল উচ্ছ্বাসেরই প্রাধান্য, না হয় তো কোনোরূপে একটা ঐতিহাসিক কাহিনীর সংলাপময় রূপ বিধৃত। কেবল দ্বিজেন্দ্রলালই দুই একটি চরিত্রে শেক্‌সপীয়রীয় দ্বন্দ্বের অবতারণা করিয়া কিঞ্চিৎ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। নাট্যবিচারে একমাত্র ভাষার অগ্রগতি ও কাহিনীর অধিকতর পরিচ্ছন্ন রূপদান ভিন্ন দ্বিতীয় পর্বের ঐতিহাসিক নাটক যে প্রথম পর্বের নাটক হইতে শিল্পগুণে খুব বেশী অগ্রসর হইয়াছে এমন কথা বলা চলে না।

অন্যান্য নাট্যকার

ঐতিহাসিক নাটকের তৃতীয় পর্বের সূত্রপাত করিলেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী তাঁহার 'দিগ্বিজয়ী' (১৯২৮) রচনার মাধ্যমে। তাঁহার এই একটিমাত্র ঐতিহাসিক নাটকে শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাট্যশৈলীর পরিবর্তে আধুনিক ইবসেনীয় নাট্যশৈলী অবলম্বিত হইল। ইবসেনীয় নাট্যশৈলীর বৈশিষ্ট্য এই যে, উহাতে নাট্যবর্ণিত কাহিনীর কাল খুবই সংক্ষিপ্ত হইয়া থাকে ; এমন কি, উহা একদিনের অথবা মঞ্চে যতক্ষণ ঘটনাটি ঘটে ততক্ষণেরও হইতে পারে। কারণ, এই পদ্ধতি মনে করে, নাটকীয় ঘটনা রহিয়া বসিয়া ঘটে না। উহা আকস্মিক ঝড়ের মতো, ক্ষণকালের জন্য আসিয়া একটা বিপর্যয় বা বিপ্লব ঘটাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। নাট্যকাহিনীর এইরূপ সংক্ষিপ্তিতে উহা দৃঢ়বদ্ধ ও সংহত হইয়া উঠে। এইরূপ নাটকে অঙ্ক-ভাগ থাকিলেও দৃশ্য-ভাগ বড় একটা থাকে না, এক একটি দৃশ্যেই এক-একটি অঙ্ক সমাপ্ত হয়। অন্তরঙ্গেও

তৃতীয় পর্বের ঐতিহাসিক নাটক : নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী

ইহা চরিত্রপ্রধান নাটক। সেই চরিত্র কেবল স্বীয় স্বভাবজাত দুর্বলতার জন্যই পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় না, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতও উহার প্রধান হেতু হইয়া থাকে। দিগ্বিজয়ীর নাদির শাহ্ চরিত্র এমনি একটি চরিত্র। এই পর্বে শেক্‌স্‌পীয়র হইতে আমরা আরও আধুনিক যুগে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এইরূপ আধুনিক নাট্যশৈলী পরবর্তী আর কোনো ঐতিহাসিক নাটকেই অনুসৃত হইল না। কেবল অতি সাম্প্রতিক কালে উৎপল দত্তের 'কল্লোল' নামক ঐতিহাসিক নাটকে এই রীতির অনুসরণ দেখা যায়। যোগেশচন্দ্রের পরবর্তী নাট্যকার মন্মথ রায়ের 'অশোক', 'মীরকাশিম', 'অমৃত অতীত' প্রভৃতি নাটকে দ্বিজেন্দ্র-রীতিই স্বীকৃত। শচীন্দ্রনাথের 'গৈরিক পতাকা','সিরাজদ্দৌলা' 'ধাত্রী পান্না', 'রাষ্ট্রবিপ্লব' প্রভৃতি নাটকও প্রাচীনপন্থী। 'সিরাজদ্দৌলা'র মতো আধুনিক কালের নাটকেও যাত্রাশৈলীর মিশ্রণ আমাদিগকে বিস্মিত করে। এ বিষয়ে মহেন্দ্র গুপ্ত একেবারে চূড়ান্ত করিয়াছেন। তিনি পরিপূর্ণরূপে গিরিশ-যুগে ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাটকে ভাবের উচ্ছ্বাস ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহা ছাড়া কালাতিক্রমণ দোষ, অবাস্তব এবং অবান্তর চরিত্র-চিত্রণ তো আছেই; আর আছে হাস্যকৌতুকের নামে নিম্নশ্রেণীর ভাঁড়ামি। সুতরাং তৃতীয় পর্ব শুধু আমরা নামেই বলিলাম, বাস্তবে উহা দ্বিতীয় পর্বের রীতিরই রকমফের। ঐতিহাসিক নাটক মহেন্দ্র গুপ্ত পর্যন্ত আসিয়াই থামিয়াছে। পরবর্তী নাট্যকারগণ ঐরূপ নাটক রচনায় কোনো উৎসাহই বোধ করিতেছেন না। এক্ষণে একমাত্র সামাজিক নাটকই সৃষ্ট হইতেছে। 'কল্লোল' যে ইহার ব্যতিক্রম সে-কথা পূর্বেই বলিয়াছি। আধুনিক জনরুচিও ঐতিহাসিক নাটকে আর তেমন কৌতূহল বোধ করে না, সম্ভবত এই কারণেই ঐতিহাসিক নাটকের উপর সম্প্রতি যবনিকাপাত হইয়াছে। ভবিষ্যতে উহা আবার কবে উত্তোলিত হইবে অথবা আদৌ উত্তোলিত হইবে কি না, তাহা ভবিষ্যৎই বলিতে পারে।

আধুনিক কালের নাট্যকারগণ

১৭। সূচনাকাল হইতে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলা পারিবারিক ও সামাজিক নাটকের ক্রমবিকাশের বিবরণ লিখ।

উত্তর। বাংলা নাটকের ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যায়, উদ্ভবকালে বাঙালী নাট্যকারগণ শেকস্‌পীয়রের ঐতিহাসিক নাটকাবলী দ্বারাই সমধিক

প্রভাবিত হইলেও প্রথম অভিনীত বাংলা নাটক কিন্তু ঐতিহাসিক নাটক নহে, উহা সামাজিক নাটক। রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রথম নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) এই গৌরবের অধিকারী। নাটক হিসাবে নাটককটি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু শূন্যতার মধ্যে যে ডাঙা জাগিয়া উঠিতেছে, ঐ নাটকে উহারই আভাস আছে। সমাজে কৌলীন্য প্রথার অপকারিতা নাটকটির বিষয়বস্তু। কিন্তু নাটকটির সুর ব্যঙ্গপ্রধান। অথচ ইহাকে ঠিক প্রহসনও বলা চলে না। উহা নাটক-প্রহসনের মাঝামাঝি একটা বস্তু। এই পর্বের প্রথম দিককার নাটকগুলি সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছিল। নাট্যকারগণও ইহা অস্বীকার করেন নাই। এই সকল নাটকে সংস্কৃত নাট্যশৈলী, যাত্রাশৈলী সবকিছুই অনুসৃত হইয়াছিল। ভাষাও ছিল অধিকাংশ স্থলে সংস্কৃতগন্ধী। অবশ্য নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখের ভাষা ছিল অনেকখানি বাস্তব। 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-এর দুই বৎসর পরে উমেশচন্দ্র মিত্র 'বিধবা বিবাহ' (১৮৫৬) নাটক রচনা করেন। ইহাতে বিধবাদের দুঃখের করুণ চিত্র ছিল। সুতরাং একদিক হইতে আমরা ইহাকেই প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক বলিতে পারি। সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে তখন 'বিধবোদ্বাহ' (১৮৫৬), 'বিধবা-মনোরঞ্জন' (১৮৫৬), 'সপত্নী' (১৮৫৮), 'কুলীন-কায়স্থ' (১৮৬১) প্রভৃতি নাটক রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই নাটকগুলিকে আমরা অতি নগণ্য বলিয়া মনে করিতে পারি। মধুসূদন উৎকৃষ্ট সামাজিক প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সামাজিক নাটক নহে। সামাজিক নাটকের নাট্যকার হিসাবে অতঃপর যাঁহার নাম করিতে হয়, তিনি দীনবন্ধু মিত্র। তাঁহার রচিত প্রথম নাটকই (নীলদর্পণ'—১৮৬০) সামাজিক নাটক। কিছু শৈল্পিক দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও 'নীলদর্পণ'কেই আমরা প্রথম যথার্থ ও সার্থক বাংলা সামাজিক নাটক বলিতে পারি। এই নাটকটিও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কিন্তু ইহার ক্ষেত্র আরও পরিসর, আরও গভীর। যে অর্থনৈতিক শোষণে সমাজের মানুষগুলার মধ্যে বিপর্যয় নামিয়া আসে, 'নীলদর্পণ'-এ দুইটি পরিবারকে উহারই প্রতীক করিয়া সেই শোষণের ও উহার করুণ পরিণতির চিত্র গভীর বাস্তবতার সঙ্গে অঙ্কিত হইয়াছে। সমাজ-শক্তির তাড়নাতেই মানুষের জীবনে সেখানে

নাট্যসাহিত্যের সূচনায় সামাজিক নাটক

প্রথম পর্বের সামাজিক নাটক : নাট্যকার রামনারায়ণ, উমেশচন্দ্র

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র

বিষাদের ম্লান ছায়া নামিয়া আসিয়াছে, নাটকের চরিত্রগুলি উহারই আবর্তে ঘুরপাক খাইয়াছে, এইজন্যই ইহা পারিবারিক নাটক নহে, সামাজিক নাটক। দীনবন্ধু সামাজিক নাটকের একটা সুস্পষ্ট রূপ দিলেন। তাঁহার হাতে সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলা জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার 'লীলাবতী' (১৮৬৭) পারিবারিক নাটক হইয়াও রোম্যান্টিক কমেডিতে পর্যবসিত হইয়াছে। 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) প্রহসন হইলেও নাটক-লক্ষণাক্রান্ত, সুতরাং উহাকে আমরা নাটকই বলিব। এই নাটকেই সর্বপ্রথম আমরা নায়ক-চরিত্রের মধ্যে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় পাইলাম। প্রথম পর্বের নাটকগুলির বিশেষত্ব হইল, উহাদের অধিকাংই সামাজিক নাটক, পারিবারিক নহে। উহারা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত—সমাজ-সংস্কারের জন্য রচিত। 'নীলদর্পণ' ইহার ব্যতিক্রম। উহাতে সামাজিক নাটকের ক্ষেত্র যেমন অধিকতর প্রসারিত, চরিত্র চিত্রণেও তেমনি বাস্তবতাবোধের পরিচয় বিধৃত। 'সধবার একাদশী'তে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় রহিয়াছে। সামাজিক নাটকের এই অগ্রগতি দীনবন্ধুর অসামান্য নাট্যপ্রতিভার স্বাক্ষরবাহী।

দ্বিতীয় পর্বের সামাজিক নাটক: নাট্যকার উপেন্দ্র দাস

দ্বিতীয় পর্বে পারিবারিক নাটক রূপে আমরা পাইতেছি উপেন্দ্রনাথ দাসের দুইটি নাটক—'শরৎ-সরোজিনী' (১৮৭৪) ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' (১৮৭৫)। দুইটি নাটকই নিকৃষ্ট শ্রেণীর মেলোড্রামা। ঐগুলিতে 'লোমহর্ষক ঘটনা, বন্দুকপিস্তল ছোড়াছুড়ি, ডাকাতি, খুন-জখম, গোরাপ্রহার, সাহেবশায়েস্তার জন্য নায়ক, বিশেষত নায়িকার যথেচ্ছা পিস্তলবর্ষণ প্রভৃতি ঘটনার সাহায্যে' রোমাঞ্চ সৃষ্টির প্রবণতাই সমধিক পরিস্ফুট। প্রথম পর্বের নাটক হইতে এই দুইটি যে কোনো অগ্রগতির সূচনা করিয়াছে তাহা বোধ হয় না। তবে বিষয়বস্তু আর একটু প্রসারিত—স্বাদেশিকতার চেতনা উহাতে সঞ্চারিত। এই পর্বের দ্বিতীয় উল্লেখ্য নাট্যকার হইলেন গিরিশচন্দ্র। তাঁহার প্রথম পারিবারিক নাটক 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯)। অবশ্য ইহার পূর্বে 'সরলা' অভিনীত হইয়া প্রচুর জনসমাদর লাভ করিয়াছিল। কিন্তু উহা ছিল 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের আংশিক নাট্যরূপ। আমরা এখানে কেবল মৌলিক নাটকের কথা বলিতেছি। 'প্রফুল্ল' মেলোড্রামা হইলেও ইহাই উল্লেখযোগ্য প্রথম পারিবারিক নাটক। সঠিক কোনো সমাজসমস্যা নহে, যৌথ পরিবারে ভাঙনের কাহিনীই ইহার বিষয়বস্তু।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র

এই নাটকের বৈশিষ্ট্য হইল, ইহাতে নাট্যকার শেক্স্পীয়রীয় ট্র্যাজিডির অনুকরণে নায়ক-চরিত্রের দুর্বলতার ছিদ্রপথে তাঁহার করুণ পরিণতি আঁকিতে চাহিয়াছেন। প্রয়াস কতখানি সফল হইয়াছে সে আলাদা কথা, আমরা কেবল নাটকের গতি-প্রকৃতির বিষয় বলিতেছি। নাটকের বিবর্তন ধারায় ইহা একটি প্রধান আলোচ্য বস্তু। অন্যান্য বিষয়ে গিরিশচন্দ্র উপেন্দ্রনাথ দাস, কি তাঁহারও পূর্ববর্তী দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'-এর দ্বারা প্রভাবিত। ইহাতেও মৃত্যু, মস্তিষ্কবিকৃতি, হত্যা প্রভৃতি একসঙ্গে ভিড় করিয়া আসিয়াছে। প্রধান চরিত্রগুলি আভ্যন্তরীণ অসংগতিহেতু অপরিপূর্ণ। তাঁহার 'বলিদান' (১৯০৫) এবং 'শাস্তি কি শান্তি' (১৯০৮) নাটকও অনুরূপ দোষতুষ্ট। কেবল একটি বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের নাটক পূর্ববর্তী নাটকগুলি অপেক্ষা প্রগতিশীল। ইহা নাটকীয় সংলাপের ভাষা। গিরিশচন্দ্রই সর্বপ্রথম সামাজিক ও পারিবারিক নাটকে সকল শ্রেণীর চরিত্রেই বাস্তবানুগ ভাষা সংযোজিত করিয়াছেন। এ বিষয়ে পরবর্তী নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। গিরিশচন্দ্রের অন্যান্য ত্রুটি তো দ্বিজেন্দ্রলালের 'পরপারে' (১৯১২) এবং 'বঙ্গনারী' (১৯১৬) নামক পারিবারিক নাটক দুইটিতে রহিয়াছেই, উহার সঙ্গে কাব্যধর্মী সংলাপ দুইটিকেই অবাস্তব করিয়া তুলিয়াছে। অপরেশচন্দ্রের 'শুভদৃষ্টি' (১৯১৫) ও 'ছিন্নহার' (১৯২০); ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙালী', প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'জয়-পরাজয়'; নিশিকান্ত বসুরায়ের 'পথের শেষে' একই ধারা বাহিয়া চলিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় দ্বিজেন্দ্রলাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত দুই-একটি ভিন্ন সামাজিক নাটক আর লিখিত হয় নাই, যাহা হইয়াছে তাহা পারিবারিক বা গার্হস্থ্য নাটক।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল এবং অন্যান্য কয়েকজন

পারিবারিক নাটকে তৃতীয় পর্বের সূচনা করেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তাঁহার 'ঝড়ের রাতে' নাটকে সর্বপ্রথম পারিবারিক নাটকের ক্ষেত্রে ইবসেনীয় শৈলী অবলম্বিত হইল। নাট্যকাহিনীর কালসংক্ষিপ্তিও লক্ষণীয়। তাঁহার নাটকে নাটকীয় চরিত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথাই সোচ্চারে ঘোষিত হইয়াছে, এ বিষয়ে তিনি পারিবারিক নাটকে আধুনিক মানসের স্রষ্টা। তাঁহার অন্যান্য পারিবারিক নাটকগুলি ('স্বামী-স্ত্রী', 'তটিনীর বিচার', 'সংগ্রাম ও শান্তি', 'নার্সিং হোম', 'কাঁটা ও কমল' প্রভৃতি) বিরলদৃষ্ট সমাজের অতি-নাটকীয় চরিত্রের সমন্বয়ে এক কিম্ভূতকিমাকার সৃষ্টি। কিন্তু শচীন্দ্রনাথের

তৃতীয় পর্বে সামাজিক তথা পারিবারিক নাটক

নাটকে যতখানি আধুনিক মানসের প্রতিফলন এবং মার্জিত রুচির পরিচয় আছে, জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'রীতিমত নাটক', 'পি. ডব্লিউ. ডি', 'সিঁথির সিঁদুর', 'আঁধারে আলো', 'ডাক্তার শুভংকর' প্রভৃতি নাটকে তাহাও নাই। তাঁহার নাটকে কতকগুলি অবাস্তব চরিত্র আপনার খেয়ালখুশীমতো যা-তা করিয়া চলিয়াছে, কোনো সুগভীর কারণপরম্পরা উহাদের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল নহে। মনে হয়, আমরা যেন এক পাগলামির জগতে প্রবেশ করিয়াছি। কেবল ভাষা ভিন্ন সব দিক হইতেই ইহারা প্রথম পর্বের নাটকগুলিরও পশ্চাদ্‌গামী। মহেন্দ্রগুপ্তের 'স্বর্গ হতে বড়' এবং 'কঙ্কাবতীর ঘাট' অতি-নাটকীয়তায় পর্যবসিত। ইহারই মধ্যে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মেঘমুক্তি', 'মাটির ঘর', 'বিশ বছর আগে', 'রক্তের ডাক', 'খেলা ভাঙার খেলা', 'খবর বলছি', 'ক্ষুধা' প্রভৃতি নাটকে লেখক সংলাপ রচনায় বিশেষ মুনশীয়ানা দেখাইয়াছেন। বিষয়বস্তুর দিক হইতে কয়েকটি নাটক পুরাতনেরই আধুনিক রূপ। তৃতীয় পর্বে কোনো সামাজিক নাটক সৃষ্ট হয় নাই, কেবল পারিবারিক নাটকই রচিত হইয়াছে। কিন্তু শৈল্পিক বিচারে কোনো নাটকই রসোত্তীর্ণ নহে। গভীর জীবনবোধের পরিচয় কোনো নাটকেই নাই। বিবর্তনের পথে অগ্রগতি ঘটিয়াছে শুধু ভাষার।

চতুর্থ পর্বে আধুনিক সমাজ-সচেতন নাটক

এই শ্রেণীর চতুর্থ পর্বের নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল তীক্ষ্ণ সমাজ-সচেতনতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধারম্ভের বছর পাঁচেক পর হইতেই উহার সূত্রপাত। এই পর্বের সামাজিক নাটক বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' (১৯৪৪)। কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাবাহী যে-মুনাফাশিকারীর দল কৃত্রিম অন্নসংকট সৃষ্টি করিয়া পঞ্চাশের মন্বন্তর ঘটাইয়াছিল, নাটকটিতে উহাই গভীর বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। এই নাটকে যেন 'নীলদর্পণ' নূতনভাবে প্রতিধ্বনিত হইল। এই পর্বের সকল নাট্যকারই গভীরভাবে সমাজসচেতন; তাঁহাদের নাটকে বাস্তবতাও উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। আগেকার কোনো পর্বেই এরূপ বাস্তবতাবোধ দেখা যায় নাই। অধিকন্তু কল্পনা ও রোম্যান্টিকতার অতিচার এই পর্বের নাটকে নাই, অবাস্তব ভাবালুতারও স্থান নাই। মোট কথা, এই পর্বের নাটক বহুলাংশে নাট্যগুণসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। তবে একটি বিষয়ে ন্যূনতা দেখা যায়। নাটকীয় চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের অভাব বেশী মাত্রায় এই সকল নাটকে অনুভূত হয়। বিজন ভট্টাচার্যের অন্যান্য নাটক 'মরা চাঁদ', 'গোত্রান্তর'

প্রভৃতি। এই পর্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাটক তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার'। একমাত্র এই নাটকেই তীক্ষ্ণ সমাজবোধের সঙ্গে নায়ক-নায়িকার চরিত্রে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব অসামান্য দক্ষতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। ইহাকে শ্রেষ্ঠ বাংলা সামাজিক নাটক বলা যাইতে পারে। তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক', 'উলু খাগড়া', 'দুঃখীর ইমান'ও ভালো নাটক। এই পর্বের অন্যান্য নাটক হইল জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'পরিচয়' ও 'প্রশ্ন'; সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী', 'ডাউন ট্রেন', 'মৌ-চোর'; উৎপল দত্তের 'অঙ্গার' প্রভৃতি। এই পর্বের নাটকের আর-একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। উহা নাট্যকাহিনীর বিষয়বস্তুর পরিধি-বিস্তার। এক্ষণে নাটক উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের গণ্ডি পার হইয়া মাটির মানুষের বড় কাছাকাছি নামিয়া আসিয়াছে। কৃষক বা শ্রমিক অথবা শোষিত দরিদ্র নিম্নবিত্ত মানুষ বর্তমানে নাটকের নায়কের স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা ছাড়া, বহু নাটকই বর্তমানে আর এক-নায়ক-নির্ভর নহে। বহু নায়কের কলকণ্ঠে মুখর ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে চঞ্চল এখনকার নাটক এক গণতান্ত্রিক চরিত্র অর্জন করিয়াছে। মোট কথা, সামাজিক ও পারিবারিক নাটকের বিবর্তন ধারায় চতুর্থ পর্বের নাটকে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও প্রগতি হইয়াছে। চারিত্রিক দ্বন্দ্বের ন্যূনতা দূরীভূত করিয়া যেদিন এই শ্রেণীর নাটক রচিত হইবে, সেইদিনই সামাজিক ও পারিবারিক নাটকের ক্ষেত্রে পঞ্চম পর্বের সূচনা ঘটিবে। আমরা সাগ্রহে সেই দিনেরই অপেক্ষা করিতেছি।

চতুর্থ পর্বের নাটক : নাট্যকার—বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী প্রভৃতি

১৮। সূচনাকাল হইতে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলা প্রহসনের বিবর্তনধারার পরিচয় দাও।

উত্তর। সূচনাকাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা নাটকের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, বাঙালী নাট্যকারগণ প্রহসন রচনায় যে-পরিমাণ প্রবণতা দেখাইয়াছেন এবং উহাতে যতখানি শৈল্পিক সাফল্য লাভ করিয়াছেন, নাটকের আর কোনো শাখায় তেমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ, সামাজিক প্রহসনই বাঙালীর জাতিগত রসপিপাসার অনুকূল বলিয়া ঐ জাতীয় নাটক রচনায় বাঙালী নাট্যকারগণের সহজাত নৈপুণ্য স্বতঃই পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রথম উল্লেখযোগ্য বাংলা নাটক রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'ও তাই নাটক-লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও

প্রহসন। বাঙালীর সহজ রসিকতার প্রমাণ আমরা যাত্রার মধ্যেই পাইয়াছিলাম। উহার প্রভাব নাটকেও অনিবার্যরূপে সঞ্চারিত হইয়াছে। তাই দেখিতে পাই, অবান্তর হইলেও ঐ নাটকে যাত্রার ভাঁড়ামি আমদানি করা হইয়াছে। নাপিতানী প্রসঙ্গ, দেবল ও রসিকার প্রসঙ্গ, মহিলা ও মাধুরীর কথোপকথন প্রভৃতি প্রায় অশ্লীল হইলেও সেদিনের নানা শ্রেণীর দর্শকের আমোদের কারণ হইয়াছে। সমাজ-সংস্কার-বিষয়ক তাঁহার 'নবনাটক'ও প্রায় প্রহসন পর্যায়ের। ইহাতেও রঙ্গরসের প্রাচুর্য ছিল এবং বাবু যুগের রসিকেরা ঐসকল স্থূল ব্যঙ্গবিদ্রূপ ভাঁড়ামিতেই তৃপ্তি লাভ করিতেন। রামনারায়ণের অপর কয়েকটি অনুল্লেখ্য প্রহসন হইল 'যেমন কর্ম তেমন ফল', 'উভয় সংকট' (১২৭৬) ও 'চক্ষুদান' (১২৭৬)। কালীপ্রসন্নের প্রথম নাটক 'বাবু'ও (১৮৫৪) প্রহসন। ঐ নাটকে তৎকালীন কলিকাতার বাবু-সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যঙ্গবাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সত্যকার প্রহসন রচনা করিলেন মধুসূদন। 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০) এই দুইটি প্রহসন রচনায় মধুসূদন প্রথম শ্রেণীর নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। প্রথমটিতে 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর প্রতি ব্যঙ্গ বর্ষিত হইয়াছে, দ্বিতীয়টিতে ধর্মের ভেকধারী ব্রাহ্মণ জমিদারের লাম্পট্যকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে তিনি ক্ষতবিক্ষত করিয়াছেন। অথচ কোথাও উহা প্রচারধর্মী হয় নাই। মধুসূদনই নিম্নরুচির ভাঁড়ামিকে নির্মল হাস্যরসের স্তরে উন্নীত করিয়াছেন—প্রহসনের বিবর্তনধারায় ইহাই সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। 'মধুসূদনের প্রহসনে চরিত্রগুলি তাহাদের নিজেদের অসংগতির আভ্যন্তরীণ প্রেরণায়, তাহাদের চলা বলা ও করার মধ্য দিয়া নিজেরাই স্বাভাবিকভাবে হাস্যাস্পদ এবং উপভোগ্য হইয়া উঠে।' উচ্চাঙ্গের প্রহসনের ইহাই বৈশিষ্ট্য। ঐ প্রহসন দুইটিতে মধুসূদন নাটকীয় চরিত্রগুলির মুখে যে-ভাষা দিয়াছেন উহা এমনই বাস্তবধর্মী যে উহারই মধ্যে আমরা তাঁহার অভ্রান্ত নাট্যদৃষ্টির পরিচয় লাভ করি। প্রহসনে অম্লমধুর রসের এমন সরস পরিবেষণ বিরল। নাট্যগুণের দিক হইতে সম্ভবত মধুসূদনের প্রহসনকে আজিও কোনো বাঙালী প্রহসনকার অতিক্রম করিতে পারেন নাই। মধুসূদনের ধারা অনুসরণ করিয়াই দীনবন্ধু মিত্র বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে প্রহসনকে সুপ্রতিষ্ঠ করিলেন। তাঁহার 'বিয়ে

প্রথম পর্বের প্রহসন : নাট্যকার রামনারায়ণ

নাট্যকার মধুসূদন

পাগলা বুড়ো'তে (১৮৬৬) উৎকট বিবাহপ্রবণতাকে উপলক্ষ করিয়া এক বৃদ্ধের বিড়ম্বনার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। 'জামাই বারিকে' (১৮৭২) ঘরজামাইদের লইয়া রঙ্গরস করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রহসন 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬)। ইহার বৈশিষ্ট্য হইল—প্রহসন হইয়াও ইহা নাট্যধর্মী। ইহাতে 'একেই কি বলে সভ্যতা'র প্রভাব থাকিলেও নাটকটি স্বীয় বৈশিষ্ট্যে রসোজ্জ্বল। এই নাটকেও তৎকালীন ইংরেজীশিক্ষিত স্বধর্মভ্রষ্ট কদাচারী যুবসমাজকে ব্যঙ্গ করা হইরাছে। 'নিমচাঁদ' ঐ সমাজের প্রতিভূ। নিমচাঁদ চরিত্র অঙ্কনে দীনবন্ধু যে নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা যে-কোনো শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের ঈর্ষার বস্তু। মদ্যপায়ী অসংযত নিমচাঁদের আত্মসমালোচনায় যেন তাহার পীড়িত হতাশ আত্মাই ভগ্ন বাদ্যযন্ত্রের মতো করুণ হইয়া উঠিয়াছে। দীনবন্ধুর প্রহসনের বৈশিষ্ট্যই এই যে, উহাতে ব্যঙ্গের পশ্চাতে সহানুভূতি ও সহৃদয়তার স্পর্শ থাকে। এই বৈশিষ্ট্য আজ পর্যন্ত আর কোনো প্রহসনকারের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য ভাবে দেখা যায় নাই। অতঃপর প্রহসনকাররূপে আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাম করিতে পারি। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২), 'এমন কর্ম আর করব না' বা 'অলীক বাবু' (১৮৭৭), 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪), 'হিতে বিপরীত' (১৮৯৬), 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' (১৯০২) প্রভৃতি তাঁহার রচিত প্রহসন। 'হঠাৎ নবাব' এবং 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' প্রহসন দুইটি ফরাসী নাট্যকার মলিয়ের-এর প্রহসন অবলম্বনে রচিত। তাঁহার প্রহসনে ব্যঙ্গ নাই, কেবল রঙ্গই আছে।

নাট্যকার দীনবন্ধু

নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

দ্বিতীয় পর্বের প্রথম প্রহসনকার হইলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নাটকে তিনি যেমন আধুনিকতাকে অস্বীকার করিয়া মধ্যযুগীয় রক্ষণশীলতা ও ধর্মীয় মানসের বন্দনায় মুখর হইয়াছিলেন, প্রহসনেও তেমনি মধুসূদন-দীনবন্ধু যে-সম্ভাবনার স্বর্ণদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র সে-পথে প্রবেশ না করিয়া পঙ্করংয়ের পঙ্ক ছড়াইয়াই রসের দোললীলায় মাতিলেন। 'ভোটমঙ্গল'(১৮৮২),'বেল্লিক বাজার' (১৮৮৬), 'সপ্তমীতে বিসর্জন' (১৮৯৩), 'বড়দিনের বখ্‌শিস্' (১৮৯৩), 'সভ্যতার পাণ্ডা' (১৮৯৪), 'য্যায়সা বা ত্যায়সা (১৯০৬) প্রভৃতি তাঁহার রচিত প্রহসন। "এগুলি নাট্যকারের অক্ষমতার জন্যই হাস্য উদ্রেক করে, ইহার ঘটনা বিরক্তিকর এবং সংলাপ নীচ পল্লী হইতে আমদানি করা;

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র

হইয়াছে। এই সমস্ত নাটিকা বা 'পঞ্চরং' পাঠেই ঘৃণা জন্মে; সে যুগের দর্শকগণ যে কী করিয়া ধৈর্য ধরিয়া নাটমঞ্চে এই সমস্ত অপথ্যগুলিকে হজম করিত, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় (শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।" গিরিশ-চন্দ্রের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য প্রহসন-রচয়িতা হইলেন অমৃতলাল বসু। তাঁহার রচনার মধ্যে 'চোরের উপর বাটপাড়ি' (নিম্নরুচির এই প্রহসনটিতে বোকাৎসিয়ো-রচিত 'ডেকামেরন' পুস্তকের একটি গল্পের ছায়া আছে), 'ডিস্‌মিস্‌' (ইহাতে হিন্দু স্ত্রীর ঘোমটা না-দেওয়া সম্পর্কে ব্যঙ্গ আছে), 'তাজ্জব ব্যাপার' (ইহাতে পুরুষ জাতির কাল্পনিক দুর্দশার ভিত্তিতে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতাকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে; নাট্যকাহিনীতে দেখানো হইয়াছে—পুরুষেরা অন্দর মহলের কর্মে ব্যস্ত আর নারীরা পুরুষসুলভ কর্মে মত্ত), 'চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে' (১৮৮৪), 'বিবাহ বিভ্রাট' (১২৯১)—অল্প শিক্ষিত বাঙালী যুবকের বিলাতে গিয়া সাহেব হইবার নেশা ও বাঙালী মেয়ের ইংরেজী শিক্ষা পাইয়া মেম সাজিবার ইচ্ছাকে ইহাতে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে), 'কৃপণের ধন' (১৯০০), 'একাকার' (১৮৯৪)--ইহাতে জাতিভেদপ্রথাকে সমর্থন করা হইয়াছে), 'গ্রাম্য বিভ্রাট' (১৮৯৭—ইহাতে গ্রামে মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন উপলক্ষে দলাদলিকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে), 'বাবু' (১৮৯৩—নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ইহার ব্যঙ্গের প্রধান লক্ষ্য), 'অবতার' (১৯০১), 'তিলতর্পণ,' 'দ্বন্দ্বে মাতনম্‌' (১৯২৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচনায় বিদ্রূপ-কশাঘাতের তীব্রতা ছিল, বাগ্‌বৈদগ্ধ্যও ছিল, নাটকীয় সংস্থানের কৌশলনৈপুণ্যও ছিল। যাহা ছিল না তাহা হইল আধুনিকতার প্রতি সহানুভূতি। সর্ববিষয়ে তিনি ছিলেন রক্ষণশীল, কোনোরূপ প্রগতিকেই তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। অথচ মধুসূদন যেমন উগ্র আধুনিকতাকেও ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তেমনি সনাতনতার ভণ্ডামিকেও বিদ্রূপ করিয়াছেন। এইরূপ সমদৃষ্টির অভাব ছিল অমৃতলালে। প্রহসন রচনার প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়াশীল শিল্পি-মানসের জন্যই অমৃতলালের কোনো আকর্ষণ আজিকার যুগে নাই। দ্বিজেন্দ্র-লালও এই পর্বেরই প্রহসনকার। তাঁহার 'কল্কি-অবতার' (১৮৯৫), 'বিরহ' (১৮৯৭), 'ত্র্যহস্পর্শ' (১৯০০), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০২), 'পুনর্জন্ম' (১৯১১), 'আনন্দ-বিদায়' (১৯১২) প্রভৃতি প্রহসন যে খুব সার্থক রচনা, এমন কথা বলা চলে না। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণের ভিত্তিতে

দ্বিতীয় পর্বের প্রহসন: নিম্নরুচির হাস্যরস

নাট্যকার অমৃতলাল বসু

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল

রচিত 'আনন্দ-বিদায়' দ্বিজেন্দ্র-রচনার কলঙ্ক বিশেষ। তবে তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অমর হাসির গানগুলিকে প্রহসন-কয়টির মধ্যে ব্যবহার করায় উহাদের আকর্ষণ কিছুটা বাড়িয়াছে মাত্র। দ্বিজেন্দ্রলালের পর হইতেই বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে প্রহসনের প্রভাব কমিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর প্রতিভাও কৌতুক নাট্য রচনায় নিয়োজিত হইয়াছিল। তিনি ঘটনাগ্রন্থন ও চরিত্রচিত্রণে অসাধারণ দক্ষতা দেখাইতে না পারিলেও ভদ্র মার্জিত রুচির নির্মল কৌতুক পরিবেষণ করিয়া প্রহসনকে ভাঁড়ামির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কৌতুক নাটক ও রঙ্গ নাট্যের মধ্যে প্রধান 'গোড়ায় গলদ' ও 'চিরকুমার সভা'। 'গোড়ায় গলদ' ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে লেখা। ইহার পরবর্তী অভিনয়-যোগ্য সংস্করণ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয় 'শেষরক্ষা' নামে। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭), 'হাস্যকৌতুক', 'ব্যঙ্গকৌতুক' (১৯০৭), 'প্রজাপতির নির্বন্ধে'র নাট্যরূপ 'চিরকুমার সভা' (১৯২৬) বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রহসন। নানা খেয়ালী চরিত্রের সমাবেশে, কৌতুকস্নিগ্ধ ঘটনা সন্নিবেশে, নির্মল হাসির উৎসারে এবং বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের অপূর্ব মনোরমতায় রবীন্দ্রনাথের প্রহসন অফুরন্ত আনন্দের উৎস।

নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ

প্রহসন সাহিত্যের তৃতীয় পর্বে রচয়িতা ও রচনার সংখ্যা বড় কম। অপরেশচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া শচীন্দ্রনাথ পর্যন্ত খানকয়েক প্রহসন রচিত হইয়াছে। ভূপেন্দ্রনাথের 'কেলোর কীর্তি', 'বেজায় রগড়' প্রভৃতি এবং নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাতকানা'ই উল্লেখ্য। এই যুগের একজন শক্তিমান নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ মৈত্র। ইঁহার রচিত 'মানময়ী গার্লস স্কুল' (১৯০২) কালজয়ী প্রহসনরূপে প্রতিষ্ঠিত। ইহা নাটক লক্ষণাক্রান্তও বটে। নরনারীর স্বাভাবিক আকর্ষণের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি কৌতুকপূর্ণ নাটকীয় সংস্থানের ভিতর দিয়া অপূর্ব ব্যঞ্জনা লাভ করিয়াছে। অথচ নির্মল হাস্যের ফোয়ারা যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রহসনখানির ভাষা, বাগ্‌ভঙ্গি, দৃশ্যবিভাগ এবং চরিত্রচিত্রণ সবই আধুনিক শিল্পগুণসম্পন্ন। এই পর্বের অন্যতম প্রহসনকার প্রমথনাথ বিশি। তাঁহার 'ঋণং কৃত্বা' (১৯৩৫), 'ঘৃতং পিবেৎ' (১৯৩৯), 'মৌচাকে ঢিল' (১৯৩৮), 'পারমিট' প্রভৃতি প্রহসনে ব্যঙ্গের জ্বালা কিছু অধিক

তৃতীয় পর্বের প্রহসন : রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

প্রমথনাথ বিশি, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রভৃতি

হইলেও উগদের তির্যক রঙ্গরস উপভোগ্য। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'সেই তিমিরে' ও 'তাই তো' প্রহসন দুইখানির নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সংলাপ-মাধুর্য অনুপম। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়', এবং 'মেসনম্বর ৪৯' প্রভৃতিও গতানুগতিক প্রহসন হিসাবে সুন্দর।

অতি-বর্তমানে প্রহসনের ধারাটি ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া আসিতেছে। আধুনিক যুগের দুঃখদারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক দুঃসহ পীড়নে বাঙালীর মুখের হাসি ও সহজাত রঙ্গরসিকতার উৎসমুখে শুষ্কতার পাষাণ চাপা পড়িয়াছে। প্রহসন-দৈন্যের মূল সম্ভবত এইখানে। শম্ভু মিত্রের 'কাঞ্চনরঙ্গ', গঙ্গাপদ বসুর 'মহাগুরুনিপাত' প্রভৃতি দুই একখানি প্রহসন শূন্যতার মরুবালুকায় দুই চারিটা বৃষ্টিবিন্দুর মতো সচকিত করে মাত্র। কবি বলিয়াছিলেন "এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা"। কিন্তু এখন আর রঙ্গ নাই। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার যুগে উৎকৃষ্ট প্রহসন রচনার পরিবেশ সৃষ্ট হয় না। বাঙালীর মুখে কবে হাসি ফুটিবে সেই প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতে হইবে।

সাম্প্রতিক প্রহসন-দৈন্য

প্রশ্নাবলী

১। বাংলা নাটকের ক্রমবিকাশে মধুসূদন ও দীনবন্ধুর প্রভাবের পরিমাণ নির্ণয় কর। (65 B.A.)

২। ১৮৫৪ হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা নাটকের যে পরিণত রূপ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এই যুগের মুখ্য নাটকগুলি অবলম্বন করিয়া তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। (65 B.A.)

৩। দীনবন্ধু মিত্রের যে-কোন নাটকের পরিচয় দিয়া ব্যঙ্গাত্মক নাট্যরচনায় তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দাও। (63 B.A.)

৪। মধুসূদন হইতে গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা নাটকের ধারাটি অনুসরণ কর। (63 B.A.)

৫। বাংলা নাটকের আদিপর্বের (১৮৫২-৭২) ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। তোমার মতে এই পর্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কে? তাঁহার রচিত নাট্যসমূহের দোষগুণ বিচার কর। (63 Hons.)

৬। বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে রামনারায়ণ, মধুসূদন ও দীনবন্ধুর স্থান নির্দেশ কর। (63 B.A.)

৭। বাংলা নাটকরচনার উদ্যোগপর্বের বিবরণ দিয়া মধুসূদনের হাতে কিভাবে ইহার সার্থকতা দেখা দিল তাহার একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত দাও। (62 B.A.)

৮। দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যপ্রতিভার সম্যক পরিচয় দাও। (61 B.A.)

৯। বাংলা নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্বের মূল্য নির্ধারণ কর। (66 M.A.)

১০। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির দোষগুণ বিচার করিয়া বাংলা নাটকের ইতিহাসে তাঁহার স্থান নির্ণয় কর। (64 M.A.)

১১। বাংলা নাটক রচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দান কতখানি এবং সে দানের বৈশিষ্ট্য কি তাহা তথ্যযোগে প্রতিপন্ন কর। (63 M.A.)

১২। দীনবন্ধু মিত্র নাট্যরচনায় সে যুগে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ শক্তির বীজ কোথায় ছিল তাহা আলোচনা করিয়া নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধুর স্থান সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা কর। (63 Bur. B.A.)

১৩। উনবিংশ শতকের প্রধান নাটক রচয়িতাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের স্থান নির্দেশ কর। (62 Bur. B.A.)

১৪। বাংলা নাটকের উদ্ভবযুগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও এবং মধুসূদন ও দীনবন্ধুর হাতে বাংলা নাটক কি ভাবে নবজীবন লাভ করিল তাহা সংক্ষেপে বিবৃত কর। (65 B.A. old)

১৫। জাতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর বাংলা নাট্যসাহিত্যের যে ধারা প্রবর্তিত হয় তাহার স্বরূপ নির্ণয় কর। (67 U.B.)

১৬। **টীকা লিখ ঃ—**

যাত্রাগান (65 B.A.), অশ্রুমতী (65 Hons.), বিবাহবিভ্রাট (66 Hons.), জামাই বারিক (66 Hons.), নীলদর্পণ (63 B.A.), বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (61 B.A.), কুলীনকুলসর্বস্ব (67 U.B.), নরনারায়ণ নাটক (67 U.B.), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (64, 66 B.A.), দীনবন্ধু মিত্র (64 B.A.), ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (62 Bur. B.A.), নাট্যকার মধুসূদন (66 M.A.), মনোমোহন বসু (66 Hons.)।

তৃতীয় খণ্ড

আধুনিক কাব্য-সাহিত্য

১। উনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত কবি-ওয়ালাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর। কবিগানের উদ্ভবকাল অষ্টাদশ শতাব্দী। তবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যাঁহারা বাংলা কাব্যের আসর জমাইয়াছিলেন, তাঁহারা ছিলেন 'কবি-ওয়ালা'। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর বাংলায় উল্লেখযোগ্য কবি-প্রতিভার অভ্যুদয় ঘটে নাই। ইংরাজ বণিকদের পৃষ্ঠপোষিত একদল হঠাৎ-বড়লোক তরল আনন্দ ও সাময়িক উত্তেজনার জন্য একপ্রকার লঘু সঙ্গীতের সমাদর করিতেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেই আমলে কবিগণের প্রসার ঘটে। ডঃ সুশীল দে বলিয়াছেন, "......The flourishing period of the Kabiwalas was between 1760 and 1830." রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "ইংরাজের নূতন সৃষ্টি রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান।"

কবিওয়ালাদের অভ্যুদয়

কবিগানের রচয়িতারা উচ্চশিক্ষিত ও মার্জিতরুচি ছিলেন না। যাঁহারা উৎসাহদাতা ছিলেন তাঁহারাও মহৎ কবিত্বের অনুরাগী ছিলেন না। নাগরিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া ভোগবিলাসের স্রোতের মধ্যে কবিগানের জন্ম। পাঁচালী, টপ্পা, আখড়াই, খেউড় প্রভৃতি লঘুসঙ্গীতের পরিবেশে আদিরসাত্মক অশ্লীল গানই জনপ্রিয় হয়। সেই গানের যাঁহারা কারুকৎ তাঁহারা ছিলেন অশিক্ষিত-পটু কবি-ওয়ালা। ইঁহাদের রচনাকে যেমন কাব্য নামে অভিহিত করা যায় না, তেমনি ইঁহাদিগকেও 'কবি' নামে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা যায় না। তাই বলা হয় যে মঙ্গলকাব্যের যুগাবসানে "ভারতচন্দ্রের পর বাংলা কবিতার আসন যাঁহারা দখল করিলেন তাঁহারা কবি নহেন, কবি-ওয়ালা।" উন্নত শ্রেণীর কবিরূপে ইঁহারা সম্মানের অধিকারী ছিলেন না। মধুসূদন ইঁহাদিগকে 'Vile poetaster' বলিতেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই কবিওয়ালারা "অত্যন্ত লঘুসুরে উচ্চৈঃস্বরে চারিজোড়া ঢোল চারিখানি কাঁসি সহযোগে সদলে সবলে চীৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিত।"

কবিওয়ালার স্বরূপ

কবিওয়ালারা স্বভাবতঃ নিন্দিত হইলেও ইঁহাদের সহজ কবিত্ব, ভাষাবোধ এবং ছন্দসুষমা উপেক্ষণীয় ছিল না। উপস্থিত প্রয়োজনে তৎক্ষণাৎ কবিতা রচনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বকে অবশ্যই প্রশংসা করিতে হয়। কবিওয়ালারা 'ভবানী-সঙ্গীত' ও 'সখীসংবাদ'ই বেশি রচনা করিতেন। কবির লড়াইর সময় 'চাপান' দ্বারা প্রশ্ন করা হইত এবং অপর দলকে 'উতোর' অর্থাৎ প্রশ্নের সমাধান করিতে হইত। কবিগানের গঠনের মধ্যেও চিতেন, পরচিতেন, ফুকা, অন্তরা প্রভৃতি নানা ভাগ থাকিত; মেয়েকবি, দাঁড়াকবি প্রভৃতি দলও থাকিত। পূর্বে বাঁধা গান দিয়া আসর আরম্ভ করিয়া দলনেতা কবিওয়ালা স্বয়ং আসরে আসিয়া মুখেমুখে গান বাঁধিয়া ফেলিতেন। ইঁহারা পূর্বসূরিদের অনুকারী হইতেন সন্দেহ নাই; কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান, ভাষাবোধ ও সঙ্গীতযোগ্যতায় উৎকৃষ্ট পরিচয় দিয়া তৎকালীন জনরুচির পরিতৃপ্তি বিধান করিয়াছিলেন।

কবিগানের বিশেষত্ব

প্রাচীন কবিওয়ালাদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় অধুনা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ইহা ঠিক লোকসাহিত্য না হইলেও নাগরিক সাহিত্যের লৌকিক রূপায়ণ। কোন কবিওয়ালারই লিখিত কাব্যগ্রন্থ নাই। অধিকাংশ গানই ছিল মুখে মুখে রচনা। গুণগ্রাহীরা স্মৃতিতে সঞ্চয় করিতেন। অশিক্ষিত কবিরা সমাজে খ্যাতিমান্ ছিলেন না, তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হয় নাই। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকায় ১৮৫৪ সালে কবিওয়ালাদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া না রাখিলে হয়ত কবিওয়ালারা মহাকালের কুক্ষিগত হইতেন। বহু কবিওয়ালাই আমাদের দেশে ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বেশ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের মতে গোঁজলা গুঁই (১৭১৪) সম্ভবতঃ আদি কবিয়াল। এই কবিয়ালের শিষ্য ছিলেন রঘুনাথ। রঘুনাথকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন রাসু ও নৃসিংহ দুই ভাই এবং হরু ঠাকুর। চন্দননগরের গোঁদলপাড়ায় কায়স্থ বংশে রাসু ও নৃসিংহের জন্ম। হরুঠাকুরের জন্ম ১৮৩৭ সালে কলিকাতার সিমলায়। ইনি ব্রাহ্মণ, আসল নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি, ক্লাইভের দেওয়ান রাজা নবকৃষ্ণ ইঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র চর্মকার 'কেষ্টামুচি' নামে কবিয়াল খ্যাতি অর্জন করেন। নিতাই বৈরাগী চুঁচড়ার কাছে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন। বিখ্যাত রাম বসুর বাড়ী ছিল হাওড়া-শালিখা; জন্মকাল ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। ভোলা ময়রা নিজেকে হরুঠাকুরের শিষ্য বলিয়া বড়াই করিতেন।

কবিয়ালদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আরও অনেক কবিয়াল ছিলেন। এণ্টুনি নামক একজন ফরাসী ভদ্রলোক একটি ব্রাহ্মণ-বিধবাকে বিবাহ করিয়া বেশ বাঙ্গালী বনিয়া গিয়াছিলেন এবং কবির দল খুলিয়াছিলেন। রাম বসু এবং ঠাকুর সিং কবিয়ালের সঙ্গে বহুবার তাঁহার লড়াই হইয়াছে। নীলমণি পাটনী, চিন্তা ময়রা, গুরু দুম্বো, মতি পসারী প্রভৃতি আরও অনেক কবিওয়ালার নাম পাওয়া যায়। হোসেন খাঁ নামে একজন মুসলমান কবিয়ালও ছিলেন। ইনি তরজা জাতীয় গানের প্রতিষ্ঠাতা। যজ্ঞেশ্বরী নামে একটি মেয়ে কবিয়ালও বেশ খ্যাতি অর্জন করেন।

কবিওয়ালাদের শিল্প-কলা

কবিওয়ালাদের কাব্যকলার মধ্যে বিশিষ্টতা ছিল। উপস্থিত মত ছড়া রচনায় অসাধারণ দক্ষতার কথা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। রুচি বিকারের যুগে ইঁহাদের অভ্যুদয় সন্দেহ নাই; তবুও ইঁহাদের রচনাশিল্পের মুন্সীয়ানার প্রশংসা না করিয়া উপায় নাই। তাঁহাদের সহজ কবিত্ব, কৌতুকরসপ্রবণতা ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগে দক্ষতা উল্লেখ্য। বাংলা সাহিত্যের গীতিকাব্যের ধারাকে এই কবিয়ালের দলই প্রবহমান রাখিয়াছিল। গীতিধর্মী সাহিত্যকে বাঁচাইয়া রাখিয়া ইঁহারা সেই অন্ধকার যুগে যে দায়িত্ব পালন করিয়াছেন, পরবর্তী যুগে বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সেই দায়িত্ব পালনের ফলভাগী হইয়াছেন।

২। প্রাচীন কবি-সঙ্গীতের উল্লেখ করিয়া কবিওয়ালাদের রচনার সাহিত্যিক মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা কর।

উত্তর। সাময়িক প্রয়োজনে সৃষ্ট কবি-ওয়ালাদের সঙ্গীতগুলির কোন স্থায়ী সাহিত্যমূল্য আছে কি না তাহা বিচার্য। কোন রচনাই, তাহা যত নিকৃষ্টই হউক, একেবারে মূল্যবর্জিত হয় না। কবিগানের প্রসঙ্গেও কথাটি সত্য।

কবিওয়ালাদের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে অনেকেই শিক্ষাবর্জিত ছিলেন এবং সাহিত্যতত্ত্ব ও রসশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন জ্ঞান ছিল না। পুরাণ প্রসঙ্গগুলি ইঁহারা কথকতা ও যাত্রাগানের সুযোগে শিখিয়া

অশিক্ষিত পটুত্ব

লইয়াছিলেন। ইঁহাদের রুচি খুব মার্জিত ছিল না, মাত্রা-জ্ঞানের অভাব ছিল এবং প্রসঙ্গের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে জানিতেন না। তথাপি দেখা যায় যে, ইঁহাদের রচনা অপূর্ব কবিত্বে মণ্ডিত। কবিওয়ালারা অশিক্ষিত হইলেও ইঁহাদের মধ্যে পটুত্বের অভাব দেখা যায় না। বনের মধ্যে প্রস্ফুটিত কুসুমে যেমন অযত্নসিদ্ধ লাবণ্য, অশিক্ষিত কবিদের সহজ কবিত্বের রচনাগুলিতেও সেইরূপ সৌন্দর্য, স্নিগ্ধতা ও লাবণ্য দেখা যায়।

কবিসঙ্গীতগুলির সহজ কবিত্বই সর্বাপেক্ষা বেশী আকর্ষণীয়। কবিওয়ালাদের কোন শিল্প-সংস্কার ছিল না, কোন সাহিত্যিক আদর্শ বা মতবাদ দ্বারাও ইঁহারা পরিচালিত হইতেন না। অথচ নিজেদের অভিজ্ঞতা ও দৈবলব্ধ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া অনর্গল রচনা করিয়া যাইতে পারিতেন। ভাষা ও ছন্দ সানন্দে ও স্বেচ্ছায় তাঁহাদের অনুগমন করিত। কেহ একটি পদ বলিয়া পাদপুরণ করিতে বলিলে হরুঠাকুর (হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি) মুখে মুখে পাঁচ শ পদ রচনা করিয়া ফেলিতে পারিতেন। "পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।" এই পদটিকে লইয়া হরুঠাকুর বহু 'অন্তরা' পদ রচনা করেন। ঐ অন্তরাগুলির একটি এইরূপ ঃ—

সহজ কবিত্ব

পীরিতি নাহি গোপনে থাকে,
শুন লো সজনি, বলি তোমাকে ;
শুনেছ কখন জলন্ত আগুন
বসনে বন্ধন করিয়া রাখে ?

এইরূপ সহজ কবিত্বের প্রকাশ বহু কবিওয়ালাদের রচনায়ই পাওয়া যায়। ধুতিচাদর-পরিহিত এণ্টনি ফিরিঙ্গিকে কবিয়াল ঠাকুর সিং প্রশ্ন করিলেন,

বল হে আণ্টুনি আমি একটি কথা জানতে চাই,
এসে এ দেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই ?

এণ্টনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন,

"এই বাংলায় বাঙালীর বেশে বেশ আনন্দে আছি।
হয়ে ঠাকুরো সিংয়ের বাপের জামাই কুর্তি টুপি ছেড়েছি।"

সহজ কবিত্বের কৌশলে 'শ্যালক' সম্বোধন সুরুচি নয়, কিন্তু মুন্সীয়ানা বটে।

কবিওয়ালাদের সহজ কবিত্বের সঙ্গে কাব্যকলার কৌশলও ছিল। রাসু ও নৃসিংহ শ্লেষঘটিত সরস রূপক রচনায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। নৃসিংহ সখী-সংবাদের একটি গানে লিখিয়াছেন,

শিল্পকলা

"শ্যাম প্রদীপের আলো প্রকাশ পাইল
চন্দ্রমা লুকালো গগনে
ওহে, গোখুরের জল জগৎ ব্যাপিল
সাগর শুকালো তপনে।"

ঈশ্বরগুপ্ত এই পদটির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। কবিয়াল রাম বসুর ভবানী বিষয়ক গানগুলিও কাব্যসৌন্দর্যে অতুলনীয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃত্রিম কাব্য-কলা অর্থাৎ শ্লেষ-যমকাদি শব্দালঙ্কারের প্রাধান্য কবিয়ালেরা বেশ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। রাম বসু অনুপ্রাস ও যমকের চাতুর্য দেখাইয়া রচনা করিয়াছেন,

গেল গেল কুল কূল, যাক কুল তাতে নাই আকুল
লয়েছি যাহার কূল সে আমারে প্রতিকূল।
যদি কুলকুণ্ডলিনী অনুকূলা হন আমায়
অকূলের তরী কূল পাবে পুনরায়।"

রাম বসুর কবিতাগুলিতে শুধু শিল্পগুণই নয়, রসবোধেরও পরিচয় আছে। তাঁহার 'সখী-সংবাদ' সম্পর্কিত গানগুলিতে আধুনিক লিরিক কবিতার লক্ষণ দেখা যায়। একটি পদে লিখিয়াছেন,

"যখন হাসি হাসি সে আসি বলে
সে হাসি দেখে ভাসি নয়নের জলে
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে
লজ্জা বলে 'ছি ছি ধরো না'।"

কবিয়ালদের এই প্রকার অজস্র পদ আছে যেখানে কবিত্বশিল্পের নানা লক্ষণ এই সব অশিক্ষিত-পটু কবিরা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

দার্শনিকতা

উচ্চতর শিক্ষার অভাব থাকিলেও প্রাচীন কবি-ওয়ালারা যথেষ্ট দার্শনিক জ্ঞান ও অধ্যাত্ম অনুভূতির পরিচয় দিয়াছেন। পৌরাণিক কাহিনী ও হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহারা যথেষ্ট ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন। প্রাচীনতম কবি গোঁজলা গুঁই দার্শনিকতার সহিত সহজ কবিত্বের সুন্দর সংমিশ্রণ করিয়াছিলেন। হরু ঠাকুর, কেষ্টা মুচি এবং নিতাইদাস বৈরাগীর রচনাদিতেও উৎকৃষ্ট দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিক ভাব দেখা যায়। গোঁজলা গুঁই একটি পদে প্রেমের দার্শনিক তত্ত্বকে সহজ কবিত্বে প্রকাশ করিয়াছেন,

"তোমাতে আমাতে একই কায়া,
আমি দেহ প্রাণ তুমি লো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি।"

কবিওয়ালারা লোকমনোরঞ্জক ছিলেন। তাঁহাদের গান ছিল ফরমায়েসী। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ততা-গুণে প্রখ্যাত কবিদের তুলনায় তাঁহারা কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না। ইঁহাদের রচনার সহিত বাংলা গীতি-কবিতার উন্নতি ও পরিপুষ্টির বিবরণ এমন ঘনিষ্ঠ ভাবে আবদ্ধ যে কবিওয়ালাদিগকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকে।

উপসংহার

৩। ঈশ্বরগুপ্তকে আধুনিক কাব্যের প্রথম প্রবর্তয়িতা বলা যায় কিনা তাহা তাঁহার কবিকৃতির উল্লেখ করিয়া আলোচনা কর।

উত্তর। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর কাব্য-সাহিত্যের প্রাচীন যুগের অবসান ঘটে। বাংলায় তখন অতি দ্রুত রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তন ঘটিতেছিল। এই বিবর্তন কালে কোন প্রতিভাবান্ কবির আবির্ভাব হয় নাই। সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা বলিয়াছেন যে ভারতচন্দ্রের পর যাঁহারা কাব্যের আসর জাঁকাইয়া বসিলেন তাঁহারা কবি নহেন, কবিওয়ালা। বস্তুতঃ এই যুগে সাহিত্যের সমুন্নত আদর্শ বা সৃজনী প্রতিভার পরিচয় নাই। বহু অশিক্ষিত ও অমার্জিত ব্যক্তি স্বভাব-কবিত্বের জোরে সঙ্গীতধর্মী নানা-বিষয়ক কবিতা রচনা করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিত। এই পরিবেশের মধ্যেই ঈশ্বরগুপ্তের অভ্যুদয়। তথাপি সহজ কবিত্বের অধিকারী এই ব্যক্তিটি একটি সাহিত্যযুগের নিয়ামক হইয়া বাংলা কাব্যের একটি বিশিষ্ট ধারা প্রবর্তন করেন।

ঈশ্বরগুপ্তের অভ্যুদয়-কালে কাব্য-পরিবেশ

ঈশ্বর গুপ্ত ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাঁহার প্রতিভার বিকাশ ঘটে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর পুর্বকাল পর্যন্ত তিনি তৎকালীন সাহিত্য-তরণীর কর্ণধার ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি যাত্রাদলে ও কবিদলে গান বাঁধিয়া দিতেন। তাহার পর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক রূপে সাহিত্যচর্চায় মনো-নিবেশ করেন এবং উৎসাহ-দাতা হন। রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি প্রখ্যাত সাহিত্যিকরা ঈশ্বরগুপ্ত কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তিনি উচ্চশিক্ষিত বা উন্নতরুচি লোক ছিলেন না। কিন্তু ব্যক্তিত্বে, স্বদেশপ্রেমে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় সে যুগের সাহিত্যগুরুর পদ অধিকার করিয়াছিলেন।

কবির ব্যক্তি-পরিচয়

ঈশ্বর গুপ্ত কবিতা রচনায় প্রধানতঃ বাস্তবতা এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার

উপর নির্ভর করিতেন। সমাজ-সচেতন বাস্তবধর্মী রচনায় তিনিই ছিলেন অগ্রণী। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালীর সমাজে, ধর্মে, রাষ্ট্রে যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত হইয়াছিল ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন তাহার বাণীবহ। এই জন্যই কেহ কেহ তাঁহাকে আধুনিক যুগের প্রবর্তয়িতা বলেন। কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে ইনি ছিলেন বাস্তবধর্মী আধুনিক। প্রাচীন কবিদের মত দেবমাহাত্ম্য বর্ণনা না করিয়া ইনি পাঁঠা, তপসে মাছ, আনারস, পৌষপার্বণ প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে সরস কবিতা রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে 'খাঁটি বাঙ্গালী কবি' বলিয়াছেন। কারণ তিনি মোচাকে মোচারূপেই বর্ণনা করিয়াছেন, 'কেলাকা ফুল' বলেন নাই। বাঙ্গালীর গার্হস্থ্যজীবনের ঈর্ষা-কলহ যাহা রন্ধনশালা অথবা ঢেঁকিশালায় দেখা যাইত তাহাই তিনি নিপুণ তুলিকায় বাস্তব করিয়া তুলিয়াছিলেন।

কাব্যে বাস্তবতা ও সমাজ-সচেতনতা

ঈশ্বর গুপ্ত প্রধানতঃ ব্যঙ্গরসিক সমাজসচেতন কবি ছিলেন। তিনি আধুনিক যুগের গুরু এবং সংস্কারপন্থী হইলেও উগ্র আধুনিকতাকে সমর্থন করেন নাই। বাঙ্গালী চরিত্রের দোষত্রুটিকে তিনি বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করিয়াছেন। বাঙ্গালী নারীদের মধ্যে যাহারা মুখে 'রুজ' মাখে এবং 'A B শিখে বিবি সেজে' ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। ইনি বাঙ্গালীকে 'বিদেশী ঠাকুর' ফেলিয়া 'স্বদেশী কুকুর'কে সমাদর করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে রোমান্টিক স্বপ্নবিলাসিতা ছিল না। বাস্তব সীমার মধ্যে রঙ্গব্যঙ্গে মশগুল থাকায় তিনি মহৎ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। ইংরাজী সভ্যতার সংস্পর্শে 'ইঙ্গ-বঙ্গ' সমাজে যে আদর্শভ্রষ্টতা দেখা দিয়াছিল তাহাই ঈশ্বর গুপ্তকে ব্যঙ্গ-পরায়ণতায় এবং আক্রমণাত্মক বিদ্রূপে প্ররোচিত করে। পরবর্তী কালে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বিহারীলালের মধ্যে যে রসচেতনার মহিমা দেখা যায় ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় তাহার সূচনা ছিল না। এই জন্য ঈশ্বর গুপ্তের পক্ষে যুগস্রষ্টার দাবী অনেকেই স্বীকার করিতে পারেন নাই।

কাব্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বৈশিষ্ট্য

ঈশ্বরগুপ্ত সন্ধিযুগের কবি শুধু এই অর্থে যে তাঁহার কাব্যের আঙ্গিক গঠনে প্রাচীন পন্থা এবং বিষয় নির্বাচনে ও মনোধর্মে আধুনিকতা। তিনি ভারতচন্দ্রীয় পদ্ধতিতে এবং কবি-ওয়ালাদের ঢঙে কাব্য-রচনা করিয়াছেন। সমসাময়িক বিষয় অবলম্বনে ব্যঙ্গাত্মক রচনায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। অনুপ্রাস, শ্লেষ,

ষমকে ঠাসা কৃত্রিম কাব্যভঙ্গি তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃত্রিম কাব্যকলার অনুসরণ মাত্র। "দিশি কৃষ্ণ মানিনে ক ঋষিকৃষ্ণ জয়। মেরি দাতা মেরিসুত বেরি গুড বয়।" এই ভাবে তিনি ব্যঙ্গ করিতেন। ইংরাজের অত্যাচার এবং বাঙ্গালীর অসহায়তার ইঙ্গিত দিয়া তৎকালীন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে লিখিলেন,

মনোভাবে ও প্রকাশ-ভঙ্গিতে যুগসন্ধির লক্ষণ

তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গোরু
শিখিনি শিং বাঁকানো, কেবল খাব খোল-বিচিলি-ঘাস।
যেন রাঙা আমলা তুলে মামলা গামলা ভাঙ্গে না।
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব, ঘুঁষি খেলে বাঁচব না।

ইহাতে সহজ কবিত্বের সাবলীলতা আছে স্বীকার করিলেও ঢঙটি একেবারেই কবিদলের ছড়াকাটার মত। "প্রভাকর কর করে, প্রভাকর কর করে, প্রভাকর করের কি ভাব" প্রভৃতি কবিতায়ও কৃত্রিম কাব্যভঙ্গি এবং ছড়াকাটার ভাব। কাব্যাঙ্গিকে ঈশ্বর গুপ্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগাবসানের সর্বশেষ প্রতিনিধি। তিনি যুগসন্ধিতে অবস্থিত। যুগপ্রবর্তয়িতার দুর্লভ সম্মানের তিনি যোগ্য কিনা তাহা বিতর্কের বিষয়।

৪। প্রাচীন কাব্যধারার অনুবর্তী রূপে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কবিকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর। মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাচীন কাব্যধারার সর্বশেষ প্রতিভূ। তাঁহার জন্ম ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন লগ্নেই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। নদীয়া জিলায় বিল্বগ্রামে তাঁহার জন্ম। পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়। ইনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের খ্যাতিমান্ ছাত্র এবং বিদ্যাসাগরের প্রিয় বন্ধুরূপে ইনি পরিচিত। সংস্কৃত কলেজে তিনি সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন। কিছুদিন মুশিদাবাদে 'জজ পণ্ডিত' ছিলেন। পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। ব্যক্তিচরিত্রে মদনমোহন ছিলেন যুক্তিনিষ্ঠ ও প্রগতিবাদী। দেবভক্তি ও অন্ধ সংস্কারকে সোৎসাহে বর্জন করিয়া বিদ্যাসাগরের সহযোগে তিনি স্ত্রীশিক্ষা-প্রবর্তন, বিধবা বিবাহ, বহু-বিবাহ ও বাল্যবিবাহ নিরোধ প্রভৃতি সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। অকালমৃত্যু না হইলে হয়ত এই প্রতিভাবান ব্যক্তির হাতে বাঙালী

ব্যক্তি-পরিচয়

জাতি কিছু লাভ করিতে পারিত। 'সর্বশুভকরী' নামে সভাস্থাপন এবং ঐ নামে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে একটি পত্রিকা প্রকাশ করিয়া মদনমোহন কৌলীন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন।

সামাজিক আচার এবং আচরণে তিনি ছিলেন বিপ্লববাদী, চিন্তার স্বাধীনতা ও যুক্তিনিষ্ঠায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রগতিবাদী। অথচ সাহিত্য রচনার মধ্যে তাঁহার এই জাতীয় মানসিকতার প্রতিফলন হয় নাই। প্রথম যৌবনে তিনি 'রসতরঙ্গিণী' ও 'বাসবদত্তা' নামে দুইখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন এবং পরে তিন খণ্ডে 'শিশুশিক্ষা' নামক শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার লেখা দুই একটি প্রবন্ধে তাঁহার প্রগতিশীল মনোভাবের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন কালে ১৭ বৎসর বয়সে তিনি আদিরসাত্মক কাব্য রসতরঙ্গিণী (১৮৩৪) রচনা করেন। রচনায় তাঁহার আদর্শ ছিল ভারতচন্দ্র।

কবিত্ব-পরিচয়

তিনি কবিত্বে ও কাব্যকলায় ভারতচন্দ্রকে অতিক্রম করিবার স্পর্ধিত সংকল্প লইয়াই লেখনী ধারণ করেন। রায়-গুণাকরের 'রসমঞ্জরী' কাব্যের অনুকরণে এই আদিরসাত্মক কাব্য লেখেন। তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থও ছিল অনুরূপ আদিরসাত্মক। তাঁহার 'বাসবদত্তা' কাব্য (১৮৩৬) অনুবাদমূলক। সুবন্ধু রচিত বিখ্যাত সংস্কৃত গদ্যকাব্যখানির তিনি কাব্যানুবাদ করেন। কাহিনী-বিন্যাস, ভাষা, চরিত্রচিত্রণ সমস্তই ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের অনুকরণ। তিনি ব্যক্তিচরিত্রে দেববিশ্বাসী ছিলেন না, অথচ ভণিতা দিয়াছেন ভারতচন্দ্রের ভঙ্গিতে।

"কাব্যরসরত্নাকরে করিয়া মজ্জন
কালীর আভাসে ভাষে মদনমোহন ॥"

অন্যত্র বলিয়াছেন, কালীর আদেশে মদন ভাষে।
সুরসিক জন শুনিয়া হাসে ॥

মদনমোহন ছন্দ, অলঙ্কার ও রসচেতনায় প্রথম শ্রেণীর কবিত্বের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু আদিরসের পথ ধরিয়া এবং প্রাচীন প্রকাশরীতি অবলম্বন করিয়া প্রথম যৌবনে অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দেন। পরিণত যৌবনে তিনি কবিতা লেখা ছাড়িয়া দেন এবং পূর্বে-লেখা বইগুলির প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন।

৫। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দানের পরিমাণ ও বিশেষত্ব নির্দেশ কর।

উত্তর। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খিদিরপুরের অধিবাসী ছিলেন। স্কুল কলেজে পড়িবার সুযোগ না পাইলেও ইনি যথেষ্ট উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ইংরাজী, সংস্কৃত, বাংলা, এবং ফার্সী-ভাষা তিনি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্যত্ব করিয়া তাঁহার 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় রচনাদি প্রকাশ করিতেন। তিনি নিজেও "সংবাদ-রসসাগর" নামে একটি পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। 'এডুকেশন গেজেট' এবং সাপ্তাহিক 'বার্তাবহ' পত্রিকারও সহ-সম্পাদক ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি 'উষা-অনিরুদ্ধ' পাঁচালী-কাব্য রচনা করেন। প্রাচীন ভঙ্গিতে লেখা সেই কাব্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঐ কাব্যের একটি গান আছে তাঁহার 'কাঞ্চীকাবেরী' কাব্যের পঞ্চম সর্গে। রঙ্গলাল বাংলা আখ্যান কাব্য রচনার প্রথম পথ-নির্দেশক। ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে তাঁহার কাব্যরচনায় নূতন সুর ধ্বনিত হইয়া উঠে। বহু ইংরাজী কবিতার আক্ষরিক ও ভাবানুবাদ করিয়া তিনি প্রথম জীবনে হাত পাকাইয়া ছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রঙ্গলাল লোকান্তরিত হন।

রঙ্গলালের ব্যক্তি-পরিচয়

রঙ্গলাল মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবি এবং ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক আখ্যান-কাব্য রচয়িতার সম্মান পাইবার অধিকারী। শিল্প-বিচারে তিনি উন্নত কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন না সত্য, কিন্তু বাংলা কাব্যধারার গতি-পরিবর্তনে তাঁহার দান অসামান্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল প্রগাঢ়। ইংরাজীনবীশ হরচন্দ্র দত্ত বীটন সোসাইটির একটি অধিবেশনে ইংরাজী কাব্যের সহিত বাংলা কাব্যের তুলনা করিয়া বাংলা কবিতাকে হেয় প্রতিপন্ন করিলে রঙ্গলাল পরবর্তী অধিবেশনে "বাংলা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ" লিখিয়া পাঠ করেন। তাহার পর তিনি নিষ্ঠার সহিত কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮), 'কর্মদেবী' (১৮৬২), 'শূরসুন্দরী' (১৮৬৮) এবং 'কাঞ্চীকাবেরী' (১৮৭৯) তাঁহার আখ্যান-কাব্য। ইহা ছাড়া তিনি Goldsmith এর Hermit কাব্যের অনুবাদ করেন। বিদেশী সাহিত্যে ঋণ-গ্রহণ ও স্বীকার করিয়া 'ভেকমূষিকের যুদ্ধ' নামক ব্যঙ্গ-কাব্য লেখেন। ইনি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কালিদাসের 'কুমার-

রচনাবলী

সম্ভব' কাব্যের অনুবাদ করেন এবং দুইশত সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের অনুবাদ করিয়া "নীতিকুসুমাঞ্জলি' নামে প্রকাশ করেন। ইহা 'বঙ্গদর্শন' এ প্রকাশিত হয়। তাঁহার অনেকগুলি কবিতা 'রহস্য-সন্দর্ভে' প্রকাশিত হয়। Watt-এর অনুসরণে 'প্রভাতসঙ্গীত', Cooper এর অনুকরণে 'নদী ও কালের সমতা', Milton এর অনুকরণে 'আদিম নরদম্পতীর প্রাতরুপাসনা' প্রভৃতি অনুবাদ-কবিতা লিখিয়াছিলেন। কয়েকটি উড়িয়া কবিতারও তিনি পদ্যানুবাদ করেন। ইহা ছাড়া ওমর খইয়ামের প্রথম পদ্যানুবাদ রঙ্গলালের একটি বিশিষ্ট কীর্তি।

উনবিংশ শতাব্দীর আখ্যান-কাব্যের ইতিহাসে রঙ্গলাল শীর্ষস্থানীয় কবি। তিনি মহাকবির প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু স্বদেশপ্রেমের আবেগ লইয়া তিনি টডের 'রাজস্থান' (Annals and Antiquities of Rajasthan)গ্রন্থ অবলম্বনে অপূর্ব আখ্যান-কাব্যের সূচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালের কাব্য-প্রবাহের উৎসমুখে রঙ্গলাল-কর্তৃক এই আবেগসঞ্চার সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল মুদ্রিত থাকিবে। স্কটের মিন্‌স্ট্রেলের অনুকরণে চারণের মুখে কাব্যকাহিনী স্থাপন করিয়া রঙ্গলাল আলাউদ্দিন খিলজী কর্তৃক চিতোর আক্রমণ ও রাণী পদ্মিনীর জহরব্রতে আত্মোৎসর্গের বিবরণ অবলম্বনে 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' কাব্য রচনা করেন। ঘটনাগুলি নিঃসংশয়ে ঐতিহাসিক সত্য না হইলেও ঐতিহাসিক আখ্যান-কাব্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন রূপে কাব্যখানিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই কাব্যের দেশপ্রেমের উদ্দীপনামূলক সঙ্গীতগুলি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল। রঙ্গলালের দ্বিতীয় কাব্য 'কর্মদেবী'র বিষয়বস্তুও রাজপুত ইতিহাস হইতে গৃহীত। ভট্টিজাতির অধিপতি অনঙ্গদেবের পুত্র সাধুর সহিত গোহিল-বংশীয় নরপতি মাণিকদেবের কন্যা কর্মদেবীর প্রণয় ব্যাপার লইয়া কাহিনীটির বিকাশ। কাব্যখানিতে দেশপ্রেমের আদর্শ আছে কিন্তু কাব্যকলার বিশেষ কোন পরিচয় নাই। 'শূরসুন্দরী' কাব্যের বিষয়বস্তুও রাজপুত ইতিহাস। নওরোজ উৎসবে সম্রাট আকবর প্রতাপসিংহের ভ্রাতু-পুত্রীকে অপমান করিবার চেষ্টা করিয়া লাঞ্ছিত হন। ইহাই কাব্যখানির বিষয়বস্তু। আকবরের প্রাসাদ এবং অন্তঃপুরের বর্ণনায় কবি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। রঙ্গলালের 'কাঞ্চীকাবেরী' গ্রন্থের বিষয়বস্তু কিংবদন্তীমূলক। ওড়িয়া কবি পুরুষোত্তমের কাব্যখানির অনুসরণে এই কাব্য রচিত হয়।

রঙ্গলালের কবিকৃতি

উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্র দেব স্বপ্নাদেশে কনিষ্ঠ পুত্র পুরুষোত্তমকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কাঞ্চী রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহসম্বন্ধ উপস্থিত। রথযাত্রার সময় কাঞ্চীরাজ পাত্র দেখিতে আসিয়া দেখিলেন যে পুরুষোত্তম রথের সম্মুখে রাজপথ ঝাঁট দিতেছে। চণ্ডালের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির হাতে কন্যাসম্প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়া রাজা ফিরিয়া গেলেন। পুরুষোত্তম কাঞ্চীরাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজকন্যাকে কাড়িয়া আনিলেন এবং চণ্ডালের হাতে সমর্পণে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান করিলেন মন্ত্রী। রথের সময় রাজা চণ্ডালের কর্মে নিযুক্ত থাকাকালীন মন্ত্রী রাজার হাতে রাজকন্যা পদ্মাবতীকে সমর্পণ করিলেন। এই কাব্যখানি ভক্তিমূলক রোমান্টিক প্রেমের গল্প।

রঙ্গলালকে নবযুগের বার্তাবহ কবি বলা যায়। তিনি কাব্য সংস্কারে এবং আঙ্গিক রূপান্তরে আমূল পরিবর্তন আনিতে পারেন নাই। কিন্তু স্বদেশপ্রেম ও কাহিনী-কৌতূহল সঞ্চার করিয়া বাংলা আখ্যান কাব্যধারার গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে বলা হয় যে তিনি খাঁটি বাঙালী কবি ঈশ্বরগুপ্ত এবং 'ডাহা ইংরাজ' মধুসূদনের মধ্যবর্তী 'হাইফেন'। তাঁহার কাব্যসৃষ্টির রসমূল্য খুব উচ্চস্তরের না হইতে পারে, কিন্তু বিষয়-বিস্তারে, ঐকান্তিকতায় ও নিষ্ঠায় তিনি বাংলা কাব্যের ধারাকে প্রবহমান ও পরিণামমুখী করিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

রঙ্গলাল নবযুগের বার্তাবহ

৬। মধুসূদনের কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া বাংলা কাব্যে তাঁহার দানের পরিমাণ নির্ণয় কর।

উত্তর। বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী মধুসূদন বাংলা কাব্যে ও নাট্য-সাহিত্যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনিয়া বাংলা সাহিত্যের গতিপথ নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। 'মহাকবি শ্রীমধুসূদন' রূপে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি স্বর্ণাসনের অধিকারী। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে জানুয়ারী যশোহরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে মধুসূদনের জন্ম। পিতা রাজনারায়ণ এবং মাতা জাহ্নবী দেবীর স্নেহচ্ছায়ায় তাঁহার বাল্যশিক্ষা। ১৮৩৭ হইতে ছয় বৎসর কাল বিদেশী শিক্ষকদের কাছে হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করার পর তাঁহার মধ্যে বিদ্রোহী সত্তার আবির্ভাব ঘটে। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পিতার স্নেহ ও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত মধুসূদন অতঃপর দুর্ভাগ্যের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে নিতান্ত দীন অবস্থায় ১৮৭৩

ব্যক্তি-পরিচয়

খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জুন হাসপাতালে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহার জীবনকাহিনী উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর। তিনি বিদেশিনী ভার্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইয়োরোপে গিয়াছিলেন, ব্যারিস্টার হইয়াছিলেন, অর্থোপার্জনের জন্য নানা চেষ্টা করিয়া সময়ে সার্থক সময়ে ব্যর্থ হইয়াছেন। এইরূপ অবস্থায়ও তিনি জ্ঞান-সাধনার অগ্নিকে নির্বাপিত হইতে দেন নাই। বহু ভাষা আয়ত্ত করিয়া তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন এবং নিজের অন্তরস্থিত কল্পনাশক্তির দীপবর্তিকাটি সযত্নে জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন। "দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন" মাতৃভাষাকে বিশ্ববরেণ্য করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিভার যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া নিজেকে নিঃশেষে আহুতি দিয়াছিলেন।

মধুসূদনের কবিকৃতি বিচিত্রমুখী হইলেও প্রধানতঃ তিনি মহাকবি রূপেই প্রসিদ্ধ। বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁহার ভাবগত, বিষয়গত এবং আঙ্গিক গত দান অপরিমেয়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Captive Lady এবং Visions of the Past নামক কাব্যদ্বয় রচনা করেন। কিন্তু এই পন্থা পরিহার করিয়া তিনি বাংলা কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করিলে বাংলা সাহিত্যের সমগ্র প্রাঙ্গণ অপূর্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

কাব্যরচনা

তিনি একটি যুগের বাণীমন্ত্রকে অপূর্ব ছন্দে হিল্লোলিত করিয়া তুলিলেন। অমিত্র ছন্দের উদ্ভাবন ও প্রয়োগে, পাশ্চাত্ত্য এপিকের আদর্শে মহাকাব্য রচনার প্রয়াসে মধুসূদনের কবিকৃতি অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করিল। তিনি নূতন আঙ্গিকে অভিনব পত্রকাব্য রচনা করিলেন। সঙ্গীতমুখর বিচিত্র ছন্দে ব্রজাঙ্গনা রাধার মর্মকথা প্রকাশ করিলেন, সংহত ছন্দসুষমায় সনেট রচনা করিয়া নিজের জীবনের মর্মকথা বিজ্ঞাপিত করিলেন। আঙ্গিক বৈচিত্র্যে ছন্দ-অলঙ্কারের অভিনবত্বে এবং ভাবকল্পনার বিস্ময়কর নূতনত্বে প্রতিভার বিদ্যুৎদীপ্তি স্ফুরিত করিয়া তিনি বাংলা কাব্যধারায় ভাব-মন্দাকিনীর তরঙ্গবেগ আনয়ন করিয়াছিলেন।

১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন বাণীর বরপুত্ররূপে বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন। নাটকে ও কাব্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ প্রতিভা এই সময়েই প্রকাশ পায়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "তিলোত্তমা সম্ভব" নামে প্রথম মহাকাব্য রচনা করেন। তিনি নিজে ইহাকে Epicling বলিয়াছিলেন। মিল্‌টনের অনুসরণে পাশ্চাত্ত্য এপিকের আদর্শে তিনি ভারতীয় পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে কাব্যখানি লেখেন। সুন্দ ও উপসুন্দ

তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য

অভিন্নহৃদয় ভ্রাতা, অমিত শৌর্যের অধিকারী দানবদ্বয়। তাহাদের বৃদ্ধিতে শঙ্কিত দেবতারা বিশ্বকর্মাকে দিয়া অপূর্ব নারীমূর্তি রচনা করিলেন 'তিলোত্তমা'। এই নারীর প্রতি লোভে ভ্রাতৃদ্বয় আত্মকলহ করিয়া নিহত হইল। এই কাহিনীকে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়া অপূর্ব রোমান্টিক আখ্যানে পরিণত করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কাব্যের সম্ভাবনার বীজ এই কাব্যে উপ্ত হইয়াছিল।

'মেঘনাদবধ' কাব্য মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি-কীর্তি। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যখানি রচিত হইবার পর শিক্ষিত বাঙালী সমাজে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছিল। কাহিনী পরিকল্পনায়, চরিত্রসৃষ্টিতে ও ছন্দোনৈপুণ্যে মধুসূদন অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণ হইতে কাব্য-কাহিনী আহৃত হইয়াছে। কিন্তু তিনি গাঁথিয়াছেন 'নূতন মালা'। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিকুলের 'চিত্তফুলবন' হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া তিনি বাঙালী জাতির জন্য এই 'মধুচক্র' রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই কাব্যে সর্বাপেক্ষা বড় অভিনবত্ব কবির মানবিকতাবোধ। তিনি রাক্ষস রাবণের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাঁহার দৃষ্টিতে রাবণ মহা-মানবের গুণাবলীতে অলঙ্কৃত। দেবতাদের তিনি ষড়যন্ত্রকারী রূপে বর্ণনা করিয়া রাক্ষস-মহিমার মাধ্যমে মানব মহিমাকেই প্রকটিত করিয়াছেন। তিন দিন ও দুই রাত্রির ঘটনাকে নয়টি সর্গে বিন্যাস করিয়া তিনি চরিত্রসৃষ্টি ও কাহিনী-রূপায়ণ করিয়াছেন। কাহিনী-গঠনের মধ্যেও তাঁহার কল্পনাশক্তির সমুন্নতি প্রকাশ পাইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য কবিদের অনুকরণের বহু চিহ্ন থাকিলেও মধুসূদনের মৌলিকতার অভাব এই কাব্যে নাই। কাব্যখানি করুণ-রসাত্মক ট্রাজেডির উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

মেঘনাদবধ কাব্য

'মেঘনাদবধ' রচনার সমকালেই মধুসূদন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে শ্রীরাধিকার বিরহ-বেদনা অবলম্বনে 'ব্রজাঙ্গনা' নামে একখানি গীতিকাব্য লেখেন। ইতালীয় Ottava Rima ছন্দের অনুসরণে মিশ্রছন্দ ব্যবহার কাব্যখানির অন্যতম বিশেষত্ব। গ্রন্থখানি বৈষ্ণবীয় ভক্তিমূলক কাব্য নহে; মধুসূদনের মতে পাশ্চাত্ত্য Ode জাতীয় কাব্যের মত রোমান্টিক প্রেমের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি। কবি কোন ধর্মীয় সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়া এই কাব্য রচনা করেন নাই। রাধার মধ্যে মানবী সত্তার বিকাশ দেখাইয়াছেন। ইহারও প্রেরণা ছিল উনবিংশ শতাব্দীর মানবিকতা-

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

বোধ। বহিরঙ্গে বৈষ্ণব-কাব্যের প্রভাব ছিল, ভণিতাও বৈষ্ণব কবিদের অনুরূপ। কিন্তু কবির দৃষ্টিতে রাধা মহাভাব স্বরূপিণী নয়, The poor lady of Braja মাত্র। বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, 'After all, Mrs. Radha was not a bad woman'। বস্তুতঃ 'ব্রজাঙ্গনা' মধুসূদনের লিরিক প্রতিভার উৎকৃষ্ট পরিচয়।

আঙ্গিক পরিকল্পনায়, বিষয় নির্বাচনে এবং শিল্পসমৃদ্ধিতে মধুসূদনের "বীরাঙ্গনা" কাব্যখানি অতুলনীয়। রচনার কারুশিল্পে সার্থক এই জাতীয় কাব্য বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নাই। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থখানির প্রকাশ।

বীরাঙ্গনা কাব্য

মধুসূদন ইতালীয় কবি Publius Ovidius Naso (খ্রী. পূ. ৪৩-১৭) কর্তৃক লিখিত Heroides নামক কাব্যের অনুসরণে 'বীরাঙ্গনা' রচনা করেন। ঐ কাব্যে একুশটি নায়িকার প্রেম-পত্র ছিল। মধুসূদনও তাহাই করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এগারখানি পত্রকাব্য লেখার পরই তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। 'বীরাঙ্গনা' শব্দ দ্বারা তিনি বীর-রমণী না বুঝাইয়া বীরের পত্নী বা প্রেমিকা নারী বুঝাইয়াছেন। বস্তুত ইংরাজী Heroine শব্দের অনুবাদরূপেই 'বীরাঙ্গনা' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ওভিদের কাব্যে যেমন Penelope to Ulysses, Phyllis to Demophoon, Dido to Aeneas, Phaedra to Hypplytus প্রভৃতি পত্র আছে, 'বীরাঙ্গনা' কাব্যেও সেইরূপ 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা', 'সোমের প্রতি তারা', 'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা', 'দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী' প্রভৃতি পত্র আছে। পত্রগুলির বাণীশিল্প ও কাব্যভঙ্গি অপূর্ব। আধুনিক যুগের নারীদের জীবন-জিজ্ঞাসা ও অধিকারের দাবীকে মধুসূদন 'ভাণিকা' বা একক ভাষণের নাটকীয়তায় অপরূপ করিয়া তুলিয়াছেন। এই কাব্যে মধুকবির কবি-প্রতিভার চূড়ান্ত প্রকাশ। বাংলা সাহিত্যে 'বীরাঙ্গনা' অননুকরণীয় অপূর্ব কাব্য।

মধুসূদনের কবি-প্রতিভার বিস্ময়কর দীপ্তি ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইয়োরোপ গেলেন, কাব্যরচনার শেষ হইল। কিন্তু ইয়োরোপে থাকার সময়ও ক্ষণকালের জন্য তাঁহার কবিত্বের শেষ আলোকরশ্মি প্রকাশ পাইয়াছিল তাঁহার 'সনেটে'। ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে বসিয়া তিনি শতাধিক

চতুর্দশপদী কবিতাবলী

সনেট লেখেন এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' নামে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে ৯৪টি সনেট ছিল। উহাতে কবির অন্তঃপ্রকৃতি প্রতিফলিত হইয়াছে। বাংলা দেশ,

বাংলার পুজাপার্বণ, বাঙালী কবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি নানা বিষয় ব্যক্তি মধুসূদনকে চিনিবার সুযোগ দেয়। ইতালীয় কবি পেত্রার্কার অনুসরণে ইনি সনেট লেখার রীতি বাংলা কাব্যে প্রবর্তন করেন এবং এখানেও তিনি এমন সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন যে অদ্যাপি অন্য কোন কবি তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। মহাকাব্য রচয়িতা শ্রীমধুসূদন যে লিরিক রচনায়ও অনুরূপ দক্ষ ছিলেন তাহার অজস্র প্রমাণ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

বাংলা কাব্য সাহিত্যে মধুসূদনের দানের সীমা নাই। কাব্যের ভাব-পরিকল্পনা এবং রূপাঙ্গিক নির্মাণ উভয় দিক হইতেই তিনি অভিনবত্বের দাবী করিতে পারেন। এপিকের আদর্শে ওজস্বিনী ভাষায় মহাকাব্য রচনা, পত্রকাব্যের সৃষ্টি, মিশ্রছন্দে লেখা গীতিকাব্য, সনেট রচনার প্রবর্তন প্রভৃতি প্রত্যেকটি ব্যাপার বাংলা সাহিত্যে একেবারেই নূতন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি এবং ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ব্যবহারে বাণীশিল্পের নূতন আদর্শ স্থাপন মধুসূদনের বিস্ময়কর কৃতিত্ব। বাংলা কাব্যের সুপ্রাচীন প্রবাহের গতানুগতিকার মধ্যে মধুসূদন যে বিস্ময়কর আলোড়ন আনিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

মধুসূদনের কৃতিত্ব

৭। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলীর উল্লেখ করিয়া তাঁহার কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।

উত্তর। মধুসূদনের অনুবর্তী রূপে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে খিদিরপুরে তাঁহার জন্ম। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হইয়া যান এবং আর্থিক কষ্ট ও পারিবারিক অশান্তি ভোগ করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। হেমচন্দ্র উচ্চশিক্ষিত ছিলেন, রসজ্ঞ সমালোচক ছিলেন। মধুসূদন তাঁহাকে "A real B.A." বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার গভীর স্বদেশপ্রেম, ধর্মানুরাগ, জাতীয়তাবোধ প্রভৃতি নানা গুণ তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাবধারাকে জাতীয় জীবনের এবং হিন্দুধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য দান করিয়া বাঙ্গালীর জীবনাদর্শকে নিয়ন্ত্রিত করার অভিলাষও তাঁহার রচনাবলীর অন্যতম প্রেরণা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ব্যক্তি-পরিচয়

হেমচন্দ্র তরুণ বয়স হইতেই কাব্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার কোন কোন রচনা তৎকালেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

হেমচন্দ্রের কাব্য **'চিন্তা তরঙ্গিনী'** ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। তাঁহার বন্ধু রামকমল ভট্টাচার্যের আত্মহত্যার ঘটনায় কবি ইহা রচনা করেন। ইহার পর স্বদেশ প্রেমের আবেগ লইয়া কাল্পনিক ইতিহাসের পটভূমিকায় একখানি আখ্যান কাব্য লেখেন। এই কাব্যের নাম **'বীরবাহু'** (১৮৬৪)। তিনি দান্তের লেখা 'ডিভাইন কমেডি' নামক কাব্যের অনুসরণে **'ছায়াময়ী'** (১৮৮০) নামে একখানা কাব্য লেখেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কবির রূপকাশ্রিত তত্ত্বমূলক কাব্য **'আশাকানন'** প্রকাশিত হয়। তিনি পৌরাণিক চণ্ডীতত্ত্বের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের বিবর্তনবাদ মিশ্রিত করিয়া **'দশমহাবিদ্যা'** (১৮৮২) নামে একখানি অভিনব কাব্য রচনা করেন। কাব্যখানির শিল্পসৌন্দর্য প্রশংসিত হয় নাই কিন্তু ভাব-কল্পনার অভিনবত্ব শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। হেমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাঁহার **'বৃত্রসংহার'** কাব্য। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম খণ্ড এবং দুইবৎসর পর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইলে তাঁহাকে মধুসূদনের প্রতিদ্বন্দ্বী কবিরূপে অভ্যর্থনা করা হয়। দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত বৃত্রের বিরোধের কাহিনী পুরাণে, বেদে, এমন কি প্রাচীনতম ইন্দো-ইরাণীয় সাহিত্যেও আছে। হেমচন্দ্র সেই কাহিনী অবলম্বন করিয়া বৃত্রাসুর কর্তৃক স্বর্গ বিজয়, দেবতাদের লাঞ্ছনা, দধীচির অস্থিদ্বারা বজ্র নির্মাণ এবং বজ্রাঘাতে বৃত্রের মৃত্যু ও স্বর্গরাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রভৃতি প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়া ধর্মের জয় এবং অধর্মের পরাজয় দেখাইয়াছেন। এই বিশাল মহাকাব্য হেমচন্দ্রের অতুলনীয় কীর্তি। ইহা ছাড়া বহু ইংরাজ কবির প্রখ্যাত কবিতার অনুবাদ করেন এবং নিজেও বহু খণ্ড কবিতা লেখেন। তাঁহার **'কবিতাবলী'** প্রথম খণ্ড ১৮৭০ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁহার অন্ধজীবনের বেদনা-করুণ অনুভূতি প্রকাশ পায় **'চিত্তবিকাশ'** (১৮৯৮) কাব্যে। তিনি Tempest নাটকের অনুবাদ করেন **'নলিনী বসন্ত'** (১৮৭০) নামে। আর একখানি অনুবাদ **'রোমিও-জুলিয়েত'** (১৮৯৫)।

রচনাবলী

মহাকাব্য রচয়িতারূপে হেমচন্দ্র একদা মধুসূদন দত্তের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইতেন। মধুসূদন ঐতিহ্যবিরোধী ভাবকল্পনা অবলম্বনে দেবচরিত্রের হীনতা সম্পাদন করিয়াছেন। রাক্ষস রাবণকে রামলক্ষ্মণের তুলনায় মহত্তর করিয়াছেন—এই সব অভিযোগে অনেকে হেমচন্দ্রের কাব্যকে অধিকতর আদরণীয় মনে করিতেন। কিন্তু আধুনিক

মহাকবি রূপে হেমচন্দ্র

কাল শিল্পবিচারের পথ ধরিয়া হেমচন্দ্রের মহকাব্যে নানা ত্রুটিবিচ্যুতি আবিষ্কার করিয়াছে। বৃত্রসংহারের কাহিনীর বিশালতা মহাকাব্যের অনুরূপ, মহৎ আদর্শ এবং মহান্ চরিত্র সৃষ্টির প্রচেষ্টাও প্রশংসনীয়। কিন্তু হেমচন্দ্র মধুসূদনের সহিত তুলনায় উৎকর্ষ দেখাইতে পারেন নাই। রাবণ বৃত্র অপেক্ষা মহত্তর চরিত্র, ইন্দ্র চরিত্রের তুলনায় রামচন্দ্রের চরিত্র স্পষ্টতর, জয়ন্ত অপেক্ষা লক্ষ্মণ মহান্, ইন্দ্রজিতের গুণাবলীর সামান্যতম প্রকাশও রুদ্রপীড়ের মধ্যে নাই। সীতার কারুণ্যের সঙ্গে শচীর বেদনার তুলনা হয় না। প্রমীলার প্রখর দীপ্তি ইন্দুমতীকে অত্যন্ত ম্লান করিয়া দিয়াছে। মধুসূদনের মত চরিত্রসৃষ্টির প্রতিভা হেমচন্দ্রের ছিল না। রচনাপদ্ধতিতেও মধুসূদনের শ্রেষ্ঠত্ব। হেমচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিতে পারেন নাই, মিলবিহীন পয়ার লিখিয়াছেন। তাঁহার কাহিনীর বন্ধন অত্যন্ত শিথিল। বৃত্রের পারিবারিক প্রসঙ্গ, ঐন্দ্রিলার ভোগস্পৃহা ও আত্মাভিমান, বৃত্রের দম্ভ প্রকাশ, ঘটনা বর্ণনায় অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস এবং গীতিকবিসুলভ ভাবালুতায় মহাকাব্যের উপযোগী গাম্ভীর্য, সংহতি ও সমুন্নতি প্রকাশ পায় নাই। হেমচন্দ্রের মূল প্রতিভায় মহাকবিসুলভ সংযম ও কল্পনাসমৃদ্ধি ছিল না। তথাপি 'বৃত্রসংহার' তাঁহার অবিস্মরণীয় কীর্তি।

হেমচন্দ্র আখ্যান কাব্য রচনায়ও বিস্ময়কর কিছু কৃতিত্ব দেখান নাই। তাঁহার 'বীরবাহু' কাব্যখানির আখ্যানটি মনোরম কিন্তু রচনাশিল্প অসুন্দর।

আখ্যানকবি রূপে হেমচন্দ্র

"হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশরক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন" তাহা প্রদর্শনের জন্য লেখক একটি কাল্পনিক ইতিহাস রচনা করিলেন। নায়ক মুসলমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিলেন। এই নায়ক প্রেমের দিকেও বেশ রোমান্টিক। রীতিমত উপকথার ভঙ্গিতে গল্পটিকে সাজাইবার জন্য রচনায় সংহতি নাই, চরিত্রগুলিও ফুটিয়া উঠে নাই। নায়কের জীবনাদর্শ ছিল ঃ—

"লক্ষ তরী ভাসাইব ম্লেচ্ছ দেশ মজাইব
বাণিজ্য করিব ছারখার
তোর সিংহাসন পাত ম্লেচ্ছকুল ভস্মসাৎ
প্রেয়সীরে করিব উদ্ধার।"

স্বদেশপ্রেমের এই ভাবাবেগ কবিতাখানিকে উদ্বেল করিয়াছে, কিন্তু রসসৃষ্টির সহায়ক হয় নাই। বীরবাহু চরিত্রের সূচনাটি মধুসূদনের ইন্দ্রজিৎ চরিত্রের

অনুরূপ। কিন্তু দ্বন্দ্বযুদ্ধ, দিল্লীর সিংহাসনাধিকার এবং পত্নী হেমলতার উদ্ধার প্রভৃতি ঘটনা কাহিনীরস ও কাব্যরসকে উপভোগ্য করিতে পারে নাই। হেমচন্দ্রের 'আশাকানন' সাঙ্গরূপক কাব্য। দশটি 'কল্পনা'য় লঘু ত্রিপদী ছন্দে মানবপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য গল্পচ্ছলে রূপক চরিত্রের মাধ্যমে বলা হইয়াছে। ইহাতে কোন উল্লেখযোগ্য কবি-শক্তির পরিচয় নাই। তাঁহার 'ছায়াময়ী' Divina Comedia কাব্যের অনুসরণে সাতটি 'পল্লব'এ লেখা। নরকে পাপীদের বর্ণনা বেশ কৌতুকপূর্ণ; কিন্তু রসের কোন উৎকর্ষ নাই। বস্তুতঃ আখ্যান রচনায় যে বস্তুনিষ্ঠা ও পরিমিতি-বোধ প্রয়োজন হেমচন্দ্রের কবি-প্রতিভায় তাহার কিঞ্চিৎ অভাব ছিল।

গীতিকবি রূপে হেমচন্দ্র

হেমচন্দ্রের কবিত্বের সার্থক পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে গীতিকাব্য রচনায়। তিনি বহু গীতিকবিতা রচনা করিয়া কল্পনাশক্তির ও সরস প্রাণের পরিচয় দিয়াছেন। মৌলিক গীতিকাব্য রচনায়, ইংরাজী লিরিক কবিতার অনুবাদে এবং সামাজিক রঙ্গব্যঙ্গময় কবিতা রচনায় তিনি প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। মৌলিক গীতিকবিতায় স্বদেশ-প্রেমের আবেগ, সৌন্দর্যচেতনা, জীবনবোধ ও আশাবাদের পরিচয় দিয়াছিলেন। 'যমুনাতটে', 'লজ্জাবতী', 'জীবন মরীচিকা', 'হতাশের আক্ষেপ', 'প্রিয়তমার প্রতি' প্রভৃতি কবিতায় তিনি সাবলীল ভঙ্গিতে নিজের অনুভূতিকে বাঙ্ময় করিয়াছিলেন। 'ভারত সঙ্গীত' হেমচন্দ্রের একটি বিখ্যাত কবিতা। ইহাতে স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধনের জাগরণমন্ত্র ধ্বনিত হইয়াছে। 'কাশীদৃশ্য', 'মণিকর্ণিকা', 'বিশ্বেশ্বরের আরতি' প্রভৃতি কবিতায় হৃদয়ের ভক্তিভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কবির সৌন্দর্যবোধের পরিচয় ফুটিয়াছে 'শিশুর হাসি', 'গঙ্গার মূর্তি', 'বিন্ধ্যগিরি', 'পদ্মফুল' প্রভৃতি কবিতায়। লিরিক মাধুর্যে হৃদয়ভাব প্রকাশ করার দক্ষতায় হেমচন্দ্র তাঁহার সমকালে অদ্বিতীয় ছিলেন।

অনুবাদ-মূলক ও ব্যঙ্গাত্মক কবিতা

হেমচন্দ্রের অনুবাদমূলক কবিতাগুলি বাঙালী পাঠককে ইংরাজী কবিতার স্বাদ দিবার পক্ষে অনুপযুক্ত ছিল না। Dryden-এর Alexander's Feast অনুসারে 'ইন্দ্রের সুধাপান', Pope এর Eloisa to Abelard অনুসারে 'মদন পারিজাত', Longfellow এর Psalm of Life অনুসারে 'জীবনসঙ্গীত', Shelley র Skylark অনুসারে 'চাতক পক্ষীর প্রতি', Tennyson এর New Year অনুসারে 'নববর্ষ' প্রভৃতি অনুবাদমূলক কবিতাগুলি বাঙালী পাঠক সমাজে বেশ

আদৃত হইয়াছিল। হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গাত্মক কবিতাগুলির অধিকাংশই 'কবিতাবলী'র দ্বিতীয়খণ্ডে এবং 'বিবিধ কবিতা' নামক সংকলনে প্রকাশিত হয়। সমসাময়িক সরস ঘটনা অবলম্বনে ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় তিনি ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যরীতির সার্থক ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই জাতীয় রচনায় হেমচন্দ্র বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। হালকা ধরণে লেখা এই কবিতাগুলি বেশ সুখপাঠ্য। ইংরেজ শাসকদের হিন্দুপ্রীতিকে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন,

লাথি কিল পটাপট, জুতো চড় চটাচট,
লিভর-পীলে ফটাফট আপনি যেতো ফেটে।
আমরাই করুণায়, মলম মাখায়ে গায়
রাখিতাম কোলে করে হিন্দুর সন্তানে।
সিংহ যেন মৃগ রাখে স্বর্গের বাগানে।

"বাজিমাৎ" কবিতায় কবি ইংরাজের পদলেহনকারী জাতীয়তাবর্জিত বাঙালীর প্রতি শাণিত ব্যঙ্গ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। 'বাঙালীর মেয়ে', 'সাবাস হুজুগ আজব শহরে', 'হায় কি হলো', 'নেভার নেভার', 'দেশলাইয়ের স্তব' প্রভৃতি কবিতায় হেমচন্দ্র ভাষাভঙ্গি ও ছন্দ-অলঙ্কার প্রয়োগে শিল্পীর নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার গীতিকবিতা ও ব্যঙ্গকবিতাগুলি মামুলি রচনামাত্র নয়।

৮। নবীনচন্দ্র সেনের কবি-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য কি? তাঁহার কাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উত্তর। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে মহাকাব্য রচয়িতারূপে মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের নামের সহিত নবীনচন্দ্র সেনের নামও সমকালে উচ্চারিত হয়। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সেখানে বিখ্যাত উকিল ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি উচ্ছ্বাসপ্রবণ এবং কাব্যপ্রিয় ছিলেন। কলিকাতায় এফ্. এ. পড়িবার সময় হইতে তিনি কিছু কিছু গীতিকবিতা রচনা করিতে থাকেন। নবীনচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে বেশ কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন কিন্তু তাঁহার মধ্যে দেশপ্রেমের আবেগ লক্ষ্য করিয়া ইংরাজ সরকার নবীনচন্দ্রকে পুরী, রাজগির প্রভৃতি স্থানে বদলী করেন। সেই সব স্থানের প্রাচীন স্মৃতিগুলি কল্পনাপ্রবণ কবির মনে বিশেষ ভাবাবেগ জাগাইয়া তোলে। তিনি নিপুণ অধ্যবসায়ে প্রাচীন ভারতের ধর্মগ্রন্থাদি, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পাঠ করেন। সেই জ্ঞান ও প্রেরণার ফলে তিনি কয়েকখানি আখ্যান-কাব্য এবং

ব্যক্তি-পরিচয়

ত্রয়ী-মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্রের মৃত্যু, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি অমর। তাঁহার জীবিতকালেই তিনি মহাকবির সম্মান পাইয়াছিলেন। তাঁহার কবি-প্রতিভায় বায়রণের উচ্ছ্বাস, কীট্‌স্ এর সৌন্দর্যপ্রিয়তা এবং শেলীর অতীন্দ্রিয় বিশ্বাসবোধ সঞ্চারিত হইয়াছিল। মিলটন-ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত সংযম-শাসন ও ক্লাসিক-সংহতি তাঁহার কাব্যে এবং ব্যক্তি-চরিত্রে ছিল না বলিয়াই তিনি সার্থক মহাকবি-রূপে গৃহীত হন নাই।

নবীনচন্দ্র গীতিকাব্য, আখ্যান কাব্য এবং মহাকাব্য রচনা করেন। তিনি 'প্রবাসের পত্র', 'আমার জীবন' এবং 'ভানুমতী'-উপন্যাস লিখিলেও গদ্য লেখক-রূপে তাঁহার উল্লেখ হয় না। কবিতা-কাররূপেই তিনি ইতিহাস-খ্যাত।

রচনাবলী

রোমান্টিক গীতিকবিতা লিখিয়াই তিনি কবি-জীবনের সূচনা করেন। তাঁহার কাব্যগ্রন্থ 'অবকাশরঞ্জিনী' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৮-এ। তাঁহার আখ্যান-কাব্য তিনখানি—'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫), 'ক্লিওপেট্রা' (১৮৭৭), 'রঙ্গমতী' (১৮৮০)। তাঁহার মহাপুরুষ-জীবনী-কাব্যও তিনখানি—'খৃষ্ট' (১৮৯১), 'অমিতাভ' (১৮৯৫), 'অমৃতাভ' (১৯০৯)। তাঁহার উল্লেখযোগ্য কবিকৃতি, চৌদ্দবৎসরের নিরলস সাধনার ফল তিনখানি মহাকাব্য—'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) এবং 'প্রভাস' (১৮৯৬)। এই কাব্যত্রয় পরস্পর সম্পৃক্ত, একই নায়ক এবং একই কাহিনীর বিস্তার। এইজন্য ইহাকে ত্রয়ীকাব্য বলা হয় এবং ইহার কাব্যবিচার একসঙ্গেই করা হয়। নবীনচন্দ্র তাঁহার জীবনের উপলব্ধি, জ্ঞান ও মনীষার নিপুণ পরিচয় তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ভগবদ্‌গীতা ও মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্রের মূল প্রতিভার মধ্যে গীতিকবিসুলভ আবেগ, রোমান্টিক কল্পনার অতিচার ও ভাববিহ্বলতার প্রাধান্য ছিল। তাঁহার 'অবকাশরঞ্জিনী'

গীতিকবি রূপে নবীনচন্দ্র

কাব্য উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার সংকলন। কবিতাগুলিতে তাঁহার ব্যক্তি-আত্মার চমৎকার প্রতিফলন ঘটিয়াছে। 'অবকাশরঞ্জিনী'র প্রথম খণ্ডে বাইশটি কবিতা সংকলিত হইয়াছিল। 'বিধবাকামিনী' কবিতাটিতে কবির সহানুভূতির স্পর্শে স্বামিহীনার করুণ মূর্তি বেশ জীবন্ত হইয়াছে।

> "এখনও দেখি যেন নয়নের কাছে,
> দীনভাবে, ম্লানমুখে, বসিয়া দুঃখিনী ;

ভাবিতেছে এ সংসারে কার ভাবে বাঁচে,
নীরবে বিরলে বসি, কাঁদে অনাথিনী।"

'পিতৃহীন যুবক', 'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী', 'হৃদয়-উচ্ছ্বাস', 'বিষণ্ণ কমল' প্রভৃতি কবিতায় কবির ব্যক্তিমনের রোমান্টিক রস স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীলতায় প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে তেতাল্লিশটি কবিতা ছিল। যুবরাজ এডোয়ার্ডের ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষে লেখা 'ভারত-উচ্ছ্বাস' কবিতাটির জন্য কবি ইংলণ্ড হইতে পঞ্চাশ গিনি পুরস্কার পান। 'অবকাশরঞ্জিনী'র দ্বিতীয় খণ্ডে সমসাময়িক ঘটনা লইয়া লেখা এই জাতীয় কিছু কবিতা থাকিলেও কবির প্রধান সুর ছিল রোমান্টিক ব্যাকুলতা। 'কেন দেখিলাম', 'কি করি', 'উত্তর' প্রভৃতি কবিতায় কবির প্রণয়ানুভূতি, বাসনার আবেগ, সৌন্দর্যের আকর্ষণ, প্রেমের স্বপ্ন ললিত-মধুর ছন্দে প্রকাশ পাইয়াছে। এই জাতীয় লিরিক কবিতায় নবীনচন্দ্র বিহারীলাল-রবীন্দ্রনাথ-গোষ্ঠীর স্বগোত্র হইয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্রের রোমান্টিক মনের আখ্যানপ্রিয়তার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে কয়েকখানি আখ্যান-কাব্যে। ইহার মধ্যে জাতীয় ভাবের অনুপ্রেরণায় লিখিত **'পলাশীর যুদ্ধ'**ই প্রধান। মতিলাল ঘোষের উৎসাহে তিনি বাঙালীর স্বাধীনতালোপের কাহিনী লেখেন। ক্লাইভের অপকৌশলে, জগৎশেঠ ও মিরজাফরের ষড়যন্ত্রে সিরাজের পতনের কাহিনী কাব্যের বিষয়। মোহনলালের স্বগতোক্তির মধ্যে কবির মনের পরাধীনতার বেদনাবোধ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঐতিহাসিক গাথাকাব্যখানিতে পাঁচটি স্বর্গ। চরিত্রগুলি খুব সুস্পষ্ট হয় নাই। অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে কবি কাহিনীবন্ধন শিথিল করিয়াছেন এবং পরিমিতিবোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার দ্বিতীয় কাব্য **'ক্লিওপেট্রা'**। মিশরের চরিত্রহীনা রূপসী রাণী অনেক রাজনৈতিক নেতার সর্বনাশ করিয়াছিল। নবীনচন্দ্র ইতিহাস-খ্যাতা এই রমণীটিকে এই ক্ষুদ্র কাব্যের মধ্যে সহানুভূতির সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। সাহিত্য-রসিকেরা এই কাব্যখানির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করেন নাই, কিন্তু ইহার রোমান্টিক সৌন্দর্য উপেক্ষণীয় নয়। নবীনচন্দ্রের অপর আখ্যান-কাব্যের নাম **'রঙ্গমতী'**। ইহা চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল রাঙ্গামাটির কাহিনী। কাব্যের নায়ক বীরেন্দ্র, নায়িকা কুসুমিকা। কাব্যখানির পরিণাম বড় শোক-করুণ। কবির ভাষায়—"এক বৃন্তে ফুটেছিল দুটি ফুল সংসার-কাননে; একসঙ্গে দুটি ফুল পড়িল ঝরিয়া।" ছয়টি সর্গে কবি এক অদ্ভুত

আখ্যান-কবি রূপে নবীনচন্দ্র

রোমান্টিক কাহিনী রচনা করিয়াছেন ইতিহাসের পটভূমিতে, কিন্তু সে ইতিহাস আগোগোড়াই কল্পনা দিয়া গড়া। Scott এর Lady of the Lake কাব্যের প্রভাব এখানে আছে, হয়ত অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্যের রোমান্টিক প্রেম-কথা নবীনচন্দ্রের কল্পনাকে উজ্জীবিত করিয়াছিল। কিন্তু নবীনচন্দ্রের কবিস্বপ্ন, হিন্দুজাতিত্ববোধের অনুভূতি-তীক্ষ্নতা এবং রোমান্টিক প্রেমের ব্যাকুলতা এই কাব্যের বয়ন-শিল্পে কবির নিজের স্বাক্ষরকে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে।

ধর্মসাহিত্য নিপুণভাবে চর্চা করার ফলে নবীনচন্দ্রের মনে মহাপুরুষদের জীবন-কাহিনী সম্বন্ধে প্রভূত কৌতুহল জাগিয়াছিল। তাহার ফলে তিনি ধর্মগুরুর জীবন-কথাকে কাব্যকথায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে কবির মনের একটি বিশেষ অনুভূতি এই কাব্যগুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে। অন্যথা ইহার বিশেষ কোন কাব্যগুণ নাই। যীশুখ্রীষ্টের জীবনী অবলম্বনে লেখা **'খৃষ্ট'** কাব্যে বাইবেল কাহিনীর অনুসরণ এবং মানব-প্রেমিক যীশুর মূর্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আছে। বুদ্ধদেবের জীবন-কথা **'অমিতাভ'** কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। সিদ্ধার্থের জীবে-প্রেম ও ত্যাগের মাহাত্ম্যকে কবি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা অবলম্বনে লিখিত 'অমৃতাভ' কাব্য তাঁহার শেষ জীবনের রচনা এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত। ভক্তিভাবের উচ্ছ্বাস এই কাব্যের বিশেষত্ব। এই জাতীয় কাব্যে ছন্দে লেখা বিবৃতিই প্রধান, শিল্প-কলাকুশলতার একান্ত অভাব।

মহাপুরুষদের জীবনী-কাব্যে নবীনচন্দ্র

নবীনচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ত্রয়ী কাব্য। ইহার জন্যই তাঁহার নিন্দা-প্রশংসা। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের পৌরাণিক আখ্যানকে উনবিংশ শতাব্দীর মানবতাবাদে জারিত করিয়া ইনি ত্রয়ী কাব্য লেখেন। **'রৈবতক'** এ সুভদ্রাহরণ, **'কুরুক্ষেত্রে'** অভিমন্যুবধ এবং **'প্রভাসে'** যদুবংশ ধ্বংস কাব্যত্রয়ের কেন্দ্রীয় ঘটনা। মহাভারতের কাহিনীর সহিত কল্পিত ঘটনা ও চরিত্র সংযোজন করিয়া নবীনচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর নবমহাভারত রচনা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাকে The Mahabharata of the Nineteenth Century নাম দিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। মহাভারত কাহিনীর রূপান্তরে বা ব্যতিক্রমে কাব্যখানির অপরাধ যত, তদপেক্ষা অনেক বেশি অপরাধ যে কবি অসংযত কল্পনায় এবং অতিরিক্ত

মহাকাব্যকার রূপে নবীনচন্দ্র

উচ্ছ্বাস ও প্রসঙ্গান্তরের সৃষ্টি করিয়া মহাকাব্যের সংহতি ও মহিমা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ মহাকাব্যের উপযোগী ঘটনাসংস্থান (Plot) ও চরিত্রসৃষ্টি (Character) এই কাব্যে নাই। কৃষ্ণ "এক ধর্ম এক রাজ্য এক সিংহাসন" স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন, সংকল্প গ্রহণ করিলেন—"খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতে এক সূত্রে গেঁথে দেব আমি"। আর্য-অনার্যের মিলন ঘটাইয়া মহান ভারতবর্ষ রচনার সংকল্প মহাকাব্যের উপযোগী বিষয় বটে। কিন্তু প্রথমেই দুর্বাসাকে লইয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে বিরোধ বাঁধিল এবং কাহিনীটি এক রোমান্টিক প্রেমের উপাখ্যান হইয়া উঠিল। অর্জুন সুভদ্রার অনুরাগী, সুভদ্রাকে পাইবার জন্য বাসুকি ব্যাকুল, জরৎকারু কৃষ্ণানুরাগিণী, প্রেম-প্রত্যাখ্যাতা হওয়ায় সে প্রতিহিংসাবশে কৃষ্ণবিদ্বেষী দুর্বাসাকে বিবাহ করিল। শৈলজাকে বাসুকি অর্জুন হত্যায় নিয়োগ করিলে সে পুরুষের ছদ্মবেশে অর্জুনের সান্নিধ্যে আসিয়া অর্জুনের প্রেমে পড়িল। এইভাবে এক বিস্ময়কর প্রেমের গল্পে মহাকাব্যের আদর্শ ভাসিয়া গেল, কাহিনী হইল কেন্দ্রচ্যুত। নায়ক কৃষ্ণ একেবারেই নিষ্ক্রিয় চরিত্র। মুখে তাঁহার বড় বড় তত্ত্বকথা এবং কাজে পারিবারিক জীবনে লঘু হাস্যরসে অবসর বিনোদন। সুভদ্রা, সুলোচনা প্রভৃতি চরিত্রগুলি নিতান্তই অবাস্তব। অপৌরাণিক ও অনৈতিহাসিক আখ্যান পরিকল্পনা এবং অবাস্তব চরিত্র সৃষ্টির জন্য ত্রয়ী কাব্য ব্যর্থ হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, কবি লিরিক উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে বর্ণনাগুলিকে তরলিত করিয়া মহাকাব্যের সংযম বিনষ্ট করিয়াছেন, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগেও নৈপুণ্যের অভাব। চরিত্রে ও পরিস্থিতিতে কিঞ্চিৎ নাটকীয়তা থাকায় কোন কোন স্থলে কাহিনী আকর্ষণীয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সচ্ছন্দে এই মন্তব্য করা যায় যে, মহাকাব্যের গঠন-শিল্প ও চরিত্র-সৃষ্টির বিশেষত্ব সম্বন্ধে নবীনচন্দ্রের ধারণা তেমন স্পষ্ট ছিল না। তাই তিনি মহাকাব্য রচনার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

৯। আখ্যায়িকা কাব্য ও মহাকাব্যের পার্থক্য নির্ণয় করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন কবির তুলনামূলক আলোচনা কর।

উত্তর। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর চিত্তজাগরণ ও বাংলা সাহিত্যের অভূতপূর্ব পরিবর্তন রেনেসাঁ বা নবজাগরণ নামে পরিচিত হইয়াছে। সেই জাগরণের প্রথম উল্লেখযোগ্য ফল দেখা গিয়াছিল বাংলা কাব্যের

ক্ষেত্রে। মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য ও গীতিকাব্যে বাঙ্গালীর মানসমুক্তি ঘটে। কয়েকটি বিস্ময়কর প্রতিভা বাংলা সাহিত্যের নবযুগ প্রবর্তন করে। অমৃতলাল বসু মন্তব্য করিয়াছিলেন, "জাহাজ মেরামত করার ডকের জন্য খিদ্দিরপুর প্রসিদ্ধ কিন্তু এখানে একসময়ে বড় বড় কয়েকখানি জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাদের প্রধান তিনখানির নাম রঙ্গলাল, মধুসূদন ও হেমচন্দ্র। ঐ তিনখানি জাহাজই যে ছোটবড় তরঙ্গ তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহার আন্দোলনে আজিও সমগ্র বঙ্গদেশ দুলিতেছে।" বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীতে ছোট বড় তরঙ্গ তুলিয়াছিল অখ্যানকাব্য, গীতিকাব্য, মহাকাব্য। এই যুগের মহাকাব্য সংস্কৃত মহাকাব্যের আদর্শে রচিত হয় নাই। ইংরাজী Literary Epic or Epic of art অনুসারে রচিত হয়। সাহিত্য-প্রচেষ্টার প্রাথমিক স্তরে ইংরাজী Narrative poem এর আদর্শে আখ্যান কাব্য রচিত হইয়াছিল। আখ্যানকাব্যে কোন ঐতিহাসিক বা কাল্পনিক কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া হৃদয়াবেগ-প্রধান ভাবধারাকে স্ফুরিত করা হয়। দেশের জন্য আত্মত্যাগ, সতীত্ব রক্ষায় প্রাণ বিসর্জন, প্রেমের জন্য দুঃখবরণ, স্বাধীনতার জন্য ত্যাগ স্বীকার প্রভৃতি কোন লৌকিক ভাবকে অবলম্বন করিয়া বীর ও করুণ রসাত্মক কাহিনীকে ছান্দোবদ্ধ ভঙ্গীতে প্রকাশ করাই আখ্যান কাব্যের বৈশিষ্ট্য। হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রভৃতি কবিরা আখ্যানকাব্যের রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস

আখ্যান-কাব্যের বৈশিষ্ট্য

যে যুগে আখ্যান কাব্য রচিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল সেই যুগে মহাকবি মধুসূদনের প্রতিভায় পাশ্চাত্ত্য Epic এর আদর্শে মহাকাব্য রচনার প্রেরণা জাগে। মহাকাব্যের বিষয়বস্তু সাময়িক আবেগ মাত্র নয়, প্রসিদ্ধ ইতিহাস ও পুরাণ অবলম্বনে একটি বিশাল কাহিনী থাকে ইহার উপজীব্য। একটি মহৎ শাশ্বত নীতি দ্বারা শাসিত হইয়া মহাকাব্যের কবি জাতির জীবনবেদ রচনা করেন। মানুষের আকাশস্পর্শী আকাঙ্ক্ষা, জীবনপ্রয়াসের দুরন্ত অভীপ্সা, অপরাজেয় প্রাণশক্তির দুর্জয় ঐশ্বর্য মহাকাব্যের মধ্যে রূপায়িত হইয়া থাকে। কাহিনীগত বিশালতা, কল্পনার সমুন্নতি, বর্ণনার চমৎকারিত্ব, ছন্দ ও অলংকারের বৈচিত্র্য মহিমান্বিত মহাকাব্য রচনার মূল্যবান উপকরণ। বাঙালী মানসে

মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য

মহাকাব্যের উপযোগী সমুন্নত মহিমাবোধ না থাকায় উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে সমুন্নত মহাকাব্য রচিত হইতে পারে নাই। মধুসূদন নবযুগের মহাকাব্য রচনার ভিত্তি রচনা করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। আরও কোন কোন কবি মহাকাব্য রচনার জন্য সাজসজ্জা করিয়া আসরে নামিয়াছিলেন, কিন্তু বিপুল বিশাল কাহিনীকে সুসংহত করিয়া নিখুঁত বস্তুধর্মী করিয়া তুলিতে না পারায় মহাকাব্য রচনার প্রয়াসগুলি আখ্যান কাব্য রচনায় পর্যবসিত হইয়াছে। কবিদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, তাঁহাদের জীবন-চৈতন্য ও আনন্দ-বেদনা, ঐতিহাসিক ও রোমাণ্টিক কাহিনীর মধ্যে এমন আবেগ-পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় যে, যাহাকে Epic Solidarity বলে, তাহা রক্ষিত হইতে পারে নাই। সুতরাং এই যুগে অধিকাংশ কবির রচনাই আখ্যান বা গাথা কাব্যে পর্যবসিত হইয়াছে।

মহাকাব্য রচনার প্রয়াস

মহাকাব্য রচনার সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন মধুসূদন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যের দুইটি সর্গ প্রকাশিত হওয়ায় বাঙালী :পাঠকসমাজে বিপুল বিস্ময় জাগে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের অভিনবত্বে, অলংকার প্রয়োগের চাতুর্যে ও কল্পনাগত সমুন্নতিতে মধুসূদনের এই মহাকাব্যখানি উনবিংশ শতাব্দীর মহাকাব্যধারার সূত্রপাত বলিয়া গণ্য। ইহার পরবৎসর হোমারের 'ইলিয়ড' কাব্যকে স্মৃতিপথে রাখিয়া মেঘনাদের নিধন অবলম্বনে নয় সর্গে সম্পূর্ণ 'মেঘনাদবধ' কাব্য রচিত হইল। এই কাব্যখানি মহাকাব্য কল্পনার চরম অভিব্যক্তি। ইহার মধ্যে মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনের বিলাপ-বেদনা ও হাহাকার প্রমূর্ত হইলেও উন্নত স্তরের মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণগুলি এই কাব্যেই প্রমূর্ত হইয়া উঠে।

'মেঘনাদবধ' কাব্য মহাকাব্যরচনার সার্থক প্রচেষ্টা

মধুসূদনের অনুকরণে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বৃত্রসংহার কাব্য রচনা করেন। ইহার পৌরাণিক কাহিনী মহাকাব্যের উপযোগী বিশাল ও মহিমান্বিত। দানবগণ কর্তৃক স্বর্গবিজয়, স্বর্গ উদ্ধারের জন্য দধীচির অস্থি দান, অধর্মের ফলে বৃত্রের সর্বনাশ যথার্থ মহাকাব্যের বিষয় বটে। বৃত্রসংহারের কাহিনীগত বিশালতা ও বর্ণনাগত সংহতি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের তুলনায় বৃত্রসংহার দুর্বল রচনা। বৃত্রসংহার কাহারও মতে Heroic tale মাত্র। কেহ বা বলিয়াছেন যে, ইহার নাম 'বৃত্রসংহার' এর পরিবর্তে 'ঐন্দ্রিলা

পরাভব' রাখিলে ভাল হয়। অনেক মহৎ নীতিকথা, বড় বড় যুদ্ধবর্ণনা, প্রকৃতির চিত্র রচনা উল্লেখযোগ্য হইলেও হেমচন্দ্রের কবিপ্রতিভায় মহাকাব্যের উপযোগী কল্পনা-সমুন্নতি ছিল না। ভাষাভঙ্গী ও বাঙ্‌নির্মিতির কৌশলও তাঁহার আয়ত্ত নয়। তিনি মূলত আবেগপ্রধান গীতিকবি। গীতিকবিতা ও লঘুচালের বৈঠকী কবিতায় তিনি যে পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন তাহার বহু পরিচয় ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। তবে আখ্যান কাব্য এবং রূপক কাব্য রচনায় হেমচন্দ্রের কবিত্বশক্তি প্রশংসনীয়। কাল্পনিক ইতিহাসের পটভূমিকায় স্বদেশ-প্রেমমূলক একখানি আখ্যান কাব্য তিনি রচনা করেন। কাব্যখানির নাম 'বীরবাহু'। দান্তের 'Devina Comedia' গ্রন্থের অনুসরণে তিনি 'ছায়াময়ী' নামে একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন। 'দশমহাবিদ্যা' নামক রূপক কাব্যে পৌরাণিক কাহিনীর আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা কৌতুককর হইয়াছে বটে; কিন্তু আখ্যানরস নিবিড়ভাবে জমিয়া উঠে নাই। সুতরাং হেমচন্দ্র মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্য কোন কাব্য রচনায়ই উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

'বৃত্রসংহার' মহাকাব্য-রচনার অন্যতম অসার্থক চেষ্টা

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা মহাকাব্যের ইতিহাসে নবীনচন্দ্র সেন একটি স্মরণীয় ব্যক্তি। ইনিও মহাকাব্য রচনার প্রেরণা দ্বারা অভিভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র অবলম্বনে ত্রয়ী মহাকাব্য রচনা করেন। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস এই তিনখানি কাব্যকে ত্রয়ী মহাকাব্য বলা হয়। রৈবতকে সুভদ্রা ও অর্জুনের পরিণয়, কুরুক্ষেত্রে অভিমন্যুর নিধন এবং প্রভাসে যদুবংশ ধ্বংস ও কৃষ্ণের তনুত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে। ত্রয়ী কাব্য কৃষ্ণের জীবন অবলম্বনে একটি সুদীর্ঘ কাহিনী। ইহার মধ্যে নানা উপকাহিনীও আছে। জরুৎকারু, শৈলজা, দুর্বাসা, বাসুকি প্রভৃতি নানা চরিত্র ও ঘটনার মধ্য দিয়া কাহিনী শাখায়িত বিস্তার লাভ করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর নব মানবতাবোধ এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শনের অভিনব চিন্তা-প্রণালীকে ভারতীয় সংস্কারের সহিত মিলাইতে গিয়া নবীনচন্দ্র মহাকাব্যোচিত রসনিষ্পত্তি করিতে পারেন নাই। তাঁহার মধ্যে সংযম ও সামঞ্জস্যবোধ ছিল না। তাঁহার তিনখানি কাব্যই গীতিকাব্যের মনোভাব দ্বারা পরিচালিত। পৌরাণিক আখ্যান কাব্যরূপে ইহা কিঞ্চিৎ সার্থক হইলেও, মহাকাব্যরূপে একেবারেই ব্যর্থ। বস্তুতঃ মহাকাব্য রচনার উদ্যম ও প্রয়াস এই যুগে একেবারেই

নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য-রচনার প্রচেষ্টা

ব্যর্থ হইয়াছিল। মধুসূদনের মধ্যেই মহাকাব্যের সমুন্নত মহিমা এবং উহার গৌরবরশ্মি সেইখানেই শেষ দীপ্তি প্রকাশ করিয়া নিস্প্রভ হইয়া গিয়াছে। মহাকাব্য রচনায় অন্যতর প্রয়াসগুলি বাঙালী সমাজে কোন চিহ্ন রাখে নাই। উহা গবেষকদের সন্ধানের বিষয় মাত্র। দীননাথ ধরের 'কংসবিনাশ', বলদেব পালিতের 'কর্ণার্জুন', মহেন্দ্র শর্মার 'নিবাতকবচ বধ', হরগোবিন্দের 'রাবণবধ', যোগীন বসুর 'পৃথ্বীরাজ' অলংকারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য রচনার প্রয়াস বটে, কিন্তু এই কবিদের গ্রন্থের সহিত বাঙালী পাঠকের কোন পরিচয়ই নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে, মহাকাব্য রচনার শক্তিরও যেমন অভাব ছিল, মহাকাব্য পাঠের আগ্রহও তেমন ছিল না। কিন্তু উপন্যাস সাহিত্যের বিস্তারের অব্যবহিত পূর্বে রোমান্টিক আখ্যানকাব্যের জন্য বাঙালী পাঠকদের মধ্যে কিঞ্চিৎ আগ্রহশীলতা দেখা দিয়াছিল।

মহাকব্যরচনার অসার্থক প্রচেষ্টা

হেমচন্দ্রের 'বীরবাহু' আখ্যান কাব্য প্রথম প্রকাশের পর কিছুদিন আদৃত হইয়াছিল। নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ', 'ক্লিয়োপেট্রা', 'রঙ্গমতী' বর্ণনামূলক কাব্যরূপে উল্লেখযোগ্য। ইনি দ্বিচারিণী ক্লিয়োপেট্রাকে অসতী বলিয়া শাস্তি দেন নাই। ব্যর্থ প্রেমকাঙ্ক্ষার কারুণ্যকে পাঠকহৃদয়ে সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি অঞ্চলের একটি লৌকিক কাহিনীকে ইতিহাসের সহিত মিশাইয়া লইয়া রোমান্টিক প্রেমের এক আখ্যান রচনা করেন 'রঙ্গমতী'তে। 'অমৃতাভ', 'অমিতাভ' মহাপুরুষের জীবনকথা হইলেও আখ্যান রসের মাধুর্যে উপভোগ্য। বিশুদ্ধ আখ্যানকাব্য রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। তাঁহার 'উদাসিনী' কাব্য একদা জনপ্রিয় হইয়াছিল। সরলা ও সুরেন্দ্র এই দুইটি তরুণ-তরুণীর প্রেমজীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের বৈচিত্র্য কাব্যখানিকে রোমান্টিক রসে অভিসিঞ্চিত করিয়াছে। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'যোগেশ কাব্য' রচনা করিয়া মমস্তত্ত্বমূলক একটি উপন্যাস কাহিনীকে রোমান্টিক আখ্যায়িকা কাব্যে পরিণতি দিয়াছিলেন। বিবাহিত যুবক যোগেশ মন্দাকিনী নাম্নী একটি বিবাহিতা তরুণীর প্রতি প্রচণ্ড কামনায় সমাজ, সংসার, ধর্ম্ম, কর্তব্য সব বিস্মৃত হইয়াছিল। আত্মদমনের প্রচণ্ড প্রয়াসে বিপর্যস্ত তরুণ শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করিয়া মানসিক

নবীনচন্দ্রের আখ্যানকাব্য

অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্য

ঈশান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগেশ' কাব্য

দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়। এই করুণ কাহিনীটি লেখকের জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল। তাই ইহাতে অকৃত্রিম আবেগ প্রকাশ পাইয়াছে। করুণরসাত্মক আখ্যানকাব্য রূপে কল্পনাপ্রবণ পাঠকের বড় আদরণীয় গ্রন্থ এই 'যোগেশ কাব্য'। কিন্তু আখ্যান কাব্যও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। গীতিকাব্যের প্রতি গভীরতম আকর্ষণের ফলে মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্যের ধারা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

১০। রোমান্টিক গীতিকবিতার প্রবর্তয়িতারূপে বিহারীলাল চক্রবর্তীর কাব্যসাধনার বিবরণ দাও।

উত্তর। বিহারীলাল চক্রবর্তী উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে মহাকাব্য-আখ্যান কাব্যের দুন্দুভি নিনাদের মধ্যে অকস্মাৎ সানাইয়ের করুণ-মধুর রাগিণী সঞ্চার করিয়া বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে পালাবদলের সূচনা করিয়াছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার নিমতলা অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজে তিনি কাব্য ও অলংকার শাস্ত্র সাগ্রহে পাঠ করিয়াছিলেন। কোন ইংরাজিনবীশ বন্ধুর কাছে তিনি সেকস্‌পীয়র, স্কট, বায়রণ, মূর প্রভৃতি ইংরাজ সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ রচনাবলী সযত্নে পাঠ করেন। মনে হয় রোমান্টিক কবি শেলী ও কীট্‌সের কাব্যের সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় ছিল। তরুণ বয়স হইতেই তিনি গীতিকাব্য রচনায় উৎসাহী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার পাঠকসংখ্যা বেশি ছিল না। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁহার অকৃত্রিম সুহৃদ এবং অনুরাগী পাঠক ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী কবিকে খুব উৎসাহ দিতেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার বড়াল বিহারীলালের অনুরাগী ভক্তরূপে কাব্যদীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কবির মৃত্যু হয়। তখন রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের কবিত্বের মর্মসত্য ব্যাখ্যা করিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করায় এবং অক্ষয়কুমার বড়াল প্রশস্তি কাব্যে কবিকে 'ভোরের পাখী' রূপে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করার পর শিক্ষিত পাঠক মহলে বিহারীলালের কাব্যের সমাদর হইতে থাকে।

ব্যক্তি-পরিচয়

বিহারীলাল 'পূর্ণিমা' পত্রিকায় রচনা প্রকাশ করিতেন। পরে তাঁহার অধিকাংশ রচনাই 'অবোধবন্ধু' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রথম পুস্তক গদ্য নিবন্ধ 'স্বপ্নদর্শন' (১৮৫৮)। তারপর ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীন কাব্যধারা অনুসারে লেখা 'সঙ্গীতশতক' প্রকাশিত হয়। 'বন্ধুবিয়োগ',

'নিসর্গ-সন্দর্শন', 'প্রেম-প্রবাহিণী' ও 'বঙ্গসুন্দরী' এই চারিখানি কাব্য প্রকাশিত হয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি 'সারদা-মঙ্গল' কাব্য প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার ক্ষুদ্র কাব্য 'মায়াদেবী' 'ভারতী' পত্রে ১৮৮২ সালে মুদ্রিত হয়। এই সময়ে 'ধূমকেতু' এবং 'দেবীরাণী' কবিতাও প্রকাশিত হয়। 'শরৎকাল', 'নিশীথ সঙ্গীত' প্রভৃতি খণ্ডকবিতা ১৮৯২ সালে 'প্রয়াস' পত্রিকায় ছাপা হয়। 'কবিতা ও সঙ্গীত' নামে কয়েকটি গানের সংকলন এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে লেখা একখানি 'পত্রকাব্য' 'পুণ্য' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বাউল-বিংশতি' নামে বাউল গানের একটি সংকলনও বিহারীলালের কবিকৃতি। তাঁহার সর্বশেষ কাব্য 'সাধের আসন'। এই কাব্যে দশটি সর্গ এবং একটি উপসংহার আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবীর অনুরোধে কাব্যখানির রচনারম্ভ। ১৮৮৩ সালে কাদম্বরীর মৃত্যুর পর কাব্যখানি সমাপ্ত হয়। এই কাব্যের প্রথম তিন সর্গ 'মালঞ্চ' পত্রে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়াছে।

রচনাবলী

আধুনিক রোমান্টিক গীতিকাব্যধারার প্রথম প্রবর্তয়িতারূপে কবি বিহারীলাল সাহিত্যক্ষেত্রে নিত্যকালের আসন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যের মধ্যে তাঁহার প্রতিভার এক অভিনব প্রকাশ ঘটিয়াছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং আত্মনিষ্ঠতা দ্বারা জীবন ও জগতের প্রকাশকে এমন বিস্ময়কর মাধুর্যে ভরিয়া তোলার দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে বিহারীলালের পুর্বে আর দেখা যায় নাই। 'নিসর্গ-সন্দর্শন' এবং 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে তিনি প্রকৃতি ও নারীর বাহ্যরূপের বর্ণনা করিয়া বস্তুভারহীন নির্বিশেষ সৌন্দর্যের এক অবিনশ্বর মূর্তি রচনা করিয়াছেন। 'নিসর্গ-সন্দর্শনে' প্রকৃতি কবির কাছে জড় বস্তুপিণ্ড মাত্র নহে। কবির আত্মার সহিত প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের নারীচিত্র মাতা, কন্যা, বধূ সবই—অথচ সবকিছুর অতিরিক্ত একটি শাশ্বতী নারী। বিশেষকে অবলম্বন করিয়া সামান্য বা নির্বিশেষে চিত্তের এই বিচিত্র প্রসারই বিহারীলালের কবি-প্রতিভার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। বিহারীলাল কাব্যকলার মন্ময়তা এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া পাশ্চাত্য লিরিকের আদর্শে গীতিমূলক কাব্যধারার সূচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমার

কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য

তাঁহাকে 'ভোরের পাখী' আখ্যা দিয়াছিলেন। বিহারীলালের কবি-প্রতিভার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তিনি কাব্যের কথাবস্তুকে অতিক্রম করিয়া আপন মনের নিগূঢ় অনুভূতিকে আবেগময় ভাষায় রূপায়িত করিতেন। তাঁহার 'প্রেম-প্রবাহিণী' এবং 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যের বিষয়বস্তু নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং বাস্তব অভিজ্ঞতামূলক। এমন বস্তুনিষ্ঠ বিষয়কেও কবি অমার্জিত সারল্যে সহজ সৌন্দর্যের মধ্যে নিজের ব্যক্তির কথায় অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ রচনায় পরিণত করিয়াছেন। কাব্যে তিনি 'নিজের সুর' ফুটাইতে জানিতেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।" বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কবি-কীর্তি 'সারদামঙ্গল' এবং 'সাধের আসন'। এই কাব্যদ্বয়ে কোন কাহিনী নাই, যুক্তির শৃঙ্খলা নাই, তত্ত্বপ্রচারের উদ্দেশ্যমূলকতা নাই। কবি যেন অভিভূত অবস্থায় নিজের অন্তঃপ্রকৃতির কথা, নিজের ভালো লাগা মন্দ লাগার কথা আবেগচঞ্চল অনর্থক প্রলাপের মত বলিয়া গিয়াছেন। প্রেম ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে কবির মনে যে সহজানুভূতি, কাব্যের কাহিনী ও প্রকাশ-শিল্পকে অতিক্রম করিয়া সেই অনুভূতি পাঠক হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া যায়। এই ভাবেই বিহারীলালের কবিত্ব তাঁহার কাব্য এবং কাব্যশিল্পকে অতিক্রম করে। তিনি যে পরিমাণ কবি সেই পরিমাণ শিল্পী হইলে বিহারীলালের হাতেই বাংলা সাহিত্যজগতের শ্রেষ্ঠ গীতিসাহিত্য রচিত হইত।

বিহারীলালের কাব্যে শিল্পগত ত্রুটি ছিল। রোমান্টিকতার আতিশয্যে কবি যুক্তি ও বুদ্ধির সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেন এবং বক্তব্য বিষয়কে যুক্তি ও শৃঙ্খলাগত পারম্পর্যে স্থাপন করিতে পারিতেন না। ঝড়ের বর্ণনার মধ্যে ছেলের কথা, সমুদ্রের বর্ণনার মধ্যে দ্বীপের প্রসঙ্গে ইংলণ্ড এবং সেই উপলক্ষে ভারতের পরাধীনতার কথা, সারদার সন্ধান প্রসঙ্গে হিমালয়ের সুদীর্ঘ বর্ণনা—এই ভাবতন্ময়তার ফলে প্রসঙ্গান্তর তাঁহার কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পগত ত্রুটি। ছন্দ ব্যবহারে কবির একটি সহজাত দক্ষতা ছিল। কিন্তু সচেতন শিল্পী ছিলেন না বলিয়াই বহু ছন্দোগত ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি আবেগবশে যাহা খুশি বলিয়া যাইতেন, রূপনির্মিতির প্রশ্নও তাঁহার মনে জাগিত না। ইহার জন্য শব্দ ব্যবহারে অমার্জিত ও অবাঞ্ছিত প্রয়োগ ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যগুরু সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "বিহারীলালের ছন্দে মিলের এবং ভাষার দৈন্য নাই। কিন্তু ভাষা স্থানে স্থানে সাধুতা পরিত্যাগ করিয়া অকস্মাৎ অশিষ্ট এবং কর্ণপীড়ক

শিল্পগত দুর্বলতা

হইয়াছে, ছন্দ অকারণে আপন বাঁধ ভাঙ্গিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছে।” ইহার একমাত্র কারণ এই যে, এই আত্মভোলা কবি নিজের আনন্দে নিজেকে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, প্রকাশের শিল্পসৌষ্ঠবের দিকে বিন্দুমাত্র খেয়াল করেন নাই।

বিহারীলালের কবিকৃতিকে সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করিলে হয়ত কাব্যরূপের খাঁটি সোনার পরিচয় মিলিবে না কিন্তু ইতিহাসে এই কথা স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত হইবে যে, তিনি উনবিংশ শতাব্দীর বিশুদ্ধ গীতিকবিতার জনক।

বিশুদ্ধ গীতিকবিতার জনকরূপে বিহারীলাল

মহাকাব্য রচনার গভীর কোলাহলে বিহারীলালের নিভৃত সঙ্গীত হয়ত অনেকেরই কর্ণগোচর হয় নাই। আত্মনিমগ্ন কবির আনন্দবেদনার গান কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাংলা সাহিত্যের আকাশ বাতাস পরিপ্লুত করিয়া দিয়াছিল। কবিসমালোচক মোহিতলাল বলিয়াছেন, “তাঁহার কাব্যের প্রধান লক্ষণ ভাব-বিভোরতা। তাঁহার কল্পনা অতিমাত্রায় subjective; তিনি যখন গান করেন, তখন সম্মুখে শ্রোতা আছে এমন কথাও ভাবেন না।” বিহারীলাল আত্মনিষ্ঠ মন্ময় কবিতার রচনা দ্বারাই বাংলা কাব্যে নূতন গতিপথের নির্দেশ দিলেন। অন্তর্মুখী কল্পনার নিগূঢ় ভাবাবেগ প্রকাশের প্রধান উপায় রূপে গীতিকবিতার ব্যবহারে সমসাময়িক কবিরা বিহারীলালের রচনা দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। আত্মনিষ্ঠ স্বগত ভাষণের যে স্বর্ণসূত্রের সন্ধান তিনি দিলেন তাহাতে ভাবের মালা গাঁথিবার উৎসাহে নবীন কবিরা উদ্যমশীল হইয়া উঠিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সেই শিষ্যসম্প্রদায়ের শিরোমণি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের রচনা বিশেষত ‘বাল্মীকি প্রতিভা’ স্পষ্টতই বিহারীলালের প্রভাবের ফল। উনবিংশ শতাব্দীর গীতিকাব্যের মধ্যে কবিদের আত্মানুভূতির প্রতিফলন দ্বারা যে উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার জন্ম সম্ভব হইয়াছে তাহার জন্য বিহারীলালের কাছেই বাঙালী জাতি চিরদিনের জন্য ঋণী হইয়া থাকিবে।

১১। মধুসূদন ও বিহারীলাল আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে দুইটি স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক। তাঁহাদের প্রবর্তিত কাব্যধারার কি পরিণতি হইয়াছিল, তাহা আলোচনা কর।

উত্তর। উনবিংশ শতব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ বাঙ্গালী মনীষার এক গৌরবময় অধ্যায়। ধর্ম-সংস্কারে, সমাজ সচেতনতায় এবং সাহিত্য সমৃদ্ধিতে বাংলাদেশ

এই সময় ফলেফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছিল। কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী আত্মপ্রকাশের চমৎকার সুযোগ করিয়া লইয়াছিল। এই সময় বাংলা কাব্য সাহিত্য দুইটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে। ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাবের পর বিহারীলাল প্রবর্তিত রোমান্টিক গীতি-কাব্যের একটা ধারা প্রবহমান হয়। অপর দিকে রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র মহাকাব্য এবং আখ্যান কাব্যের একটি ধারা প্রবর্তন করেন। উভয় ধারাই ইংরাজী সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবপুষ্ট। কিন্তু দুইটি ধারার গতিপথ হয় স্বতন্ত্র এবং এই শতাব্দীর শেষ পাদেই দেখা গেল যে মহাকাব্য ও আখ্যান কাব্যের ধারা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে এবং রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে গীতিকাব্যের ধারা বিস্ময়কর স্ফীতি লাভ করিয়া প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হইতেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সাহিত্য-সমৃদ্ধি

গীতিকাব্য ধারায় আধুনিক কালে প্রথম কবি ঈশ্বর গুপ্ত। তাঁহাকে সন্ধিযুগের কবি বলা হয়। তাঁহার রচনার আঙ্গিক প্রাচীন, কিন্তু বিষয়বস্তু আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসা দ্বারা পরিশীলিত। ইনি সামাজিক ব্যঙ্গ রচনা করিয়া কাব্যে নিজস্ব মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। গীতিকাব্যের এই ধারাটিই বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন ধারা। চর্যাপদ হইতে আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলীর পথ বাহিয়া কবিগান পর্যন্ত সেই ধারার প্রসার। কবির ব্যক্তিজীবনের অনুভূতির স্বচ্ছন্দ, সাবলীল এবং সঙ্গীতময় প্রকাশই গীতিকাব্যধারার বৈশিষ্ট্য। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রাকৃতিক চিত্র রচনায় এবং প্রেম ও সৌন্দর্য সম্বন্ধীয় অনুভূতিকে সাবলীল ছন্দে প্রকাশ করিয়া এই ধারাকে পুষ্ট করিয়াছিলেন।

গীতিকাব্য-ধারা

এই যুগে অপর একটি কাব্যধারা কাহিনীর আশ্রয়ে প্রবাহিত হয়। ইহা প্রাচীন মঙ্গল কাব্যের ধারার অনুরূপ। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে যে কাব্যযুগ গড়িয়া উঠে তাহার অধিনেতা ছিলেন মহাকবি মধুসূদন। রঙ্গলাল ও মধুসূদন আখ্যানকাব্য ও মহাকাব্যের একটি ধারা প্রবর্তন করেন। রঙ্গলাল গুপ্তকবির শিষ্য হইলেও তিনি ইতিহাস ও প্রবাদমূলক আখ্যান অবলম্বনে রোমান্টিক কাব্য লিখিয়াছিলেন। মহাকবি মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য Epic এর আদর্শে সুসংবদ্ধ

মহাকাব্য ও আখ্যান-কাব্যের ধারা

কাহিনীর আশ্রয়ে জীবন সম্বন্ধে নবতর ভাব ও কল্পনাসমৃদ্ধি প্রকাশ করিলেন। মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্য রচনার পথ প্রশস্ত হইল।

আত্মনিষ্ঠ মন্ময় গীতিকবিতার ধারা বিহারীলাল প্রবর্তন করেন। প্রকৃতির মধ্যে প্রাণসত্তার আবিষ্কার করিয়া, প্রেম ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে জীবনের কল্পনা-সুন্দর আবেগমধুর ভাব প্রকাশ করিয়া বিহারীলাল গীতিকবিতায় নূতন সুর যোজনা করিলেন। 'নিসর্গসন্দর্শন', 'বন্ধুবিয়োগ', 'সারদা-মঙ্গল', 'সাধের আসন' প্রভৃতি কাব্যে ঘটনা ও কাহিনীকে তুচ্ছ করিয়া হৃদয়ভাব প্রকাশকেই তিনি মুখ্য স্থান দিলেন। বিষয়বস্তু হইল তুচ্ছ উপলক্ষ্য মাত্র, কবির আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস বর্ণনায় রোমান্টিক রস পরিবেষণ করাই প্রধান কথা। বিহারী-লালের প্রধান ভাবশিষ্য ছিলেন অক্ষয়কুমার বড়াল এবং রবীন্দ্রনাথ। তাঁহারা বিহারীলালকে 'ভোরের পাখী' বলিয়া সম্বর্ধনা করিলেন।

গীতিকাব্য ধারায় বিহারীলাল ও তাঁহার অনুবর্তিগণ

অক্ষয়কুমার প্রকৃতি ও প্রেমের সৌন্দর্য ও সুরভি দিয়া এক অভিনব কাব্যপরিমণ্ডল গড়িয়া লইয়াছিলেন। 'প্রদীপ', 'কনকাঞ্জলি', 'ভুল', 'শঙ্খ' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে ছোট ছোট গীতিকবিতার মধ্যে কবি বিস্ময়কর কল্পনা-শক্তি ও সৌন্দর্যানুভূতির প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য শোকসঙ্গীত 'এষা'। এই কাব্যে রোমান্টিক কবি জীবনের সঙ্গে জীবনাতীতের অপূর্ব সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সৌন্দর্যবুদ্ধি ও রসচেতনার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন।

অক্ষয়কুমার বড়াল

এই ধারায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। ইনি আখ্যান কাব্যের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গীতিকাব্য রসেই নিজের প্রতিভার সন্ধান পাইয়াছিলেন। বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের আদর্শে 'মহিলা-কাব্য' রচনা করিয়া ইনি স্থায়ী যশের অধিকারী হইয়াছেন। এই কাব্যে তিনি নারীর জননী ও জায়া মূর্তিকে ভাবকল্পনার ক্রান্তি লগ্নে রাখিয়া অনিন্দ্যসুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার রচনায় ক্লাসিক সংযম ও লিরিক উচ্ছ্বাস বাক্‌রীতির শালীনতায় ও ছন্দের গাম্ভীর্যে চমৎকার সমন্বিত হইয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

এই ধারায় অন্যতম কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন। ইনি বিহারীলালের মত অতীন্দ্রিয় ভাব-ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। ইনি ছিলেন বস্তুনিষ্ঠ অথচ কল্পনা-বিলাসী কবি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও নারীপ্রেমের রোমান্টিক উপাদান তাঁহার কাব্যের প্রধান বিষয়। 'ঊর্মিলা কাব্য', 'অপূর্ব বীরাঙ্গনা',

দেবেন্দ্রনাথ সেন

'অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা' প্রভৃতি রচনায় মধুসূদনের বাগ্‌ভঙ্গি ও কল্পনা-সৌন্দর্যের কিছু প্রভাব থাকিলেও তাঁহার 'অশোক গুচ্ছ', 'গোলাপ গুচ্ছ', 'পারিজাত গুচ্ছ' প্রভৃতি গ্রন্থে বাস্তব-পৃথিবী ও কল্পনার জগৎ সমন্বিত হইয়া গীতিরসের মাধুর্য প্রকাশ করিয়াছে। আবেগের গাঢ়তা এবং বাস্তবচেতনার প্রখরতা প্রকাশ পাইয়াছিল এই যুগের অন্যতম কবি গোবিন্দদাসের মধ্যে। 'প্রেম ও ফুল', 'কুঙ্কুম', 'কস্তুরী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে তিনি অনাবৃত জীবন-প্রীতি উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রকাশ করিয়াছেন। একমাত্র মোহিতলাল ছাড়া এত তীব্র জীবনবোধ একালের কোন কবির মধ্যে দেখা যায় নাই। স্বপ্নলোকে না গিয়া প্রত্যক্ষ জগতেও যে গীতিরসের প্রবাহ সৃষ্টি করা যায় গোবিন্দদাস তাহা দেখাইয়াছেন। গীতিকাব্যের ধারা রবীন্দ্র-পূর্ব যুগে তাঁহার মধ্যেই পূর্ণ ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল।

গোবিন্দচন্দ্র দাস

মহাকাব্য ধারায় মধুসূদন এবং আখ্যান কাব্য ধারায় রঙ্গলালের নাম সাহিত্যের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। রঙ্গলাল স্বদেশ প্রেমের আবেগকে গীতিমুখী না করিয়া আখ্যানমুখী করিলেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্মদেবী', 'কাঞ্চীকাবেরী', 'শূরসুন্দরী' প্রভৃতি কাব্যের কাহিনী অংশ ইতিহাস বা প্রবাদমূলক। কাহিনী-কৌতুহল ও রোমান্স-রস সৃষ্টি করিয়া তিনি বাঙালীর গল্প-কৌতূহল মিটাইয়াছিলেন, জীবনজিজ্ঞাসার সন্ধান দিতে পারেন নাই। সেই সন্ধান দিয়াছিলেন মধুসূদন। রামায়ণ ও পুরাণ হইতে কাহিনী আহরণ করিয়া ঘটনা ও চরিত্রকে নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত করিয়া অভিনব বাক্‌পদ্ধতি ও ছন্দ চাতুর্যে মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য এপিকের সাদৃশ্যে মহাকাব্য রচনা করিলেন। 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যে যাহা সূচিত হইল 'মেঘনাদবধ কাব্যে' তাহার পূর্ণ পরিণতি। মধুসূদনের বিস্ময়কর প্রতিভায় কাহিনী-বিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি এবং ছন্দ-ঝঙ্কার এমন অপূর্বতা লাভ করিয়াছিল যাহার পরিণতিতে বাংলা সাহিত্যে অভিনব ট্রাজেডি-মহাকাব্য রচিত হইল। মধুসূদনের ধারা অনুসরণ করিয়া আসিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গলালের পথ ধরিয়া তিনি প্রথম বীররস ও শৃঙ্গার রসের সমন্বয়ে 'বীরবাহু' নামে আখ্যান কাব্য লিখিয়াছিলেন। মধুসূদনের অনুকরণে লিখিলেন 'বৃত্রসংহার কাব্য'। বৃত্র কর্তৃক বিতাড়িত স্বর্গভ্রষ্ট দেবতারা দধীচির অস্থিনির্মিত বজ্রদ্বারা বৃত্র-নিধন করিয়া স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন। কাহিনীটি মহান

মহাকাব্য ও আখ্যান-কাব্য ধারায় মধুসূদন ও অনুবর্তিগণ

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্দেহ নাই। কিন্তু কবি গীতিরসের আধিক্য ও ছন্দ-নৈপুণ্যের অভাব হেতু মহাকাব্যের উপযোগী সংহতি ও সমুন্নতি রক্ষা করিতে না পারায় উহা আবেগময় আখ্যান কাব্যের অনুরূপ হইয়া গিয়াছে। নবীনচন্দ্র সেনের মহাকাব্য রচনার চেষ্টাও অনুরূপভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। ইনি শ্রীকৃষ্ণের জীবন অবলম্বনে 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' এই 'ত্রয়ী কাব্য' রচনা করেন। 'খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে একসূত্রে' গাঁথিবার মহান ভাব মহাকাব্য রচনার প্রেরণা ছিল। কিন্তু কবি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হওয়ায় এই কাব্যত্রয়ে মহাকাব্যের মহিমা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। মহাকাব্য ও আখ্যান কাব্য রচনায় যে জাতীয় নির্লিপ্ততা ও বস্তুনিষ্ঠার প্রয়োজন হেম-নবীনের কবি-প্রকৃতিতে তাহার অভাব ছিল। তাই তাঁহারা গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখাইলেও মহাকাব্য রচনায় ব্যর্থ হইয়াছেন।

নবীনচন্দ্র সেন

মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্য রচনার পরবর্তী চেষ্টাও বিশেষ সাফল্য লাভ করে নাই। মধুসূদনের অনুবর্তীরা কেহই মধুসূদনকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। পরবর্তী কাব্যগুলি শুধু ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ই আছে। দীননাথের 'কংস বিনাশ', হরগোবিন্দের 'রাবণবধ', বলদেবের 'কর্ণার্জুন', যোগীন্দ্র বসুর 'পৃথ্বীরাজ' এবং 'শিবাজী', অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী', ঈশানচন্দ্রের 'যোগেশ' প্রভৃতি কাব্যগুলিতে আখ্যান রসের মাধুর্য এবং কল্পনার সৌন্দর্য হয়ত আছে, কিন্তু যে-কারণে মহাকাব্যাদি রসসমৃদ্ধি লাভ করে তাহার কিছুমাত্র পরিচয় নাই। তাই এই কাব্যধারা ক্রমশঃ অনাদৃত হইয়া বিংশ শতাব্দীর সূচনায়ই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আখ্যানকাব্য রচনায় ব্যর্থ প্রচেষ্টা

১২। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও রবীন্দ্র-প্রভাবিত কয়েকজন গীতিকবির কবিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত কাব্যসাধনা করিয়া খ্যাত হইয়াছেন এইরূপ কবিগণের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ইঁহারা রবীন্দ্র-প্রতিভাদীপ্তির প্রখর মধ্যাহ্নে আবির্ভূত হইয়াও নিজেদের স্বকীয় প্রতিভালোকে বাংলা গীতিকবিতার বিশেষ বিশেষ অঞ্চল আলোকিত করিয়াছিলেন। এই কবিদের মধ্যে একদল ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব ও উৎসাহে রবীন্দ্রকাব্য পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত।

রবীন্দ্র-যুগে গীতিকাব্যের ত্রি-ধারা

আর একদল ছিলেন প্রাক্-রবীন্দ্র কাব্যধারার পথে অথচ রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক স্পষ্ট প্রভাবিত। ইহা ছাড়া আর একটি দল সচেতন ভাবে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক ভাব-কল্পনার প্রতিবাদ করিয়া সুস্পষ্টভাবে রবীন্দ্র-বিরোধী।

রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত কবিগণ

বলেন্দ্রনাথ ও প্রিয়ম্বদা

রবীন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনা ও প্রকাশভঙ্গি অনুসরণে কবিতা রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯) এবং কবি প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১-১৯৩৫)। বলেন্দ্রনাথের 'মাধবিকা' কাব্যে (১৮৯৬) প্রেমের কবিতায় স্নিগ্ধ সৌন্দর্য প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার 'শ্রাবণী' কাব্যেও (১৮৯৭) প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা সংকলিত হইয়াছে। প্রিয়ম্বদা দেবীর 'রেণু' কাব্যে (১৯০০) তাঁহার ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতামূলক গীতিকবিতাগুলি বিশেষ তাৎপর্যপুর্ণ হইয়াছে। ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী এবং রমণীমোহন ঘোষ উচ্চ কবি-প্রতিভার অধিকারী না হইলেও রবীন্দ্র কাব্যপরিমণ্ডলে বিশিষ্ট। রমণীমোহন ঘোষের 'দীপশিখা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাব্য। রবীন্দ্রানুরাগীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে নাম করা যায় প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর। ইনি প্রচুর আবেগপ্রবণ কবিতায় দেশপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রেমের গভীর পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার 'পদ্মা' (১৮৯৮), 'গীতিকা', 'আরতি' (১৯০২) কাব্যগ্রন্থে অনেক ভাল কবিতা আছে। 'পাষাণ', 'গৈরিক', 'গৌরাঙ্গ', 'পাথার' প্রভৃতি নামেও তাঁহার কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ সমাদৃত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রানুসারী অন্যান্য কবিগণ

কয়েকজন গানের কবিও রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১৯) 'বাণী' (১৯০২), 'কল্যাণী' (১৯০৫), 'অমৃত', 'অভয়া' (১৯১০) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে গান ও লিরিকের অজস্র সুন্দর দৃষ্টান্ত সংকলন করিয়াছেন। এক সময় রজনী সেনের গান বাঙালীর কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইত। গানের রাজ্যে আধিপত্য করিয়াছেন আর একজন কবি অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)। তাঁহার 'গীতিগুঞ্জ' (১৯৩১) নামক সংকলনে বহু প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত সংকলিত হইয়াছে। তাঁহার গানগুলির সাঙ্গীতিক ও কাব্যিক মূল্য বাঙালী পাঠকেরা সানন্দে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

রবীন্দ্র-প্রভাবিত কবিগোষ্ঠী

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন নহেন অথচ রবীন্দ্রনাথের ছায়ায় বিরাজিত কয়েকজন কবি বিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতার ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য ছিল। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রযুগের একজন বিশিষ্ট কবি। ইনি প্রধানত নাট্যকাররূপেই খ্যাত এবং প্রথম জীবনে ইনি রবীন্দ্র-বিরোধিতার জন্যও বিশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার 'হাসির গান' ও 'আষাঢ়ে' কৌতুককাব্যের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। হাস্যরসাত্মক সঙ্গীত ও কবিতারচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি ভাবগম্ভীর এবং জীবননিষ্ঠ কবিতা রচনায়ও যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। 'আর্যগাথা', আলেখ্য', 'ত্রিবেণী' এবং 'মন্দ্র' দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ কবিতা-সংকলন। তিনি জীবনের অসংগতিকে যেমন নির্মল কৌতুকের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, জীবনের বিকৃতিকে তেমনি কঠিনতম বিদ্রূপ বাণে বিদ্ধ করিয়াছেন। প্রত্যয়নিষ্ঠ জীবনের মহিমাও তাঁহার কাব্যে বিঘোষিত হইয়াছে। প্রকাশভঙ্গিতেও দ্বিজেন্দ্রলালের দক্ষতা নিতান্ত কম ছিল না। বাংলা ছন্দ লইয়া তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

রবীন্দ্র-যুগে রবীন্দ্র-প্রভাবের মধ্যে স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল কবি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২)। মনীষী অক্ষয়কুমারের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। বিদ্যাবুদ্ধিতে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। শব্দশিল্পে ও ছন্দোনৈপুণ্যে তাঁহার মত যোগ্যতর ব্যক্তি সে-যুগে আর দেখা যায় নাই। তিনি প্রচুর কবিতা রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা' (১৯০০)। ক্রমে 'সন্ধিক্ষণ' (১৯০৫), 'বেণু ও বীণা' (১৯০৬), 'হোমশিখা' (১৯০৭), অনুবাদ কবিতার সংকলন 'তীর্থরেণু' (১৯০৮) ও 'তীর্থ-সলিল' (১৯১০), 'ফুলের ফসল' (১৯১১), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২) 'তুলির লিখন' (১৯১৪), 'মণিমঞ্জুষা' (১৯১৫), 'অভ্র-আবীর' (১৯১৬), ব্যঙ্গ কবিতার সংকলন 'হসন্তিকা' (১৯১৭) এবং তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'বেলা শেষের গান' (১৯২৩) এবং 'বিদায় আরতি' (১৯২৪) প্রভৃতি সত্যেন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় কবিকীর্তির পরিচয় হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ আঙ্গিক সচেতন এবং বস্তুনিষ্ঠ গীতিকবি। তিনি জীবনকে নানা রূপে, নানা বৈচিত্র্যে দেখাইয়াছেন; কিন্তু জীবনাতিশয়ী শাশ্বত সত্যের সন্ধান দিতে পারেন নাই। তিনি যে

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

পরিমাণে শিল্পী ছিলেন সেই পরিমাণে কবিত্বের অধিকারী ছিলেন না। শব্দকুশলী, ছন্দোনিপুণ, অসাধারণ পণ্ডিত কবি সত্যেন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেম, সৌন্দর্যচিত্র, সমসাময়িক সমাজের নীতিবোধ প্রভৃতিকে কাব্যের বিষয় করিয়া 'বঙ্গভারতীর তন্ত্রী'তে নূতন তার যোজনা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাবচ্ছায়ায় প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, ঐতিহ্যানুরাগ প্রভৃতি অবলম্বনে যাঁহারা কাব্যের একটি স্নিগ্ধ পরিবেশ রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫)। 'ঝরাফুল', 'শান্তিজল', 'ধানদূর্বা', 'শতনরী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে তিনি প্রীতিভক্তির একটি মধুর পরিবেশ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কবিতায় যুগযন্ত্রণার জ্বালা নাই, প্রসন্ন মনের একটি পরিতৃপ্তির সুর সমগ্র কাব্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে। তাঁহার মূল প্রকৃতি ছিল রোমান্টিক, তিনি তাই কাব্যের ক্ষেত্রে একটি অলৌকিক রসের জগৎ রচনা করিয়াছেন।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচি (১৮৭৮-১৯৪৮) করুণানিধানেরই সমবয়সী এবং সমভাবাপন্ন কবি। তবে কাব্যের বিষয় নির্বাচনে এবং রচনাভঙ্গিতে তিনি কিছু বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "লেখা" প্রকাশিত হয় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে। তাহার পর 'রেখা' (১৯১০), 'অপরাজিতা' (১৯১৩), 'নাগকেশর' (১৯১৭), 'বন্ধুর দান' (১৯১৮), 'জাগরণী' (১৯২২), 'নীহারিকা' (১৯২৭) এবং সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'মহাভারতী' (১৯৩৬)। যতীন্দ্রমোহন পল্লীবাংলার চিত্র, সাধারণ মানুষদের জীবনযাত্রা প্রণালীর অনাড়ম্বরতা, মানুষের সহজ ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি অবলম্বনে সুন্দর লিরিক লিখিয়াছেন। লিরিকের আঙ্গিকে নাটকীয় একোক্তি এবং স্বগত ভাষণের চমৎকারিত্ব তাঁহার কোন কোন কবিতাকে বিশেষ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়াছে। মহাভারতীয় চরিত্রগুলিতে তিনি নূতন তাৎপর্য উপস্থিত করিয়া বেশ কৌতূহল সৃষ্টি করিয়াছেন। সুস্থ বাস্তবজীবনবোধ তাঁহার কবিধর্মের বিশেষত্ব। 'কাব্যমালঞ্চ' নামক গ্রন্থে সংকলিত তাঁহার কবিতাবলীতে বাস্তববোধ, রোমান্টিক কল্পনা, ইতিহাস নিষ্ঠা এবং ঐতিহ্যপ্রিয়তার চমৎকার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

যতীন্দ্রমোহন বাগচি

রবীন্দ্রানুসারী কবিগোষ্ঠীর মধ্যে দুইজন প্রবীণ কবি এখনও জীবিত আছেন এবং এখনও তাঁহারা কবিতা রচনা করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক

(১৮৮২) এবং শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় (১৮৮৯) বৈষ্ণবীয় ভাবরস, পল্লীপ্রাণতা, পরিবারিক স্নেহপ্রীতির মাধুর্য, আদর্শনিষ্ঠ জীবনের মহিমা প্রভৃতি অবলম্বনে সরল সুন্দর কবিতা রচনা করিয়া জনপ্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন। উচ্চতর কবিকল্পনা অথবা প্রকাশভঙ্গির কোন বিশিষ্ট মহিমা এই কবিদ্বয়ের নাই। কিন্তু ইঁহাদের অনুভূতির মধ্যে একটি স্নিগ্ধমধুর রস আছে, ঈশ্বর-বিশ্বাস ও মানব-প্রীতির মাধুর্য আছে। প্রাচীন বাংলার কাব্যধারা যুগধর্ম দ্বারা কিঞ্চিৎ মার্জিত হইয়া এই কবিদের রচনায় পুনরাবির্ভূত হইয়াছে। কুমুদরঞ্জনের 'উজানী' (১৯১১), 'বনতুলসী' (১৯১১), 'একতারা' (১৯১৪), 'বনমল্লিকা' (১৯১৮), 'অজয়' (১৯২৭), 'স্বর্ণসন্ধ্যা' (১৯৪৮) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাঁহার প্রতিভার পরিচয় বহন করিতেছে। কবিশেখর কালিদাস রায়ের কাব্যগ্রন্থ 'পর্ণপুট' (১৯১৪), 'ব্রজবেণু' ও 'বল্লরী' (১৯১৫) এবং 'বৈকালী' (১৯৪০) তাঁহার প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় বহন করিতেছে। কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায় একসময় গার্হস্থ্য জীবনের প্রেমপ্রীতির সুবাস মাখাইয়া সুখপাঠ্য সহজবোধ্য কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। জীবনবোধের গভীরতা ও ক্রান্তিদর্শিতা না থাকিলেও সহজ প্রাণের কবিত্বে ইঁহাদের রচনা ভরপুর। তাঁহার কাব্যগ্রন্থ 'নতুন খাতা' একসময় বাঙালী পাঠকের সশ্রদ্ধ কৌতূহল আকর্ষণ করিয়াছিল।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও কবিশেখর কালিদাস রায়

রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতা-বিরোধী কবিগোষ্ঠী

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিক্রমের চেষ্টায় এবং রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক ভাব-কল্পনার বিরোধিতায় একদল তরুণ কবি একসময় নূতন কাব্যরীতির প্রবর্তন করিয়া বাংলাসাহিত্যে বিস্ময়ের চমক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী প্রভাব তাঁহারা অতিক্রম করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তবু কবিতার উপকরণ-প্রকরণে এবং কাব্যভাবনায় তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রথম ইয়োরোপীয় মহাসমরের পরবর্তী যুগের নূতন জীবন-জিজ্ঞাসা দ্বারা তাঁহাদের মনে যে ভাব-তরঙ্গের উৎক্ষেপ ঘটে তাহারই প্রকাশ ঘটিয়াছে এই যুগের কাব্যভাবনায়। কয়েকজন প্রতিভাধর কবি এই নূতন সুরের সাধক।

রবীন্দ্র-প্রতিভার সর্বব্যাপী শক্তি ও বিস্ময়করতা স্বীকার করিয়াও যাঁহারা স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট তাঁহাদের মধ্যে প্রধান কবি মোহিতলাল মজুমদার

(১৮৮২-১৯৫২)। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতই ভাববাদী ; কিন্তু অধ্যাত্ম বিলাসী বা মহাজীবনপিপাসু হইতে পারেন নাই। বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের চেতনায় তিনি তান্ত্রিক সাধকের মত দেহসাধনার মধ্যেই জীবনের সিদ্ধি ও সার্থকতা খুঁজিয়াছেন। এই জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে 'দেহাত্মবাদী তান্ত্রিক কবি' বলিয়াছেন। তাঁহার

মোহিতলাল মজুমদার

কাব্যগ্রন্থ 'স্বপনপসারী' (১৯২২), 'বিস্মরণী' (১৯২৭), 'স্মরগরল' (১৯৩৬), 'হেমন্ত গোধূলি' (১৯৪১) এবং 'ছন্দ চতুর্দশী' (১৯৫১) তাঁহার কবি-প্রতিভা ও কাব্যের রূপনির্মিতির বিশিষ্টতার পরিচায়ক। জীবনবোধ এবং কাব্যের শিল্পকলা সম্বন্ধে মোহিতলাল ছিলেন ক্লাসিক-পন্থী। পরিমার্জিত বুদ্ধি এবং তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তি লইয়া তিনি জীবনের বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে কামনা-বেদনার মর্মদাহ অনুভব করিয়াছেন এবং উহার মধ্যেই প্রেম ও সৌন্দর্যের অমৃতরস পান করিয়াছেন। ভাস্করের মত রূপনির্মাণের ক্ষমতা লইয়া তিনি এই ভাবকে বাণীমূর্তি দিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি রবীন্দ্রযুগে স্বতন্ত্র প্রতিভার কবি।

রবীন্দ্র-কাব্যের ব্যঙ্গানুকরণ করিতে গিয়া একজন ইন্‌জিনিয়র কবি বাংলা সাহিত্যের আকাশে বিস্ময়কর দীপ্তি বিকিরণ করেন। তাঁহার নাম যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪)। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের কঠিন প্রস্তরে প্রাচীন সংস্কারকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া মানুষের জীবনের নিঃসীম দুঃখের বাণীমূর্তি ইনি রচনা

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

করেন। তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির নামকরণ বড় অর্থবহ। 'মরীচিকা' (১৯২৩) 'মরুশিখা' (১৯২৭), 'মরুমায়া' (১৯৩০), 'সায়ম্' (১৯৪০), 'ত্রিযামা' (১৯৪৮), প্রভৃতি কাব্যের নামকরণে তাঁহার কবি-মনের ক্রমবিকাশের ইঙ্গিত আছে। তাঁহার 'নিশান্তিকা' কাব্যগ্রন্থখানি তাঁহার মৃত্যুর পর ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। যতীন্দ্রনাথকে দুঃখবাদী কবি বলা হয়। তাঁহার দুঃখবাদ জীবনবাদেরই নামান্তর ; দুঃখ তাঁহার কাছে ভাব-বিলাস মাত্র নয়। মানবজীবনে দুঃখসত্যকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই 'বহ্নিস্তুতি' দ্বারা তাঁহার কাব্যের সূচনা এবং কাব্যধর্মে তিনি দুঃখের দেবতা শিবের উপাসক। যাঁহারা সৌন্দর্য ও আদর্শবাদের প্রলেপদ্বারা জীবনের নগ্নতাকে আবৃত করার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে কবি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। তাই যতীন্দ্রনাথের কবিতার ভঙ্গি তির্যক, বাক্‌রীতি অভিনব এবং কাব্যভাবনায় বুদ্ধির তীক্ষ্ণ দীপ্তি। বস্তুত প্রচলিত রীতির

ব্যতিক্রমতার অসাধারণত্বে যতীন্দ্রনাথের মত বিশিষ্ট কবি বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নাই।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে 'কল্লোল' ও 'কালিকলম' পত্রিকাকে অবলম্বন করিয়া সাহিত্যরীতির একটি নূতন আন্দোলন গড়িয়া উঠে। উহাতে যাঁহার দৃপ্ত পৌরুষ রুদ্রবীণায় বাজিয়া উঠিয়াছিল তিনি কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯)। ইনি এখনও বাঁচিয়া আছেন কিন্তু পঙ্গু অবস্থায় তাঁহার লেখনী স্তব্ধ। একদা সৈনিক কবি নজরুলের কণ্ঠে বিদ্রোহের গান তীব্র সুরে বাজিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হয় ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি আবেগপূর্ণ ভাষায় মানুষের স্বাধিকার ও সাম্যের দাবী করিলেন, ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁহার কণ্ঠ মুখর হইয়া উঠিল। সাময়িক উত্তেজনায় রচিত তাঁহার সব কবিতার হয়ত স্থায়ী সাহিত্যমূল্য নাই। কিন্তু চিন্তার বলিষ্ঠতায়, প্রকাশের ঋজুতায় এবং আবেগের গভীরতায় তিনি প্রথম শ্রেণীর কবির সম্মান পাইয়াছেন। তাঁহার রচিত গানগুলি বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। 'দোলন চাঁপা', 'ভাঙার গান', 'পূবের হাওয়া', 'বিষের বাঁশী', 'ছায়ানট', 'ঈদের চাঁদ' 'মরুভাস্কর' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে কাজী নজরুলের প্রচুর কবিতা ও গান সংকলিত আছে।

কাজী নজরুল ইসলাম

১৩। ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা কবিদের কাব্যকৃতিত্বের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর। নানাদিক হইতেই ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙালীর নব জাগরণের যুগ। সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই এই যুগে প্রভূত আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই আলোড়নের ঢেউ বাঙালীর অন্তঃপুরেও প্রবেশ করে। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহার 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় বহু মহিলা কবির রচনা প্রকাশ করিয়া নারীসমাজে কবিতারচনার উৎসাহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শিক্ষিত বাঙালীর মনের আবেগ অন্তর্মুখী গীতিকবিতার মাধ্যমে মুক্তিলাভ করিতে থাকে এবং শিক্ষিতা মহিলারাও কবিতা রচনায় অগ্রসর হন। গীতিকবির বিশিষ্ট প্রতিভা হয়ত সকলের ছিল না। কিন্তু অন্তরের অনুভূতিকে ছন্দে গাঁথিয়া প্রকাশের চেষ্টায় তাঁহাদের উদ্যম প্রশংসনীয়। মহিলা কবিরা গার্হস্থ্য জীবনের অনুভূতি স্নেহ-প্রেম-বাৎসল্য অবলম্বনে কবিতা লিখিতেন, দেশপ্রেম, ঈশ্বরভক্তি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিষয়েও হৃদয়াবেগ প্রকাশ করিতেন। মহিলা কবিদের কেহ কেহ বিশিষ্ট প্রতিভার

গীতিকবিতার নবজাগরণে মহিলা কবি

পরিচয়ও দিয়াছেন। কয়েকজন কবির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিলেই ইহা প্রতিপন্ন হইবে।

মোক্ষদাদায়িনী মুখোপাধ্যায় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে "বনকুসুম" নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইনি বৈষ্ণব কাব্যধারা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া প্রেমের কবিতাই বেশি রচনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু গার্হস্থ্য প্রেমের সীমা উত্তরণ করিয়া প্রেমের একটি রসলোক রচনা করিতে পারেন নাই। 'প্রোষিতভর্তৃকা', 'স্বাধীনভর্তৃকা', 'মিলনে', 'বিরহে', প্রভৃতি শীর্ষক কবিতায় লোকোত্তর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয় নাই, বাঙালী বধূর হৃদয়াবেগমাত্র প্রকাশ পাইয়াছে। 'প্রোষিতভর্তৃকা'য় কবি বলিয়াছেন,

মোক্ষদাদায়িনী মুখোপাধ্যায়

সে হল সাহেব আমি যে বাঙালী
আর কিলো আছে আশা,
লয়ে ইংরাজিনী করিবে সঙ্গিনী
ভুলে যাবে ভালোবাসা।

সরল ভাষায় বিলাতপ্রবাসী স্বামী সম্বন্ধে আশঙ্কার মনোভাব প্রকাশে প্রোষিত-ভর্তৃকার বেদনা বিশ্বের বিরহিণীদের বেদনা হয় নাই, ঘরের কথামাত্র হইয়াছে। এই যুগের অধিকাংশ মহিলাকবিরই লেখার ধরণ এই জাতীয়।

রবীন্দ্রনাথের ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৭-১৯৩২) 'কবিতা ও গান' (১৮৯৫) নামে কাব্যরচনা করেন। তাঁহার কবিতাগুলির সঙ্গীতধর্ম অপূর্ব। ইনি দাম্পত্য প্রেম ও দেশপ্রেমের অনেক কবিতা লেখেন। প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা রচনায়ও ইনি পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। 'শ্রাবণ' নামক কবিতায় বর্ষণমুখর শ্রাবণ সন্ধ্যার একটি চমৎকার রূপ প্রকটিত হইয়াছে। উহার মধ্যে কবির ব্যক্তিমনের ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষাও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী

সখি, নব শ্রাবণ মাস !
জলদ ঘনঘটা দিবসে সাঁঝছটা
ঝুপ ঝুপ ঝরিছে আকাশ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মহিলা-কবিদের মধ্যে কাব্যোৎকর্ষে গিরীন্দ্রমোহিনী

দাসীর (১৮৫৮-১৯২৪) রচনাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'অশ্রুকণা' (১৮৮৭), 'আভাস' (১৮৯০) এবং 'অর্ঘ্য' (১৯০২) তাঁহার কাব্যগ্রন্থের নাম। 'অর্ঘ্য' গ্রন্থে ইনি উন্নত কাব্যকলার পরিচয় দিয়াছেন। নরনারীর প্রেমের প্রভেদ-তত্ত্ব গিরীন্দ্রমোহিনী একটি কবিতায় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন,

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

তুমি ভালবাস রূপগৌরব
সুকোমল তনু শিরিষ পেলব
বিম্ববরণ অধর-পল্লব
নয়নের সুধামাখা বিষ ;
আমি ভালবাসি, চিত্ত আমারি
তৃপ্ত তাহাতে অহর্নিশ।

প্রেমিকা নারীর হৃদয়ানুভূতিকে গিরিন্দ্রমোহিনী ইঙ্গিতপূর্ণ করিয়া তুলিবার উপযুক্ত কাব্যভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। 'বেলা যায়' নামক কবিতায় তিনি বিষাদিনীর উদাস দৃষ্টির গূঢ় তাৎপর্য প্রকাশ করিয়াছেন।

"ও গো অনিমেষে, কি দেখিছ মুখে,
চেয়ো না অমন করিয়া ;
আছে দুইখানি প্লাবনের মেঘ
এই আঁখি কোণ ভরিয়া।"

গিরীন্দ্রমোহিনী দেশপ্রেম-মূলক অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। তাঁহার 'স্বদেশিনী' (১৯০৬) কাব্যে 'শিবাজী উৎসব', 'ঋণশোধ' প্রভৃতি কবিতার আবেগ প্রশংসনীয়। প্রকৃতির সৌন্দর্যরূপ অঙ্কনেও কবির দক্ষতা ছিল। 'শিখা' (১৮৯৬) কাব্যগ্রন্থে 'সন্ধ্যায়' নামক কবিতায় তিনি সমাসোক্তি অলঙ্কারে সন্ধ্যার একটি অপূর্ব নারীমূর্তি রচনা করিয়াছেন।

উজ্জ্বল সীমন্তমণি শোভিত শিরসে,
ধীরে ধীরে মৃদুপদে সন্ধ্যা নেমে আসে ;
নিবিড়-তিমির-কেশ-চুম্বিত-চরণা,
ধূসর-অম্বরাবৃতা আনত-নয়না।

এই মহিলা-কবিটির ভাবাভঙ্গি, কল্পনাশক্তি ও হৃদয়ানুভূতিতে উৎকৃষ্ট গীতি-কাব্যের মৌল লক্ষণগুলি ফুটিয়াছে।

মহাকবি মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) একদা বেশ

কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। 'প্রিয় প্রসঙ্গ' (১৮৮৪) এবং 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' (১৮৯৩) তাঁহার কবিতার শ্রেষ্ঠ সংকলন। গার্হস্থ্য জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার অধিকাংশ রচনা। দাম্পত্য প্রেম, ভ্রাতৃপ্রীতি, বাৎসল্যবোধ প্রভৃতি পারিবারিক সম্পর্কের মধুময় রূপ তিনি কাব্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। প্রকৃতি বিষয়ক কবিতারূপে 'শিবিষকুসুম' ও 'বৌ কথা কও' উৎকৃষ্ট লিরিক। তাঁহার অধিকাংশ কবিতায় ব্যক্তি-জীবনের ছায়া পড়ায় রোমান্টিক কারুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি সপ্তরথী কর্তৃক অভিমন্যু হত্যা কাহিনী অবলম্বনে 'বীরকুমার বধ' (১৯০৪) নামে একখানি আখ্যানকাব্য রচনা করেন। কাব্যখানি জনপ্রিয় হয় নাই।

মানকুমারী বসু

মহিলাকবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন সুশিক্ষিতা কবি কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩)। ইংরাজি লিরিকের আদর্শে তিনি নানা বিষয়ে গীতিকবিতা রচনা করিয়া তাঁহার কাব্যপরিমণ্ডল বাড়াইয়াছিলেন। তাঁহার উল্লেখযোগ্য কাব্য-সংকলন 'পৌরাণিকী' (১৮৮৩), 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯), 'মাল্য ও নির্মাল্য' (১৯১৩), 'অশোক সঙ্গীত' (১৯১৪), 'দীপ ও ধূপ' (১৯২৯)। কামিনী রায়ের অধিকাংশ কবিতায় তাঁহার ব্যক্তিজীবনের বেদনানুভূতি কাব্যের ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রোমান্টিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রেমের কবিতায় তিনি প্রেমকে মহিমান্বিত রূপ দান করিয়াছেন, ইহার মধ্যে মরণজয়ী শক্তির সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি প্রেম সম্বন্ধে বলেন, "আনন্দ সে, আসক্তি-বিহীন শুদ্ধ ঘন অনুরাগ।" তাঁহার বিখ্যাত 'চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ' নামক কবিতাটি প্রেমের প্রাণশক্তিকে অভিনন্দিত করিয়া লিখিত। প্রেমের এই শক্তি দ্বারাই তিনি দেশকে ভালবাসিয়াছিলেন, জীবনের আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিলেন। "পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি', এ জীবন মন সকলই দাও" ইহাই ছিল তাঁহার নীতি। 'মাতৃপুজা' নামক কবিতায় তিনি জন্মভূমিকে "মা আমার, মা আমার" বলিয়া দেশের সেবায় সর্বশক্তি নিয়োগের আহ্বান জানাইয়াছিলেন। বিষয়ের বৈচিত্র্যে, ভাষার শ্রুতিমধুর সারল্যে, অনুভূতির অকৃত্রিমতায় বাংলা গীতিকাব্যের ইতিহাসে কবি কামিনী রায় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারিণী।

কামিনী রায়

কবি সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫-১৯২৬) খুব আশাবাদিনী ছিলেন। তিনি 'হাসি ও অশ্রু' (১৮৯৪) নামক কাব্যগ্রন্থে প্রেমের দুঃখের বহু চিত্র আঁকিয়াছেন। তাঁহার মূল বক্তব্য—"দুরাকাঙ্ক্ষা" নামক সনেটে প্রকাশ পাইয়াছে।

সরোজকুমারী দেবী

"জীবন দুরাশা শুধু, মিটিবে না হায়,
আশায় আপনাহারা প্রাণ তবু চায়!"

তাঁহার সনেটগুলিতে প্রখর জীবনবোধের বলিষ্ঠ প্রকাশ আছে। ইনি প্রেমের কবিতা রচনায় 'ব্রজবুলি'র ব্যবহারও করিয়াছেন। প্রেমের অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনা ফুটাইতে না পারিলেও এই মহিলা-কবি হৃদয়ের স্বাভাবিক অনুভূতিগুলিকে সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করিয়া লিরিক-লাবণ্য সঞ্চার করিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে আরও অনেক মহিলা কবি গীতিকাব্য রচনায় কুশলতা দেখাইয়াছিলেন। ব্যাপক প্রচারের অভাবে সাধারণ্যে পঠিত ও আলোচিত না হইলেও ইতিহাসের দৃষ্টিতে তাঁহারা উপক্ষেণীয় নহেন। লজ্জাবতী বসু, প্রমীলা নাগ, বিনয়কুমারী ধর, নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী, সরমাসুন্দরী ঘোষ, মৃণালিনী সেন, বিরাজমোহিনী দাসী প্রভৃতি অনেক মহিলা-কবি আদর্শায়িত প্রেম, গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র, প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়া নিজেদের ব্যক্তিজীবনের আনন্দ-বেদনার অনুভূতি গভীর আন্তরিকতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। রূপকর্মে বা কাব্যকলার প্রসাধনে তাঁহারা হয়ত প্রথম শ্রেণীর কবির দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই; কিন্তু নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, অনুভূতির অকৃত্রিমতা ও প্রকাশের সারল্যে পুরুষদের তুলনায় তাঁহাদের কাব্যপ্রচেষ্টা নিকৃষ্ট হয় নাই।

অন্যান্য মহিলাকবিগণ

১৪। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার গতি-প্রকৃতির পরিচয় দিয়া কয়েকজন বিশিষ্ট কবির কাব্যরচনা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

উত্তর। রবীন্দ্রোত্তর যুগকেই এখন সাম্প্রতিক কাল বলা যাইতে পারে। এই কালে বাংলা কাব্যের গতি-প্রকৃতি নূতন পথ ধরিয়া চলিতেছে। রবীন্দ্র যুগেই 'কল্লোল' গোষ্ঠীর মধ্যে রবীন্দ্র-বিরোধিতার যে সুর ধ্বনিত হইয়াছিল তাহাই সাম্প্রতিক কবিতার গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকে। ইয়োরোপীয় যুদ্ধোত্তর সাহিত্যের প্রভাব এই যুগের একদল তরুণ কবিকে অভিভূত করে। তাঁহারা ছিলেন ইংরাজী সাহিত্যে কৃতবিদ্য এবং বাংলা কাব্যে নূতন উদ্ভাবন দ্বারা যশঃপ্রার্থী। বাক্-রীতির বিশিষ্ট ভঙ্গিতে, মননশীলতার গূঢ় সংকেতে, শব্দযোজনার আকস্মিকতায় ও ছন্দপ্রয়োগের অভিনবত্বে চমকপ্রদ কাব্যাঙ্গিক রচনা করিয়া বাংলা কাব্যের প্রাচীন পদ্ধতিকে তাঁহারা ধূলিসাৎ করিয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর প্রতিভা তাঁহাদের তালে তাল দিয়াছিল ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। আরও

সাম্প্রতিক কবিতার অভিনবত্ব

বিস্ময়ের ব্যাপার যে এই নবীন কবিগোষ্ঠী প্রকাশ্যত রবীন্দ্র-বিরোধী কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে রবীন্দ্রনাথের ভাব-কল্পনা ও রোমান্টিকতার অভিসারী। তবে নবীন গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি কবি বিশিষ্ট প্রতিভার অধিকারী। একটা ভাঙনধরা যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া ইঁহারা কবিতা লইয়া খেলা করিতে বাধ্য হইয়াছেন, গঠনমূলক যুগে জন্মাইলে জীবনবেদ রচনা করার শক্তি ইঁহাদের ছিল।

সাম্প্রতিক কবিতার খ্যাতিমান কবিদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্যের অধ্যাপক। ইংরাজী সাহিত্যে ইঁহারা সুপণ্ডিত এবং কাব্যের রসপ্রমাতারূপেও বিচক্ষণ। তাঁহারা সাম্প্রতিক কালের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাবদ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র-বিরোধী গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করিতেন। তাঁহার প্রথম কাব্য 'মর্মবাণী' (১৯২৫) প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহবাণী। 'বন্দীর বন্দনা' (১৯৩০), 'পৃথিবীর প্রতি' (১৯৩৩), 'কঙ্কাবতী', 'দময়ন্তী' (১৯৪৩), 'দ্রৌপদীর শাড়ী' (১৯৪৮), 'শীতের প্রার্থনা', 'বসন্তের উত্তর' (১৯৫৫) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে বাংলা কাব্যের নূতন সুর, জীবন সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। রোমান্টিক স্বপ্ন খুব পরিহার করিতে পারেন নাই; কিন্তু বুদ্ধির কৌশলে এবং বাক্‌শিল্পে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

বুদ্ধদেব বসু

অধ্যাপক কবি অজিত দত্ত আধুনিক কবিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও তাঁহার মধ্যে উৎকট আধুনিকতা দেখা যায় না। তির্যক ভাষাভঙ্গি ও উদ্ভট কল্পনা ব্যতীতই তিনি জীবন সম্বন্ধে নূতন প্রত্যয়ের সুস্পষ্ট বাণী ঘোষণা করিতে পারিয়াছেন। 'কুসুমের মাস' (১৯৩০), 'পাতাল কন্যা' (১৯৩৮), 'নষ্টচাঁদ' (১৯৪৫), 'পুনর্নবা' (১৯৫৪) এবং 'ছায়ার আলপনা' (১৯৫১) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে তাঁহার বাক্‌শিল্প ও কবিপ্রাণতার পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

অজিত দত্ত

অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তী বাংলা কবিতায় আঙ্গিক-প্রকল্পের অভিনবত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার শব্দ প্রয়োগের মধ্যে বিদগ্ধতার পরিচয় রহিয়াছে। জীবন-বোধের মধ্যে এই পণ্ডিত কবি কোন তিক্ত মনোভাবের পরিচয় দেন নাই। তিনি প্রেম, সৌন্দর্য, ত্যাগের মহিমা, বৈরাগ্যের দীপ্তি প্রভৃতি মনোভাবকে প্রাচীনপন্থী কুসংস্কার বলিয়া ঘৃণা বা উপেক্ষা করেন নাই। 'খসড়া' (১৯৩৮), 'একমুঠো' (১৯৩৯), 'মাটির দেওয়াল' (১৯৪২) এবং 'পারাপার' প্রভৃতি গ্রন্থে স্নিগ্ধ কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ইনি রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য হইয়াছিলেন।

অমিয় চক্রবর্তী

কবি বিষ্ণু দে (১৯০৯) বিশিষ্ট প্রতিভার কবি। ইনিও ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক। এই কবি প্রচলিত জীবন-সংস্কারের বিরোধী মনোভাব লইয়া মানবজীবনের দুঃখবেদনাকে রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং ভাষাশিল্পের বিশিষ্টতায় এবং শব্দপ্রয়োগের চমকপ্রদ ভঙ্গিতে পাঠককে হতচকিত করিয়াছেন। বিষ্ণু দের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'উর্বশী ও আর্টেমিস' (১৯৩২), 'চোরাবালি' (১৯৩৮), 'পূর্বলেখ' (১৯৪০), 'সন্দীপের চর' (১৯৪৭), 'অন্বিষ্ট' (১৯৫০) এবং 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৯৫০)। ইনি কাব্যকলায় ইলিয়ট-পন্থী বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত পংক্তিগুলির মাঝে মাঝে উল্লেখ এবং বেদ, পুরাণ, গ্রীকসাহিত্য প্রভৃতি হইতে আহৃত বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহার করিয়া ইনি কাব্যভাষায় বৈচিত্র্য আনিয়াছেন।

বিষ্ণু দে

ইংরাজী সাহিত্যের আর একজন অধ্যাপক কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪)। তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক'(১৯২৭)। পরে তিনি লিখিয়াছেন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬), 'বনলতা সেন' (১৯৪২), 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪), 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮)। তাঁহার শেষ কাব্যগ্রন্থ 'রূপসী বাংলা' (১৯৫৯) তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়াছে। কবি জীবনানন্দের কাব্যসাধনায় যুগযন্ত্রণার পরিচয় নাই, অসন্তোষ ও ক্ষোভের বহ্নিশিখা নাই, জীবন-প্রত্যয়ের অভাবজনিত তির্যক ব্যঙ্গভঙ্গি নাই। তিনি গভীর আনন্দে সমগ্র বিশ্বের রূপমাধুরী যাহা প্রত্যক্ষ বর্তমানে অথবা অতীতের কল্পনায় বিরাজিত তাহাই রূপদক্ষের মত উপভোগ করিয়াছেন ও করাইয়াছেন। তবে তাঁহার রচনা বড় প্রতীকী এবং শব্দগুলি বড় উদ্ভট এবং কোন কোন শব্দব্যবহার মুদ্রাদোষের মত। তথাপি তাঁহার বাগ্‌ভঙ্গির মধ্য দিয়া সহজ সুন্দর ভাবেই তাঁহার কবি-মানসের স্নিগ্ধ সুকুমার কান্তিটি ধরা পড়ে।

জীবনানন্দ দাস

মননশীল বিদগ্ধ কবিরূপে কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছেন। বাঙালী কাব্যরসিকের কাছে তিনি বাগ্‌ভঙ্গির অপূর্বতায় এবং চিন্তাপ্রণালীর সূক্ষ্মতায় পরম বিস্ময় হইয়া উঠিয়াছিলেন। 'তন্বী'(১৯৩০), 'অর্কেস্ট্রা' (১৯৩৫), 'ক্রন্দসী' (১৯৩৭), 'উত্তর ফাল্গুনী' (১৯৪০), 'সংবর্ত' ও 'দশমী' (১৯৫৬) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে তিনি যে কাব্যকলার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সাধারণ বাঙালীর বোধগম্য সাধারণ কবিতা নয়। তাঁহার কাব্য বিদগ্ধ জনের সেব্য। তাঁহার

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

চিন্তার মধ্যে যেমন অতিসূক্ষ্ম দার্শনিকতা, প্রকাশের মধ্যেও সেইরূপ দুর্বোধ্যতা। তিনি অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহারে মাইকেলকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। কাব্যের কায়া নির্মাণে ক্লাসিক মহিমা সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায় এবং প্রেম ও সৌন্দর্য-চেতনার সহজ অনুভূতিকে লেখক মননের ধূসরতা এবং শব্দের ধ্বনিব্যঞ্জনা দ্বারা কিঞ্চিৎ গূঢ় করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

জীবনানুভূতির তীব্রতায় মানবতাবাদের প্রেরণায় কবিত্বের নূতন বাণী শুনাইয়াছিলেন কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। ইনি সমাজসচেতন কবি এবং সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা কাব্যরচনার নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যগ্রন্থ 'প্রথমা' (১৯৩২) বাঙালী কাব্যপাঠকদের মধ্যে বেশ আলোড়ন তুলিয়াছিল। 'ফেরারি ফৌজ' (১৯৪৮), 'সম্রাট' (১৯৫০), 'সাগর থেকে ফেরা' (১৯৫৬), 'হরিণ চিতা চিল' (১৯৬০) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে তিনি পরাজিত মানুষের মনে জয়ের নেশা জাগাইয়াছেন, জীবনের রিক্ততার মধ্যে সার্থকতার গান শুনাইয়াছেন। ভাষাভঙ্গির সারল্যে, প্রকাশের সাবলীল সৌন্দর্যে এবং আবেগের গভীরতায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় গীতিসুরের লাবণ্য পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গির স্পষ্টতায় বিশিষ্ট কবি সমর সেন (১৯১৬)। বস্তু-তান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যে তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও কবিত্ব সমুজ্জ্বল। আধুনিক যুগের রুচিবিকার লইয়া এবং জীবন সম্বন্ধে মনোরম কল্পনার বিরুদ্ধে তিনি ব্যঙ্গবাণী প্রয়োগ করিয়াছেন। 'তিন পুরুষ' নামক কাব্যগ্রন্থে তিনি মিথ্যা আদর্শবাদের ফাঁকা বুলিকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা' নামক সংকলনখানিতে মধ্যবিত্ত সমাজের আদর্শ-সংকট এবং লাঞ্ছনার বাস্তব দুঃখ চিত্রাঙ্কনের প্রচেষ্টা আছে। ছন্দোহীন গদ্যে কবিতা লেখায় তাঁহার বক্তব্য বেশ জোড়ালো ভঙ্গিতেই প্রকাশ পাইয়াছে। অভিনবত্বের দাবীতে সমর সেন সমকালীন কবিসমাজে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

সমর সেন

সমাজবাদী চিন্তাকে আধুনিক কাব্যের উপোযোগী ভাষারূপের মধ্যে বিধৃত করিয়া কবিত্বের প্রকাশে সার্থক হইয়াছিলেন তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)। ইনি ছিলেন একজন বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী এবং অদ্ভুত কবি-প্রতিভার অধিকারী। আঠার বৎসর বয়সের লেখা কবিতার মধ্যেই তিনি আশ্চর্য জীবন-সমীক্ষা ও বাণীশিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছিলেন। 'পূর্বাভাস' কাব্যগ্রন্থ তাঁহার কৈশোরানুভূতির

সুকান্ত ভট্টাচার্য

কাব্য। এই কবির লেখা 'ছাড়পত্র' কাব্যখানি অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল। একটি বড় রকমের প্রতিভাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা হয়। কিন্তু মতবাদ প্রচারণার মধ্য দিয়াও কবি-প্রতিভার শাশ্বত সৌন্দর্য প্রকাশ পাওয়ায় কবি সুকান্ত কালজয়ী হইবেন। তাঁহার অকালমৃত্যু বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি।

সাম্প্রতিক কবিতার ভাব ও রূপ-পরিবর্তনের সাধকগণ

সাম্প্রতিক কালে সমাজ-সচেতন কবিকুলের ছড়াছড়ি। নানা ভঙ্গিতে নানা প্রকার ছন্দ-বৈচিত্র্য দেখাইয়া, শব্দ-অলঙ্কার-রূপকল্প প্রয়োগের অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়া কত কবি যে কত লিখিতেছেন তাহার সমীক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। ইহার মধ্যে পুরাতনের অনুবৃত্তি আছে, নূতনের চমক আছে, কল্পনার অতিচার আছে, ভাবের দুর্বোধ্যতা আছে। কিন্তু যাহাই হউক, কবিতা ঠিক গণসাহিত্য হইয়া উঠিতেছে না। শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী, সমাজচেতন মননশীল পাঠকেরাই এই সব কবিতার মূল্যনির্ধারক। ইহার পর মহাকাল যথাকালে ইহাদের পরিণাম নির্দেশ করিয়া দিবেন। সমাজসচেতন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্য শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। বিমল ঘোষ, দিনেশ দাশ, অরুণ মিত্র, গোলাম কুদ্দুস, হরপ্রসাদ মিত্র, জগন্নাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি কবিরা কাব্যের ভাববস্তুতে ও কলাকৌশলের উদ্ভাবনে প্রতিভার পরিচয় দিতেছেন। নীরেন্দ্র চক্রবর্তী, মনীন্দ্র রায়, অরুণ ভট্টাচার্য, আনন্দ বাগচী, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রতিভাবান কবিরা বাংলা গীতিকাব্যের রূপ ও রসধারার অভিনব পরিবর্তন সাধনে যত্নশীল হইয়াছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে কাহার কি স্থান হইবে তাহা শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক মহাকালই নির্ণয় করিবেন।

প্রশ্নাবলী

১। আধুনিক যুগে মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পর্যন্ত গীতিকবিতার কিরূপ প্রসার ঘটিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ('63 B.A. alt.)।

২। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ হইতে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বাংলা মহাকাব্য রচনার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ('63 B.A.)

৩। আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, বিহারীলাল তিনটি স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক। কিন্তু বিহারীলালের ধারাই জয়ী। আলোচনা কর। ('64 Hons,)

৪। ঈশ্বরগুপ্ত ও তাঁহার অনুবর্তীদের দ্বারাই বাংলাসাহিত্যের নূতন যুগ পত্তন হয়। তথ্যযোগে এই উক্তির সত্যতা নিরূপণ কর। ('63 Hons.)

৫। কবি ঈশ্বর গুপ্ত হইতে মধুসূদন অবধি বাংলা কবিতার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। ('64 B.A. alt.)

৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা কর। ('63 B.A. alt.)

৭। "ভারতচন্দ্রী ধরণটা তাঁহার অনেক ছিল বটে—অনেক স্থলে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুগামী মাত্র। কিন্তু আর একটা ধরণ ছিল, যাহা কখনও বাংলা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাংলা ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে।" ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যকৃতি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিমত কতখানি সমর্থনীয়, তথ্য ও যুক্তিসহ আলোচনা কর। ('66 M.A.)

৮। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে যে-সমস্ত গীতিকবির আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে বিহারীলালের গীতিসুরের বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে তাঁর কৃতিত্ব নির্ণয় কর। ('66 M.A.)

৯। "বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে যে কবিওয়ালাদের গান দেখা দিয়েছিল, তার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য উপেক্ষণীয় নয়।"—আলোচনা কর। ('65 M. A.)

১০। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে আধুনিক বাংলা আখ্যানকাব্যের উদ্ভব ও পরিণতির ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত কর। ('65 M.A.)

১১। "আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে ঈশ্বর গুপ্তের প্রবর্তিত ধারা মধুসূদন ও বিহারীলালের প্রভাবে নিষ্প্রভ হয়ে গেলেও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে

যায়নি। কারণ সে কাব্যধারা যে মনোভাবকে আশ্রয় করেছিল তা এখনও অনেকাংশেই অক্ষুণ্ণ আছে।” আলোচনা কর। ('64 M.A.)

১২। উনবিংশ শতাব্দীর আখ্যায়িকাকাব্য ও মহাকাব্যের পার্থক্য নির্ণয়-পূর্বক উভয় শ্রেণীর কয়েকজন কবির রচনার তুলনামূলক আলোচনা কর। ('63 M. A.)

১৩। মধুসূদনের পর ও রবীন্দ্রনাথের পূর্ব—এই অন্তর্বর্তী কালে বাংলা কাব্যের অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

১৪। “নবীনচন্দ্রের প্রতিভা গীতিকবির প্রতিভা; কাজেই মহাকাব্যের আধারে তিনি গীতিকবিতা রচনা করিয়াছেন।”—উক্তিটির যৌক্তিকতা বিচার কর।

১৫। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার গতি-প্রকৃতির বিভিন্ন দিক নির্দেশ করিয়া কয়েকজন খ্যাতিমান্ কবির পরিচয় দাও।

১৬। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :—

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (64 B.A., 64 M.A.), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (64 B.A.), নজরুল ইসলাম (64 B.A.), বিহারীলাল চক্রবর্তী (63 B.A.), নবীনচন্দ্র সেন (63 B.A.), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (64 Hons.), কৃষ্ণকুমার মজুমদার (66 Hons.), গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (66 Hons.), জীবনানন্দ দাশ (64 B.A.), কবি দ্বিজেন্দ্রলাল (66 M.A.), পদ্মিনী উপাখ্যান (63 B.A.), শৈশব সঙ্গীত (66 Hons.), কাঞ্চী-কাবেরী (61 B.A., 66 Hons.), ভারত উদ্ধার (61 M.A.), চতুর্দশপদী কবিতাবলী (64 M.A.), ব্রজাঙ্গনা (66 U. U), সাধের আসন (67 U.U.) বীরাঙ্গনা (67 U.U.) মহিলাকাব্য (67 U. U.), মন্ত্রকাব্য (67 U. U.).

চতুর্থ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ

১। 'পরিশেষ'-'পুনশ্চ'-এর পূর্বপর্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্যে বিভিন্ন পর্বের পরিচয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-শিল্পীমানস যে একটি চলমান সত্তা তাহা বিশ্লেষণ কর।

উত্তর। কেবল বাংলা সাহিত্যের নহে, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসেই কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ এক অপার বিস্ময়। প্রতিভার এমন সর্বতোমুখী ভাস্বর দীপ্তি আর কোন মহত্তম শিল্পীর জীবনে দেখা যায় নাই। সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে তাঁহার স্বর্ণরথ সঞ্চরণ করিয়াছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্র সপ্তাশ্বের দ্যুতিস্পর্শে বর্ণময় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অসামান্য বাণীরচনাশক্তি অনন্ত রূপ-ভঙ্গিমায় ও অন্তহীন বৈচিত্র্যে অফুরন্তভাবে উৎসারিত হইয়াছে, তাহা 'দেখে দেখে আঁখি না ফেরে'। বাঙালীর সহস্র বৎসরের সাহিত্যসাধনা যেন ঐ একটি মানুষের মধ্যেই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। সুদীর্ঘ ষাট বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ অতন্দ্র সাধনায় যে-অসামান্য রূপসৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহা সাহিত্যের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। মোহিতলালের ভাষায় "প্রাণের অনির্বচনীয় অনুভূতিকে—সৌন্দর্যবিধুর ভাবাকুল চিত্তের গহনবাসিনী অলক্ষ্যচারিণী ছায়ামায়াময়ী মূর্তিগুলিকে—তিনি বাংলা ভাষার অক্ষরধ্বনিতে ধরিয়া দিয়াছেন; যাহা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক তাহাকে এমন বাঙ্ময়ী রাগিণীতে যুগপৎ ভাষার ইন্দ্রজাল ও সুরের মোহিনী মূর্ছনায় আর কেহ শ্রুতিগোচর করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ।" মোহিতলাল অবশ্য রবীন্দ্রনাথের রচিত গানগুলি সম্পর্কেই ইহা বলিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধেও ইহা সমভাবে প্রযোজ্য। রবীন্দ্র-শিল্পিমানস সম্বন্ধে আর-একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, উহা কোথাও সীমিত ক্ষেত্রে স্থির থাকে নাই, উহা একটি চলমান সত্তা। নিত্য নূতনের অভিসারে উহার প্রবাহ বারে বারে বাঁক ফিরিয়াছে। সেই বাঁকের মুখে মুখে কত-না বৈচিত্র্য, কত-না রূপবিভূতির বৈভব! রূপকর্ম ও ভাবের দিক হইতে আমরা এই বিশাল কবিকীর্তিকে কতকগুলি পর্বে ভাগ করিয়া বিশ্লেষণ করিতে পারি।

রবীন্দ্র-শিল্পীমানস—চলমান সত্তা

রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্বকে আমরা উন্মেষ-পর্ব আখ্যা দিতে পারি। ইহার বিস্তৃতিকাল ১৮৮২ হইতে ১৮৮৬ সাল। কিন্তু ইহার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলি হইল 'কবিকাহিনী'

(১৮৭৮), 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৭৮), 'বনফুল' (১৮৮০) ও 'ভগ্নহৃদয়' (১৮৮১)। কবি নিজেই এই রচনাগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহারা 'অপরিণত মনের প্রকাশ অপরিণত ভাষায়।' ইতিহাসের ধারা রক্ষার জন্যও তিনি ঐ সকল স্খলিতপদচর রচনাকে স্বীকার করিতে চাহেন নাই ; কারণ তাঁহার মতে 'লেখা যখন কবিতা হয়ে উঠেছে তখন থেকেই তার ইতিহাস।' তথাপি আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রকাব্যের বিবর্তনধারাটিকে অনুসরণ করিবার জন্যই শৈশব-পর্বের ঐ কাব্যগুলির উল্লেখ প্রয়োজন। লক্ষ্য করিবার বিষয়—তিনটি কাব্যই আখ্যান-কাব্যের ভঙ্গিতে লিখিত। ঐগুলির ভাষা ও ভাব অপরিণত হইলেও রবীন্দ্র-শিল্পীমানসের দুই-একটি দিকের আভাস পরিস্ফুট। যেমন, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানুষের নিগূঢ় সম্বন্ধের কথা 'বনফুল'-এ ধ্বনিত। 'মানুষ নিকটের জিনিসকে অবহেলা করিয়া দূরে চলিয়া যায়, তাহাতে সে নিকটকে হারায়, দূরকেও পায় না'—'কবি-কাহিনী'র ইহাই মূল বক্তব্য। নারীর মোহিনী ও কল্যাণী এই দুই রূপ রবীন্দ্রকাব্যে নানা ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ; 'ভগ্নহৃদয়-'-এ আমরা নারীর এই দুই রূপেরই একটি নীহারিকা-অবস্থার সাক্ষাৎ পাই। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের অনুসরণে তিনি যে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' লিখিয়াছিলেন, উহা কিন্তু নিতান্তই অপরিণত রচনা ছিল না। বিশেষত উহার দুই-একটি কবিতা ('মরণ,' 'প্রশ্ন') গভীর ভাবাবেগে পূর্ণ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

শৈশব-পর্বের কাব্য

উন্মেষ-পর্বের কাব্যগ্রন্থগুলি হইল 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' (১৮৮২), 'প্রভাত-সঙ্গীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪), 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬)। 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত'-এর কবিতাগুলির মধ্যে একটা বিষন্নতার সুর ধ্বনিত হইয়াছে। 'তারকার আত্মহত্যা', 'দুঃখ-আবাহন', 'আশার নৈরাশ্য', 'পরাজয়-সংগীত', 'সুখের বিলাপ' প্রভৃতি কবিতার নামের মধ্যেই একটা বিষাদের ভাব নিহিত রহিয়াছে। 'হৃদয়-অরণ্য'-এর মধ্যে কবি যেন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ একা। সেই একাকিত্বের ছায়ায় দুঃখকেই একমাত্র সহচররূপে তিনি আহ্বান করিয়াছেন। কবিতাগুলির শিল্পমূল্য যাহাই হোক না কেন, রচনারীতির দিক হইতে কিন্তু এইগুলি শৈশব-পর্বের পূর্ববর্তী কাব্যগুলি অপেক্ষা সম্পূর্ণ আলাদা জাতের। আখ্যানকাব্য হইতে কবি এই প্রথম গীতিকবিতার রাজ্যে প্রবেশ করিলেন।

উন্মেষ-পর্ব : 'সন্ধ্যা-সংগীত'

কিন্তু জগৎবিচ্ছিন্ন এই দুঃখবিলাস রবীন্দ্র-মানসের যথার্থ ধর্ম নহে বলিয়াই পরবর্তী কাব্য 'প্রভাত-সঙ্গীত'-এ তিনি হৃদয়-অরণ্য হইতে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজিয়া পাইলেন। বিষণ্ণ সন্ধ্যা হইতে একেবারে আনন্দোজ্জ্বল প্রভাতালোকে উত্তরণ! প্রকৃতি ও মানবজীবনের সান্নিধ্য লাভ করিয়া কবি গাহিয়া উঠিলেন :

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি',
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

সমগ্র চৈতন্য দিয়া আনন্দময় বিশ্বকে দেখিবার উল্লাসই 'প্রভাত-সঙ্গীত'-এর মূল স্বর। শৈল্পিক ত্রুটি সত্ত্বেও এই কাব্যের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন-সাধনের যে-পালাকে কবি নিজেই তাঁহার কাব্যের মূল স্বর বলিয়াছেন, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এ তাহারই আভাস রহিয়াছে। বিশ্ববোধের আনন্দেই নির্ঝর উৎসারিত, কবিমানসও উদ্‌বারিত। কবিতাটি আরও অর্থপূর্ণ এই কারণে যে, উহাতেই রবীন্দ্র-কাব্যজীবনের ভূমিকাটিও নিহিত রহিয়াছে। তিনি যে অনেক কথা বলিতে আসিয়াছেন তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে এইরূপে :

উন্মেষ-পর্ব : 'প্রভাত-সংগীত'

আমি তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া
নব নব দেশে বারতা লইয়া,
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
গাহিয়া গাহিয়া গান ;
যত দেব প্রাণ, ব'য়ে যাবে প্রাণ, ফুরাবে না আর প্রাণ।
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে, প্রাণ হয়ে আছে ভোর ॥

পরবর্তী কাব্য 'ছবি ও গান'-এ 'প্রভাত-সঙ্গীত'-এর আনন্দই কতকগুলি সংগীতধর্মী চিত্রের মাধ্যমে বিধৃত। কবি নিজেই বলিয়াছেন, "নিতান্ত সামান্য জিনিসকেও বিশেষ করিয়া দেখিবার একটা পালা এই ছবি ও গানে আরম্ভ হইয়াছে। গানের সুর যেমন সাদাকথাকেও গভীর করিয়া তুলে, তেমনি কোনো একটা সামান্য উপলক্ষ্য লইয়া সেইটেকে হৃদয়ের রসে রসাইয়া তাহার তুচ্ছতা মোচন করিবার ইচ্ছা ছবি ও গানে ফুটিয়াছে।" 'ছবি ও গান'-এর পরের কাব্য 'কড়ি ও কোমল'। এই কাব্যের মূল্যায়ন করিতে গিয়া

উন্মেষ-পর্ব : 'ছবি ও গান' এবং 'কড়ি ও কোমল'

কবি নিজেই বলিয়াছেন, "কড়ি ও কোমলে অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে, কিন্তু সেই পর্বে আমার কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।" বস্তুত, 'কবির কবিতা এই সময় হইতে অনেকটা সংযত আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এখন তাঁহার ভাষা ও ছন্দ আগের মতন আর এলোমেলো নাই, তাহা নিয়মিত হইয়া আসিয়াছে, হৃদয়ভাবগুলিও স্পষ্ট ও বাক্যচিত্রগুলি সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।' মর্ত্যজীবনের প্রতি গভীর আকর্ষণ 'প্রাণ' কবিতায় পরিস্ফুট হইয়াছে এইরূপে :

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

এই মর্ত্যপ্রীতি পরবর্তীকালে রবীন্দ্রকাব্যে নানাভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। শিশু সম্বন্ধে কবিতা রচনার অঙ্কুরও 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান' কবিতায় উপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই কাব্যের সনেটগুলিতে যে-সৌন্দর্য-তৃষ্ণার প্রকাশ দেখা যায়, উহাই কাব্যটিকে পৃথক একটি রূপৈশ্বর্যে মণ্ডিত করিয়াছে। কবির 'যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।' কতকগুলি সনেটে ইন্দ্রিয়গোচর ভোগের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, আবার কতকগুলি সনেটে ভোগাকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে গভীর অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাসের স্পর্শও পাওয়া যায়। 'কড়ি ও কোমল'-এ-ই রবীন্দ্রনাথ প্রথম তাঁহার কাব্যরূপরীতিতে 'সনেট' সংযুক্ত করেন। প্রথম পর্বের কাব্যগুলির বিবর্তন প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"সন্ধ্যা-সঙ্গীত'-এ গোধূলি-বিষাদ, 'প্রভাত-সঙ্গীত'-এ নবজাগরণের আনন্দ-কাকলী, 'ছবি ও গান'-এ গভীর অনুভূতির সহিত নিঃসম্পর্ক রং ও সুরের খেলা এবং 'কড়ি ও কোমল-'এ প্রধানত রূপ-বিহ্বলতার মধ্য দিয়া সূক্ষ্মতর অনুভূতির উন্মেষ কবিমানসের অগ্রগতির স্তরগুলিকে সূচিত করে।"

রবীন্দ্র-কাব্যে দ্বিতীয় পর্বের বিস্তৃতি ছয় বৎসর। ইহার মধ্যে রচিত হইয়াছে 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬) ও 'চৈতালি' (১৮৯৬)। এই সময়ের মধ্যেই রবির মধ্যাহ্ন-দীপ্তি। মর্ত্যপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রীতি, বিশ্বব্যাপ্তির আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি যে-সকল বিষয় রবীন্দ্র-কাব্যের বৈশিষ্ট্য, এই পর্বে সেই সকল বিষয়ই অনবদ্য বাণী-সুষমা লাভ করিয়াছে। 'মানসী' রচনার সময়েই "রবীন্দ্র-প্রতিভা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, নিজের ক্ষমতা

দ্বিতীয় পর্বের সূচনা : 'মানসী'

সম্বন্ধে কবির চেতনা জাগিয়াছে, এবং দৃঢ়তার সহিত আপনার মনঃকল্পনাকে তিনি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।...এই সময় হইতে কবি তাঁহার রচনার তারিখ নির্দেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।...মানসীতে ছন্দের রাজা রবীন্দ্রনাথ ছন্দের উপর তাঁহার অধিকার কায়েমিভাবে সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছেন। ইউরোপীয় ছন্দের অনুরূপ নানা ধরনের নব নব ছন্দ তিনি সৃষ্টি করিলেন, মাইকেল ও হেমচন্দ্রের অনুবর্তী হইয়া কবিতায় স্টাঞ্জা-বিভাগ অবলম্বন করিলেন। এতদিন পর্যন্ত বাঙলার কবিরা অক্ষর গণিয়া কবিতা রচনা করিতেছিলেন; গানের রাজা রবীন্দ্রনাথ এই প্রথম মানসীর মধ্যকার কবিতায় মাত্রা বা সিলেব্‌ল্‌ গণিয়া, কানে শুনিয়া তালবোধের দ্বারা কবিতা রচনা আরম্ভ করিলেন। এইটি বাংলা ছন্দে তাঁহার একটি বিশেষ বৃহৎ দান। এখন হইতে কবি যুক্তাক্ষরের পূর্বস্বরকে দুই মাত্রা ধরিয়া কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)।" নিঃসন্দেহে ইহা পূর্বতন রচনাধারা হইতে স্বতন্ত্র একটা নূতন কাব্যরূপের প্রকাশ। 'মানসী'তেই "কবির সঙ্গে একজন শিল্পী এসে যোগ দিল।" কবিতার অন্তরঙ্গেও দেখা যায়, এই কাব্যে চিত্ররীতির কবিতার সঙ্গে সঙ্গীতরীতির কবিতার যুক্তবেণী গ্রথিত হইয়াছে। চিত্ররীতিতে বস্তুর 'রূপ'কে ধরিবার প্রয়াস এবং সঙ্গীতরীতিতে বস্তুর 'স্বরূপ'কে ধরিবার প্রয়াস। 'মেঘদূত' প্রথমটির প্রতিনিধি, 'সুরদাসের প্রার্থনা' দ্বিতীয়টির। 'মেঘদূত'-এ বাহিরের সৌন্দর্যপিয়াসী কবি-মন

চিত্র ও সংগীতরীতির যুক্ত-বেণী এবং মাত্রাছন্দ

মুক্তগতি মেঘপৃষ্ঠে লয়েছে আসন,
উড়িয়াছে দেশ-দেশান্তরে। কোথা আছে
সানুমান আম্রকূট, কোথা বহিয়াছে
বিমল বিশীর্ণ রেবা বিন্ধ্য-পদমূলে
উপল-ব্যথিত গতি।......

কিন্তু 'সুরদাসের প্রার্থনা'য় 'আলোক-মগন মুরতি-ভুবন হতে' কবি পরিত্রাণ চাহিয়াছেন। সেখানে দৃষ্টি অন্তরে নিবদ্ধ:

আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে একাকী অসীম ভরা,
আমারি আঁধারে মিলাবে গগন মিলাবে সকল ধরা।...

সে নব জগতে কাল-ধারা নাই, পরিবর্তন নাহি,
আজি এই দিন অনন্ত হয়ে চিরদিন র'বে চাহি'।...
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি,
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব অনন্ত বিভাবরী॥

মূর্ত সসীম সৌন্দর্য নয়, পরিপূর্ণ অখণ্ড বিশুদ্ধ অমূর্ত সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষার উপলব্ধি 'মানসী'র প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে পরিস্ফুট। 'মানসী'তে দেশ-সম্বন্ধীয় ব্যঙ্গাত্মক কবিতাও আছে, কিন্তু ইহার প্রেম ও সৌন্দর্যবিষয়ক কবিতাগুলিই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

'সোনার তরী'তে রবীন্দ্র-প্রতিভা সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। বিশ্বানুভূতি ও সৌন্দর্যানুভূতি ইহার মূল সুর। "সীমার সহিত অসীমের মিলন সাধনের কথা, প্রকৃতির সহিত আত্মার অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগের অনুভূতি, শুধু নিজের মধ্যে বদ্ধ না থাকিয়া বা সীমার মধ্যে অবরুদ্ধ না থাকিয়া হঠাৎ জগতে ছড়াইয়া পড়িবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা, আমাদের বৈরাগ্য-প্রপীড়িত তামসিক জীবন-যাত্রার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কথা ইত্যাদি 'সোনার তরী' কাব্যে বিঘোষিত হইয়াছে।' 'সোনার তরী', 'পরশ-পাথর', 'আকাশের চাঁদ', 'দুই পাখি' প্রভৃতি কবিতায় আছে রূপকসৃষ্টির প্রয়াস। 'বৈষ্ণব-কবিতা', 'যেতে নাহি দিব', 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি কবিতায় মর্ত্যপ্রীতি ও মানবপ্রেমের কথা ধ্বনিত হইয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যের একটি বিশেষ রীতি এই কাব্যের কয়েকটি কবিতায় প্রকাশিত। উহা বিশেষ হইতে নির্বিশেষে উত্তরণ। 'শৈশব-সন্ধ্যা', 'যেতে নাহি দিব' প্রভৃতি কবিতা এই গোত্রের। 'শৈশব-সন্ধ্যা'য় দেখা যায়, এক গৃহমুখী বালকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কবির নিজ শৈশবের সন্ধ্যাবেলার কথা মনে পড়িয়া গেল। তারপরেই কবি সেই শৈশবকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত করিয়া অনুভব করিলেন :

'সোনার তরী' : সৌন্দর্যানুভূতি বিশ্বানুভূতি, মর্ত্যপ্রীতি

দাঁড়াইয়া অন্ধকারে
দেখিনু নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে
রয়েছে পৃথিবী ভরি' বালিকা বালক,
সন্ধ্যা-শয্যা, মা-র মুখ, দীপের আলোক।

এই কাব্যে কবি 'লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাখা সুন্দর ধরাতলে' 'আকাশভালে'

'পুষ্পের মতো সংগীতগুলি' ফুটাইয়াছেন, 'সংসার ধূলিজালে' 'গীতরসধারা' সিঞ্চন করিয়া 'আনন্দলোক' বিরচন করিয়াছেন।

"রবীন্দ্রনাথ প্রেম ও সুন্দরের উপাসনায়—আনন্দযজ্ঞের পৌরোহিত্যে কখনই প্রেম ও সুন্দরের সসীম ও রূপময় বিকাশের উপলব্ধিতে তৃপ্ত হন নাই—সীমা ও রূপ যে অসীম ও অরূপের দ্যোতনা করে, তাহাকেই উপলব্ধ করার তৃষ্ণায় কাতর হইয়া নানা বৈচিত্র্যময় পদ্ধতিতে, তাহার সন্ধান করেন। তাই তাহার কাব্যধর্মে ঘন ঘন ঋতু-পরিবর্তনের ঘটা। তিনি গভীর ভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহার কাব্য-জীবনের অন্তরালে একটি বিশিষ্ট শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতেছে—যাহা কবিকে দিয়া নিয়তই কাব্যের হরিৎ সম্পদ সৃষ্টি করাইতেছে। এই 'অন্তর্যামী' কবির কাব্য-জীবনের এবং ব্যক্তি-জীবনের এক পরম জিজ্ঞাসারূপে সারাজীবন তাঁহাকে অশান্ত, চঞ্চল ও ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। এই অন্তর্যামীর সন্ধানই কবির কাব্যে নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।" ইহারই শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত 'চিত্রা' কাব্য।

'চিত্রা' ঃ
জীবন-দেবতা-পর্ব

সর্বদিক হইতেই 'সোনার তরী' অপেক্ষা ইহা অধিকতর পরিণত। এই পর্বেই সৌন্দর্যকে তিনি এক ও অখণ্ডরূপে উপলব্ধি করিলেন। যে-সৌন্দর্য পৃথিবীর বস্তুসত্তায় নানা রূপে বিলসিত তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই কবি বলিলেন :

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।"

আবার চৈতন্যসত্তায় এই সৌন্দর্যই 'অন্তরব্যাপিনী' ;

অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী।

এই সৌন্দর্য-তত্ত্বই রূপায়িত হইয়াছে 'বিজয়িনী', 'উর্বশী,' 'জ্যোৎস্না-রাত্রে', 'পূর্ণিমা' প্রভৃতি কবিতায়। কিন্তু মূলত 'চিত্রা'র যুগ 'জীবনদেবতা'র যুগ। তাঁহারি উদ্দেশে কবি বলেন :

গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া মূরতি নিত্যনব ॥

বলিয়াছেন—"খেলা করিয়াছ নিশদিন মোর সব সুখে সব দুখে (সিন্ধুপারে)।" এই জীবনদেবতাকেই কবি কখনও বলিয়াছেন 'অন্তর্যামী', কখনও 'জীবনদেবত,' পরবর্তীকালে কখনও 'লীলা-সঙ্গিনী', কখনও-বা 'বিচিত্র।'।

দ্বিতীয় পর্বের শেষ ফসল: 'চৈতালি'

এই পর্বের শেষ ফসল কবি তুলিয়াছেন 'চৈতালি' কাব্যে। 'জীবনের সকল সম্বল', 'বনের বেদন-নিবেদন' অঞ্চল ভরিয়া লুটিয়া লইবার জন্য কবি তাঁহার 'সার্থক-সাধন' কল্পনায় অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে এখানে আহ্বান জানাইয়াছেন। 'মানবত্বের মহিমায় কবির হৃদয় যে পরিপূর্ণ হইয়াছে, সাধারণ নরনারীর জীবনযাত্রার মাধ্যমে কবি এই কাব্যে তাহারই ছোট ছোট চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতকে নানারূপে আবিষ্কারের আভাসও ইহার কয়েকটি কবিতায় বিধৃত। ইহারই মধ্যে কবি তাঁহার পরবর্তী কাব্যরূপের বীজও বপন করিয়াছেন। সুতরাং শেষ ফসল, ফসলের শেষ নয়, নূতন ফসলেরই সম্ভাবনা। ইহার মধ্যে আমরা কবির চলমান সত্তার একটি চিত্র দেখিতে পাই। প্রতি পর্বের প্রান্তে আসিয়াই কবির মনে হয়, ইহাই বুঝি তাঁহার শেষ ফসল বা শেষ দান। 'খেয়া', 'পূরবী,' 'পরিশেষ' প্রভৃতির নামের মধ্যে উহার ইঙ্গিত ছড়ানো রহিয়াছে। কিন্তু শেষের মধ্যে যে অশেষ আছে, কবির কাব্যজীবনে তাহা বারবার প্রমাণিত হইয়াছে। তাই 'খেয়া'র পরেও তিনি গতির 'বলাকা'-পক্ষ বিস্তার করিয়াছেন, 'পরিশেষে' এর পরে আবার 'পুনশ্চ'-এ ফিরিয়া আসিয়াছেন।

তৃতীয় পর্ব: 'কথা', 'কাহিনী', 'কল্পনা': 'কল্পনা'য় অতীতের অভিসার

তৃতীয় পর্বে রবীন্দ্র-মানস নিছক সৌন্দর্যসাধনা ত্যাগ করিয়া অতীত ভারতের মহিমার দিকে মুখ ফিরাইয়াছে। 'কথা' (১৯০০), 'কাহিনী' (১৯০০), 'কল্পনা' (১৯০০), 'ক্ষণিকা' প্রভৃতি এই সময়কার কাব্য। 'কথা'য় আছে বৌদ্ধ-শিখ-মহারাষ্ট্র-রাজপুত-জীবনের মহত্ত্ব ও ত্যাগের কাহিনী। গাথা বা ব্যালাড্ জাতীয় এইরূপ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ রচনারীতির অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কবিতার আকারে এই নাটকীয় গল্পগুলি এক-একটি দ্যুতিমান হীরকখণ্ডের মতো। 'কাহিনী'তে আছে দুইটি কবিতা ('পতিতা', 'ভাষা' ও ছন্দ') এবং পাঁচটি নাট্যকাব্য ('গান্ধারীর আবেদন', 'সতী', 'নরকবাস', 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ও

'কর্ণকুন্তী-সংবাদ')। 'এই কয়খানি নাট্যকাব্যে কবি এই কথা প্রচার করিয়াছেন যে সামাজিক বা লৌকিক ধর্মের চেয়েও শ্রেষ্ঠ একটি নিত্যধর্ম সত্যধর্ম আছে—তাহা মানবধর্ম, তাহা শাস্ত্রাচারের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন নয়, সাম্প্রদায়িকতার মোহে অভিভূত নয়, তাহা ন্যায়ে যুক্তিতে প্রেমে কল্যাণে সুপ্রতিষ্ঠিত।'

'কল্পনা' কাব্য একদিকে অতীতের অভিসারী, দূরে বহুদূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে শিপ্রানদীপারে পূর্বজনমের প্রথম প্রিয়ার সন্ধানী, অপরদিকে নিষ্ক্রিয়তা অতিক্রম করিয়া কর্মময় জীবনে জাগৃতির কৃচ্ছ্র ব্রতসাধনায় আকাঙ্ক্ষী :

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন-ক্রন্দন,
হেরিব না দিক্,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান, মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি',
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি' ॥

'ক্ষণিকা' রবীন্দ্রনাথের একটি অভিনব ও অনবদ্য সৃষ্টি। এই কাব্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, ইহাতে কবি 'প্রথম হসন্তবহুল চল্‌তি কথার সৌন্দর্য ও ধ্বনিমাধুর্য ধরিতে পারিলেন। লিরিকের যাহা বাহ্য উপাদান—ছন্দ, সহজ ভাষা ও অলংকার—তাহা এই কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে বিচিত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার ছন্দে ভাবে প্রকাশভঙ্গিতে কবির স্বচ্ছন্দ স্বাধীন অবলীলাক্রম ঝলমল করিতেছে, সর্বত্র আনন্দের লঘু নৃত্য টলমল করিতেছে।' শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"ক্ষণিকা-তে কবি জীবনবোধের এক লঘু-চপল, পরিহাসস্নিগ্ধ রূপ আঁকিয়াছেন।" কবি বলেন :

'ক্ষণিকা' : লঘুরস : স্বরবৃত্ত ছন্দের সৃষ্টি

ভাষার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে খুঁজিনে ভাই ভাষাতীত,
আকাশপানে বাহু তুলে চাহিনে ভাই আশাতীত ॥

'নৈবেদ্য' (১৯০১), 'খেয়া' (১৯০৬), 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০), 'গীতিমাল্য' (১৯১৪) ও 'গীতালি' (১৯১৪)– চতুর্থ পর্বের এই কাব্যগুলিতে কবির অধ্যাত্মচারণায় সুর

ধ্বনিত। 'স্মরণ' (১৯০২-৩), 'শিশু' (১৯০৩), 'উৎসর্গ' (১৯১৪)—ইহারই মধ্যবর্তীকালে রচিত। 'স্মরণ' কাব্যটি কবির স্ত্রীবিয়োগে রচিত। ইহার কবিতাগুলি ব্যক্তিগত হইয়াও একটি নৈর্ব্যক্তিক রূপ লাভ করিয়াছে। 'শিশু'র কবিতা কল্পনা-প্রবণ শিশু-হৃদয়ের অনবদ্য আলেখ্য। এই কাব্যে শিশু-মনের অন্তর্নিহিত রহস্যকে অতুলনীয় ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে। দেশ-বিদেশের কোনো কবি এমন নিপুণতার সহিত শিশুর মনস্তত্ত্ব চিত্রিত করিতে পারেন নাই। 'উৎসর্গ'-এ আছে অপারিপূর্ণতার বেদনা। মূলত ·ই কবিতাগুলি 'কবির বিশেষ বিশেষ ভাবপর্যায়ের কবিতার মুখবন্ধ বা উপক্রমণিকা অথবা ব্যাখ্যা-স্বরূপ বলিয়া কবিতাগুলি গভীর ভাবে সমৃদ্ধ এবং সরস কবিতা হিসাবেও অত্যুত্তম।' এই কাব্যে কয়েকটি জীবনদেবতা ভাবের কবিতা, মৃত্যুসম্বন্ধীয় কবিতা ও আধ্যাত্মিক সুরের কবিতা রহিয়াছে।

চতুর্থ-পঞ্চম পর্বের মধ্যবর্তী কাল : 'স্মরণ' 'শিশু', 'উৎসর্গ'

'নৈবেদ্য' অধ্যাত্মরাজ্যের প্রবেশক কাব্য। সর্বসংস্কারমুক্ত সত্যধর্মের উপলব্ধির প্রকাশ রহিয়াছে 'নৈবেদ্য'-এর সনেটগুলিতে। এখানে কবি-রবীন্দ্রনাথ সাধক-রবীন্দ্রনাথে পরিণত। পারিবারিক জীবনে যে-ঔপনিষদিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন সর্বকালীন সত্যধর্মের সমন্বয়ে তাহারই একটি বলিষ্ঠ রূপ কাব্যটির মধ্যে বিধৃত। 'ভারত সম্বন্ধে যে-সমস্ত কবিতা নৈবেদ্যে আছে, সে-সমস্তও পূর্ণ এবং বীর্যবান মুক্ত-দর্শনের আলোকে ভাস্বর।' 'চিত্রা'র রূপের জগৎ হইতে 'গীতাঞ্জলি'র অরূপ জগতে পাড়ির কাব্য হইল 'খেয়া'। কবিমানস যে আবার বাঁক ফিরিতেছে তাহারই আভাস 'খেয়া'য় রূপায়িত। ইহার অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই রহিয়াছে একটা করুণউদাস ভাব। উহার রস কিন্তু মধুর ও হৃদয়গ্রাহী। এই কারণেই ইহার শৈল্পিক রূপটিও তাত্ত্বিক নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলি হইতে শ্রেষ্ঠতর। এই কাব্যেই রবীন্দ্রনাথের গূঢ়বাদ বা মিস্টিসিজ্‌ম্-এর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে। জনৈক সমালোচকের মতে—'খেয়া এক অপূর্ব কাব্য। নৈবেদ্যে যা তত্ত্ব ও ভাবরূপে অভিব্যক্ত হয়েছিল, সেই ভগবৎপ্রেম ও ভগবানের সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষা খেয়ায় বিচিত্র রসমাধুর্যে পরিণত হয়েছে।' 'প্রতীক্ষা' কবিতায় উহাই এইভাবে রূপায়িত :

চতুর্থ পর্বের আরম্ভ : 'নৈবেদ্য', 'খেয়া' : অধ্যাত্ম রাজ্যের প্রবেশক কাব্য

আমি এখন সময় করেছি,
তোমার এবার সময় কখন হবে।

সাঁঝের প্রদীপ সাজিয়ে ধরেছি,
শিখা তাহার জ্বালিয়ে দেবে কবে।

'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'র জগৎ সম্পূর্ণ অরূপের জগৎ। উহা গীতিমাধুরীর জগৎও বটে। কারণ, তিনটি কাব্যই মূলত গানের সংকলন-গ্রন্থ। এই পর্বে কবিচিত্ত কখনও ভগবানের প্রতীক্ষায় অধীর, আবার কখনও ভগবানের সহিত মিলনের আনন্দে অধীর। যেমন :

এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর।
পুণ্য হোলো অঙ্গ মম, ধন্য হোলো অন্তর
সুন্দর হে, সুন্দর ॥

তাঁহারি স্পর্শে শেষ পর্যন্ত জীবন সম্বন্ধেও এক পরম আশ্বাস :

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক্ অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের 'পরে ॥

এই গীতরসসিক্ত কাব্যত্রয় সম্পর্কে শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন :

'গীতাঞ্জলী', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি' : অরূপানুভূতি

"রবীন্দ্রনাথের গানগুলি সহজ, সরল, অলংকাররিক্ত কথায় তাঁহার অন্তরের ভক্তি ও ভগবৎপ্রেমের আকৃতিকে অভিব্যক্তি দিয়াছে। এই ভগবদ্‌ভক্তিমূলক গানগুলিতে কবির মনে উপনিষদের চেতনা ও আধুনিক মনের প্রকৃতি-প্রীতির ও ভাববৈচিত্র্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে।"

'বলাকা' (১৯১৬), 'পলাতকা' (১৩২৫), 'শিশু ভোলানাথ' (১৩২৯), 'পূরবী' (১৯২৫), 'মহুয়া' (১৯২৯), 'বনবাণী' (১৯৩১) পঞ্চম পর্বের কাব্য। রবীন্দ্র-

পঞ্চম পর্ব : গতির যুগ : 'বলাকা'

কাব্যপ্রবাহে 'বলাকা' আশ্চর্য দিক-পরিবর্তনের কাব্য। এই কাব্যে চেতনার গতিশীলতার সঙ্গে মননশীলতার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। পূর্ববর্তী পর্বে কবি আধ্যাত্মিকতার স্থির শান্ত গতিবিহীন আনন্দক্ষেত্রে আশ্রয় খুঁজিয়াছেন। এই পর্বে সেই স্তব্ধতার অচঞ্চল ক্ষেত্র পার হইয়া গতিময় বিশ্বের সংস্পর্শে আসিয়া মুক্তক ছন্দে মুক্তপক্ষ বলাকার মতো গতির আকাশে অকারণ অবারণ চলার মধ্যে পাখা মেলিয়া দিয়াছেন। তত্ত্বের দিক হইতে কবি, ফরাসী দার্শনিক আবি বার্গসঁ-এর Elan Vital বা ক্রমবিকাশশীল গতিতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। 'বলাকা' কাব্য তাই গতির গান :

শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও,
উদ্দাম উধাও,
ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।

... ...

তব নৃত্য মন্দাকিনী নিত্য ঝরি' ঝরি'
তুলিতেছে শুচি করি'
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।

এই কাব্যের অপর লক্ষণীয় বিষয় উহার ছন্দ। কেহ ইহাকে 'মুক্তক' বলিয়াছেন, কেহ-বা 'অসম', কেহ-বা 'মুক্ত-বন্ধ'। এই ছন্দে চরণগুলি অসমান; প্রত্যেক চরণ দুই পর্বে বিভক্ত এবং পর্বের দৈর্ঘ্য অসমান। ইহা মিত্রাক্ষর ছন্দ। ভাবের বৈচিত্র্য ও আবেগের সঙ্গে চরণ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া থাকে।

'পলাতকা', 'শিশু ভোলানাথ'

বাস্তব জীবনের অসংখ্য চলতি মুহূর্ত 'পলাতকা'র বিষয়বস্তু। ইহাতে স্বরবৃত্ত ছন্দের ভঙ্গিতে মর্ত্যপ্রীতিই কাহিনী-রূপে ও জীবন-রসে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে। 'শিশু ভোলানাথ' শিশু কবিতায় নূতন রূপ হইলেও ইহাতে 'বলাকা'র গতির কথাই নব রূপ ধারণ করিয়াছে। শিশু নিয়তই পুরাতনকে ভুলে, নূতনেই তাহার আনন্দ, নূতনত্বই তাহার নিত্যসঙ্গী। এই পরিবর্তনশীলতা গতিরই নামান্তর।

'পূরবী' অরূপ হইতে রূপে প্রত্যাবর্তন

'পূরবী' কবির প্রৌঢ় ঋতুর ফসল। কবি এখানে পিছন ফিরিয়া পৃথিবীর সবকিছুকে মমতার সঙ্গে দেখিয়াছেন। তাই এই কাব্যের বহু কবিতায় একটা বিষাদকরুণ অনুভূতির রেশ বিজড়িত। পৃথিবীর প্রাণের খেলায় আনন্দের উৎসবে আর বেশীদিন যোগ দিতে পারিবেন না, এই ভাবনা কবিহৃদয়কে এক অব্যক্ত বেদনায় ভরিয়া তুলিয়াছে:

দেখো না কি, হায়, বেলা চলে যায়,
সারা হয়ে এল দিন।

বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীণ।

আবার অন্যদিকে কৈশোর ও যৌবনের আনন্দময় দিনগুলিকে ফিরিয়া পাওয়ার উল্লাস যেন শরতের মেঘ ও রৌদ্রের মতো পাশাপাশি জড়িত রহিয়াছে :

এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্না-হাসির গঙ্গা-যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।

মহুয়া যৌবনের ও প্রেমের কাব্য। এই কাব্যে প্রেমকে তিনি আরাম ও তুচ্ছতা হইতে কৃচ্ছ্রসাধনার পথে দুরূহ কর্তব্য-ব্রতে উজ্জীবিত করিয়াছেন। নারীর বাণীতে দান করিয়াছেন নূতন তেজ :

যাব না বাসর-কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।

মহুয়া : প্রেমের নবায়ন

'মহুয়ার নারী মানসীসৌন্দর্যপ্রতিমা বা মানসসুন্দরী নহে, এ কাব্যের নায়িকা যেন মাটির ঘরে স্বর্গের দীপশিখা। মহুয়ার পূর্ববর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথ যে-প্রেমের কথা বলিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে কল্পনার স্পর্শ ছিল, ধ্যানের ধনের প্রতি আকর্ষণ ছিল। কিন্তু মহুয়ার প্রেম সত্য পরিচয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, মধুর কল্পনাবিলাসের সহিত এই কাব্যের প্রেমের কোনো সম্পর্ক নাই।' প্রেম সম্বন্ধে পরিবর্তনশীল রবীন্দ্র-মানসের আধুনিকতা এইভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে।

শিল্পসৃষ্টির দিক হইতে 'বনবাণী' নূতন কিছু নহে। এই কাব্যে অরণ্যজাত তরুলতার সহিত কবি একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন। 'বনবাণী'র সঙ্গেই কবির কাব্যজীবনের পূর্বপর্বের সমাপ্তি ঘটিল। পরবর্তী কাব্যে রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহ এমন একটি বাঁক ঘুরিয়াছে যাহা আমাদের নিকট অপ্রত্যাশিত।

'বনবাণী'

উহাই রবীন্দ্রকাব্যের উত্তরপর্ব বা অন্ত্যপর্ব। কিন্তু এ পর্যন্ত আমরা যে পাঁচটি পর্ব পার হইয়া আসিলাম তাহাতে দেখিয়াছি, রবীন্দ্র-কবিমানসের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হইল উহার চলমানতা। তাঁহার সুদীর্ঘ কবিজীবনে রবীন্দ্রনাথ কোথাও থামিয়া থাকেন নাই, রচনার বিষয়বস্তুকে কোথাও গণ্ডিবদ্ধ করেন নাই। চলিতে চলিতে উহা বহুবার বাঁক ফিরিয়াছে। তাঁহার অজস্র রচনাসম্ভারের মধ্যে এই জীবনধর্মী দিক-পরিবর্তনের ইতিহাস সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশিত। সৌন্দর্যতৃষ্ণা আসিয়া প্রকৃতিপ্রেমে মিশিয়াছে,

প্রকৃতিপ্রেম মুখ ফিরাইয়াছে মানবপ্রীতির দিকে, মানবপ্রীতি ব্যাপ্ত হইয়াছে বিশ্ব-প্রেমে, সেই প্রেম উর্ধ্বায়িত হইয়াছে অধ্যাত্মলোকে, আবার নামিয়া আসিয়াছে শিশুতীর্থে, সেখান হইতে প্রবেশ করিয়াছে গতির জীবনে। শুধু বিষয়বস্তুতে এবং ভাবেই নয়, ছন্দরচনাতেও রহিয়াছে এই দিক-পরিবর্তনের স্বাক্ষর। অক্ষরবৃত্ত হইতে মাত্রাবৃত্ত, তারপর স্বরবৃত্ত, তারপর মুক্তক (অন্ত্যপর্বে ইহার পরেও আছে গদ্যচ্ছন্দ)! পর্বে পর্বে এই নববিকাশই রবীন্দ্রকাব্যের অপরিসীম বিস্ময়।

কাব্যের ভাবে ও রূপে চলমানতা

২। 'পরিশেষ' হইতে রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যপর্বের কাব্যের পরিচয় দাও।

উত্তর। রবীন্দ্রনাথের অন্ত্যপর্বের কাব্য হইল—'পরিশেষ' (ভাদ্র—১৩৩৯), 'পুনশ্চ' (আশ্বিন—১৩৩৯), 'বিচিত্রিতা' (১৩৪০), 'শেষ সপ্তক' (১৩৪২), 'বীথিকা' (১৩৪২), 'পত্রপুট' (১৩৪৩), 'শ্যামলী' (১৩৪৩), 'খাপছাড়া' (১৩৪৩), 'ছড়ার ছবি' (১৩৪৪), 'প্রান্তিক' (১৩৪৪), 'সেঁজুতি' (১৩৪৫), 'প্রহাসিনী' (১৩৪৫), 'আকাশ-প্রদীপ' (১৩৪৬), 'নবজাতক' (১৩৪৭), 'সানাই' (১৩৪৭), 'রোগশয্যায়' (১৩৪৭), 'আরোগ্য' (১৩৪৭), 'জন্মদিনে' (১৩৪৮) এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'শেষ লেখা' (১৩৪৮)। ভাবের দিক হইতে ইহারা সকলেই সমগোত্রের নহে, তাই আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা সকল কয়টিকে তিনটি ভাগে ভাগ করিয়া লইব। প্রথম ভাগে থাকিবে—'পরিশেষ' হইতে 'শ্যামলী' পর্যন্ত কাব্যগুলি; দ্বিতীয় ভাগে 'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি' ও 'প্রহাসিনী', এবং তৃতীয় ভাগে দ্বিতীয় ভাগোক্ত তিনটি কাব্যগ্রন্থ ভিন্ন 'প্রান্তিক' হইতে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত কাব্যসমূহ।

'খেয়া' যেমন রূপ হইতে অরূপে উত্তরণের মধ্যবর্তী কাব্য, 'পরিশেষ'ও তেমনি আদিপর্ব হইতে একেবারে অন্ত্যপর্বে প্রবেশের মধ্যবর্তী রচনা। অন্ত্যপর্বের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট হইল, কাব্যে গদ্যচ্ছন্দের প্রবর্তন। শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই গদ্য-ছন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "কবি তাঁহার এই পর্বের কাব্যগুলির মাধ্যমে পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন যে, কবিতার সৌন্দর্যবর্ধন কোনো উপায়-প্রয়োগ-ব্যতিরেকেই, সংগীতঝংকারে কানের ও কল্পনা-সৌন্দর্যে মনের কোনো মোহাবেশ সৃষ্টি না করিয়াই, শুধু অনুভূতির সূক্ষ্মতায় ও ব্যাকুলতায়ই কাব্যের নিগূঢ় আবেদন পাঠকচিত্তে সংক্রামিত করা যায় কি না। অর্থাৎ কবিতার আবেদনের মধ্যে উহার শিল্পরূপের ও ভাবরূপের পারস্পরিক

গুরুত্ব কতখানি, তাহা নির্ণয় করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কোনো একটি বিষয়ের প্রথম কাব্যানুভূতি ও ইহার পরিণত, সুষ্ঠু-আঙ্গিকবিন্যস্ত রূপশিল্পের মধ্যে কোনো ব্যবধান আছে কি না, ও থাকিলে, কি বিভিন্ন ক্রিয়ার দ্বারা তাহা পূর্ণ করা যায়, কবিকৃতির এই নিগূঢ়-রহস্যোদ্‌ভেদ-প্রয়াসই এই সমস্ত কবিতায় করা হইয়াছে।"

'পরিশেষ': গদ্যচ্ছন্দের সৃষ্টি

এই পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ কতখানি উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা 'পরিশেষ'-এর 'বাঁশি' কবিতার (কবিতাটি পরে 'পুনশ্চ' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে) কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলেই বুঝা যাইবে:

হঠাৎ সন্ধ্যায়
সিন্ধু বারোয়াঁয় লাগে তান,
সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদি কালের বিরহ বেদনা।...
এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলি লগ্নে
সেইখানে
বহি' চলে ধলেশ্বরী,
তীরে তমালের ঘন ছায়া,
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা ক'রে, তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর॥

'পরিশেষ'-এ যদিও কবি সর্বপ্রথম গদ্যছন্দের কবিতার প্রবর্তন করেন, তথাপি এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই সমিল ছন্দের। অধিকাংশ কবিতাই বিবাহ, নামকরণ প্রভৃতি নানা উপলক্ষে রচিত। আবার ইহার মধ্যে এমন কতকগুলি কবিতাও আছে যাহাতে মৃত্যু অপেক্ষা জীবনই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। রুদ্রের প্রবলতম আঘাত যে-মৃত্যু তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃত্যুঞ্জয় কবি সেই দুর্জয় নির্দয়কে বলিয়াছেন—

যত বড় হও
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড় নও।
আমি মৃত্যুর চেয়ে বড়—এই শেষ কথা ব'লে
যাব আমি চলে।

'পুনশ্চ' কাব্যে প্রধানতঃ গদ্যছন্দে কতকগুলি গল্পের আভাস দেওয়া হইয়াছে। 'ক্যামেলিয়া', 'ছেলেটা', 'সাধারণ মেয়ে', 'শেষ চিঠি' প্রভৃতি কবিতা এই গোত্রের। 'খোয়াই', 'পুকুরধারে' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে প্রকৃতির এক-একটি বিশেষ রূপ ধরিবার প্রয়াস রহিয়াছে। যেমন, 'পুকুরধারে' কবিতায়:

বেলা পড়ে এল।
বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশ
বিকেলের প্রৌঢ় আলোয় বৈরাগ্যের ম্লানতা।
ধীরে ধীরে হাওয়া দিয়েছে,
টলমল করছে পুকুরের জল,
ঝিলমিল করছে বাতাবী-লেবুর পাতা।

'পুনশ্চ', বিচিত্রিতা', 'শেষ সপ্তক', 'বীথিকা'

'বিচিত্রিতা'র অধিকাংশ কবিতা নিজের এবং অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতি বিখ্যাত বাঙালী চিত্রকরদের আঁকা ছবিকে উপলক্ষ্য করিয়া লেখা। কবিতাগুলি সমিল ছন্দের। 'শেষ সপ্তক' 'পুনশ্চ'-এর ধারাতেই লিখিত। 'বীথিকা'য় কবি আবার ফিরিয়া আসিলেন সমিল ছন্দের জগতে। এই কাব্যে শব্দযোজনায় ছন্দঝংকারে চিত্রকল্পরচনায় যৌবনের রবীন্দ্রনাথ যেন ফিরিয়া আসিয়াছেন বলিয়া মনে হয়:

গৌরবরণ তোমার চরণমূলে
ফলসাবরণ শাড়িটি ঘেরিবে ভালো—
বসনপ্রান্তে সীমন্তে রেখো তুলে,
কপোলপ্রান্তে সরু পাড় ঘন কালো।
একগুছি চুল বায়ু-উচ্ছ্বাসে-কাঁপা
ললাটের ধারে থাকে যেন অশাসনে,
ডাহিন অলকে একটি দোলনচাঁপা
দুলিয়া উঠুক গ্রীবাভঙ্গীর সনে।

'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী' দুইটিই গদ্যছন্দের কাব্য; 'পত্রপুট'-এর 'পৃথিবী' কবিতায় কবি তাঁহার কাব্যমালিকার জন্য 'মাটির ফোঁটার একটি তিলক' প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন—

হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
'পত্রপুট', 'শ্যামলী'
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।

'শ্যামলী'তে কবির সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে ভাবুক দার্শনিকের পরিণত বয়সের প্রজ্ঞা। কবির দার্শনিক চিন্তা এখানে 'ego'-মূলক :

আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পূবে, পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর—
সুন্দর হল সে।

সমকালীন ইতিহাস-চেতনার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর কবির 'আফ্রিকা' কবিতা। কবিতাটি দ্বিতীয় সংস্করণ 'পত্রপুট'-এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু রচনাকালের দিক হইতে (২৮ মাঘ, ১৩৪৩) ইহা 'শ্যামলীর অন্তর্ভুক্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। এই কবিতায় সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন বীভৎস রূপ বলিষ্ঠ রেখায় অঙ্কিত :

এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ-ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।

'খাপছাড়া', 'ছড়ার ছবি', 'প্রহাসিনী' "লঘুধরনের হাস্যপরিহাসযুক্ত কাব্যগ্রন্থ।" ইহাদের সুরের সঙ্গে 'পুনশ্চ'-বর্গের বা 'প্রান্তিক'-বর্গের কাব্যগ্রন্থের মিল নাই।

'প্রান্তিক' হইতে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত কাব্যগুলিতে রবি-প্রতিভা তাহার

রশ্মিসংহরণের পূর্বে যেন অপরূপ দ্যুতিতে বিচ্ছুরিত হইয়াছে। 'প্রান্তিক'-এ রহিয়াছে 'অবসন্ন চেতনায় গোধূলিবেলায়' অস্তায়মান রবির ম্লান বিধুর রক্তরাগ। মৃত্যুর পটভূমিকায় একদিকে যেমন জীবনের প্রতি আসক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি পরম জ্যোতির্ময়ের অনুভূতিতে অধ্যাত্ম আকৃতিও উৎসারিত হইয়াছে :

'প্রান্তিক'

হে পূষন্, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

'সেঁজুতি' কাব্যে মাটির সাধারণ মানুষের প্রতি নিবিড় আকর্ষণের দ্বিধাহীন প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় :

'সেঁজুতি'

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক,
আর কিছু নয়—
এই হোক শেষ পরিচয়।

ইহার সঙ্গে মানুষের হিংস্র হানাহানির প্রতি ধিক্কার এবং মানবতার জয়ের প্রতি গভীর প্রত্যয়ও ধ্বনিত হইয়াছে :

বলে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।

'আকাশ-প্রদীপ', 'নবজাতক' ও 'সানাই' এই তিনটি কাব্যে প্রধানত রহিয়াছে অতীত দিনের স্মৃতিচারণার সঙ্গে দার্শনিক চিন্তার মিশ্রণ। কিন্তু 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' ও 'শেষ লেখা' রবীন্দ্রনাথের অভিনব সৃষ্টি। অভিনব বলিলাম এইজন্য যে, এই কয়টি কাব্যগ্রন্থ—বিশেষত মধ্যবর্তী দুইটি গ্রন্থে—বিষয়বস্তুর দিক হইতে একটি বিশিষ্ট পরিবর্তন কাহারও দৃষ্টি এড়াইতে পারে না। উহা হইল বাস্তব সমাজসচেতনতা। 'জন্ম-রোমান্টিক' কবি যে-রূঢ় বাস্তবকে তাঁহার কাব্যলোকে ইতিপূর্বে বহুবার এড়াইয়া গিয়াছেন, জীবনের শেষপ্রান্তে আসিয়া সেই রূঢ় বাস্তবের প্রতিই তিনি দৃষ্টি ফিরাইয়াছেন। যাহারা নিতান্তই সাধারণ লোক, যাহাদের বেদনাবিমথিত জীবন হইতে কবি এতকাল মুখ ফিরাইয়া ছিলেন, জীবনপ্রান্তিক কাব্যে

'আকাশ-প্রদীপ', 'নবজাতক', 'সানাই', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে', 'শেষ লেখা'

কবি তাহাদেরই জয়গান করিয়াছেন। এতদিনকার উপেক্ষিত মানুষের কথাই কবির চেতনায় বারবার জাগিয়া উঠে :

পথে-চলা এই দেখাশোনা
ছিল যাহা ক্ষণচর
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে,
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে ;
এই সব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা
দূরের ঘণ্টার রব এনে দেয় মনে। (আরোগ্য)

সভ্যতার যাহারা 'পিলসুজ', 'মাথায় প্রদীপ নিয়ে যারা খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে —উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়ায়', সেই সব মানুষের কথাতেই কবি আজ মুখর :

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
... ...
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে। (আরোগ্য)

অথবা—

চাষি ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি ব'সে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূরপ্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
(জন্মদিনে)

আবার ইহাও সত্য যে, সেই সঙ্গে মৃত্যুর স্বরূপ সম্বন্ধে ঔপনিষদিক তত্ত্বকেও কবি চেতনার গভীরে অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু সর্বশেষ মূল্যায়নে বলিতে হয়, রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীরই কবি, পৃথিবীর সব কিছু তাঁহার কাছে মধুময়, ব্রহ্মাণ্ড

তাঁহার দৃষ্টিতে ধরণীর ধূলিতে আনন্দরূপে মূর্ত। এই বোধ, এই চেতনাই তাঁহার কাব্য সম্পর্কে শেষ কথা। সে-কথা তিনি অপরূপ ভাষায় বলিয়াছেন :

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি—
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি,
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
... ...
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর
বলে যাব, তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে ;
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি,
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি। (আরোগ্য)

৩। রবীন্দ্র-নাটকের বৈশিষ্ট্যপ্রসঙ্গে তাহার প্রথমযুগ নাটকাবলীর আলোচনা কর।

উত্তর। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকবি। গীতিকবির শিল্পীমানসে থাকে Subjectivity বা মন্ময়তার প্রাধান্য। কিন্তু নাটকে Objectivity বা তন্ময়তা বা বস্তুনিষ্ঠারই প্রাধান্য, মানস-অনুরঞ্জনের স্থান সেখানে নাই। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ যে-সকল নাটক রচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যে কাব্যধর্মই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। গীতিনাটক ভাবের লীলাসংগীত বলিয়া রবীন্দ্র-নাটকও ভাবেরই লীলাসংগীত। রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যে তাই দৃশ্যত্বলক্ষণ অপেক্ষা কাব্যলক্ষণই অধিকতর পরিস্ফুট। বলিতে গেলে, তাঁহার নাটকগুলি কবিমনেরই গীতিস্বরভিত্ত প্রকাশ। এইজন্য রবীন্দ্রনাথের নাটকে—এমন কি, প্রচলিত নাট্যরীতির অনুসরণে রচিত নাটকেও—ঘটনা বা চরিত্রের সংঘাত বা দ্বন্দ্ব বড় একটা দেখা যায় না—দেখা যায় কোনো বিশেষ তত্ত্বের বা আইডিয়ার প্রকাশ। রবীন্দ্র-নাটকের ইহাই বৈশিষ্ট্য। ডঃ টমসনও রবীন্দ্র-নাটক সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া বলিয়াছেন : "His dramatic work is the vehicle

রবীন্দ্র-নাটকের বৈশিষ্ট্য

of ideas rather than the expression of action." শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলিয়াছেন, "তাঁহার মন্ময়তা এত প্রবল যে, তিনি নাটক লিখিতে গিয়াও আত্মকেন্দ্রিকতার কক্ষাবর্তন হইতে বিরত থাকিতে পারেন নাই—তাঁহার নরনারী এক-একটি মূর্ত ভাববিগ্রহ, কবির বিদেহী চেতনার এক-একটি অর্ধ-পরিস্ফুট মানবিক প্রতীকে পর্যবসিত।" রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তাঁহার নাটক সম্বন্ধে 'ফাল্গুনী'র 'কবি'রূপে তিনি বলিয়াছেন, "চিত্রপটে প্রয়োজন নেই—আমার দরকার চিত্তপট—সেখানে শুধু সুরের তুলি বুলিয়ে ছবি জাগাব।" কিংবা অন্যত্র—"এই সকল নাটক বাঁশির মতো, বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।" এই কারণেই তিনি নাটকের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে অস্বীকার করিয়া স্বীয় শিল্পিমানসের অনুকূল নাট্যনির্মাণে ব্রতী হইয়াছিলেন। রবীন্দ্র-নাটকের বিপক্ষে বলিতে হয়, সাহিত্যের প্রত্যেকটি বিষয়ের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে, চরিত্র আছে, রূপ-রীতি আছে। এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হইতেই আমরা নাটককে কবিতা হইতে কিংবা ছোটগল্পকে উপন্যাস হইতে পৃথক করিতে পারি। কবিতা বা নাটকের রূপ যুগে যুগে পরিবর্তিত হইলেও উহার রূপসামান্যের বা চরিত্র-লক্ষণের কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। রবীন্দ্রনাথ সেই চরিত্রকেই অস্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং রবীন্দ্র-নাটককে 'নাটক' বলিয়া স্বীকার না করিবার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে। আবার, রবীন্দ্র-নাটকের সপক্ষে বলা চলে, স্বীয় শিল্পিমানসের প্রবণতা অনুযায়ী তিনি যে-সকল মঞ্চ-নিরপেক্ষ দুঃসাহসিক নাট্যনির্মাণে ব্রতী হইয়াছিলেন উহা সর্বাংশে সফল না হইলেও তাঁহার রূপক নাটকগুলি সার্থক রচনা হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ, রূপক-নাটক আধুনিক যুগের সৃষ্টি; ইহাতে যে-ইঙ্গিতময়তা বা সাংকেতিকতা থাকে তাহার পরিস্ফুটনে কাব্যই সহায়ক। এইরূপ নাটকে রক্তমাংসের মানুষ নয়, উহাদের আকারে ভাববিগ্রহই সৃষ্টি করা হয়। উহারা হয় তো 'নাটক' নয়, তবে 'রূপক-নাটক',—'নাটক' হইতে বিলক্ষণ সাহিত্য-শাখার একটি পৃথক শাখা। দৃশ্য ও চরিত্রের সংলাপধর্মিতা আছে বলিয়াই 'নাটক' শব্দটি ব্যবহৃত হইতে পারে, নহিলে কেবল 'রূপক' বলিলেও চলে। 'মেটারলিংক', 'ইয়েটস্', 'স্ট্রীণ্ডবার্গ', 'ও'নীল' প্রভৃতির রূপক-নাটক

যদি স্বীকৃত হইতে পারে, তবে রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাটকগুলিরই-বা স্বীকৃত হইতে বাধা কোথায়? অতএব ইহাই মানিয়া লওয়া ভালো যে, রবীন্দ্র-নাটক রবীন্দ্র-নাটকই, ইহাদের অন্য তুলনা নাই।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রথানুগ নাটক যেখানে রচনা করিয়াছেন সেখানে নিয়মানুগ নাট্যরীতি অনুসারেই তাহার বিচার বিধেয়। রবীন্দ্রনাথের এইরূপ নাটক হইল—'রাজা ও রানী' (১৮৮৯), 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'মালিনী' (১৮৯৬), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯), 'গৃহপ্রবেশ' (১৯২৫), 'শোধবোধ' (১৯২৬), 'তপতী' (১৯২৯)। 'রাজা ও রানী'ই রবীন্দ্রনাথের প্রথম পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাটকটি শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্র্যাজিডির আদর্শে রচিত হইলেও উহা শেষ পর্যন্ত নাটকীয় দ্বন্দ্বহীনতায় ও অতি-নাটকীয়তায় মেলোড্রামতে পর্যবসতি হইয়াছে। জলন্ধররাজ রাজা বিক্রমদেব ও তাঁহার রানী সুমিত্রার দাম্পত্যপ্রেমের আধারে নাট্যকাহিনী গঠিত। রাজকর্তব্যবিমুখ বিক্রমদেবের উদগ্র কামনার ক্ষুধা হইতে আপনাকে ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করিবার প্রয়াসে রাজার নিকট হইতে রানীর পিত্রালয়ে গমন, ইহারই সুযোগে বিদেশী রাজকর্মচারীদের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, প্রতিহতকাম বিক্রমদেবের ক্ষিপ্ত জিঘাংসা, এবং পরিণতিতে নানা সংঘাতের ভিতর দিয়া সুমিত্রার আত্মবলি—ইহাই নাট্যকাহিনীর মূল কথা। ইহার সঙ্গে পার্শ্বকাহিনীরূপে যুক্ত হইয়াছে কুমারসেন ও ইলার প্রেমকাহিনী। কিন্তু পার্শ্বকাহিনীটি নাটকের শেষ অংশে অসংগত প্রাধান্য লাভ করায় নাট্যের বিষয়টি ভারগ্রস্ত ও দ্বিধা-বিভক্ত হইয়াছে। রাজা ও রানীর মধ্যে কিছুটা দ্বন্দ্ব সৃষ্টির প্রয়াস থাকা সত্ত্বেও দুইটি চরিত্রই দুইটি ভাবের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে—বিক্রমদেব অন্ধ আবেগের, আর সুমিত্রা নিঃস্বার্থ ত্যাগের। নাটকটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই একবার বলিয়াছিলেন—"ওটা আবার নাটক নাকি! একটা মেলো-ড্রামা, কাটা-মুণ্ডু নিয়ে বাড়াবাড়ি কাণ্ড!" এই ত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বলিয়াই পরবর্তীকালে তিনি ইহাকে মার্জিত করিয়া 'তপতী'তে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। কুমারসনের মৃত্যু আখ্যানধারার অনিবার্য পরিণাম নহে বলিয়া 'তপতী' হইতে কুমার ও ইলার অংশ বাদ দিয়াছিলেন; তাবাও

প্রথানুগ নাটকাবলী

'রাজা ও রানী': 'তপতী'

পদ্যছন্দ হইতে গদ্যে রূপান্তরিত হইয়াছিল, তথাপি ভারসাম্য রক্ষিত হয় নাই। অধিকন্তু 'তপতী' কিছুটা রূপকলক্ষণাক্রান্ত তাত্ত্বিক নাটক হইয়া উঠিয়াছে।

'বিসর্জন'

'বিসর্জন'-ও আঙ্গিকের দিক হইতে পঞ্চাঙ্ক নাটক। ইহা রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাসের কিয়দংশের নাট্যরূপ। এই নাটকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া কবি নিজেই বলিয়াছেন, "এই নাটকে বরাবর দুটি ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে—প্রেম আর প্রতাপ। রঘুপতির প্রভুত্বের ইচ্ছার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের শক্তির দ্বন্দ্ব বেধেছিল।......নাটকের শেষে রঘুপতিকে হার মানতে হয়েছিল—তার চৈতন্য হলো, বোঝবার বাধা দূর, হলো প্রেম জয়যুক্ত হলো।" আমরা 'প্রতাপ'-এর সঙ্গে 'প্রথা' কথাটিকেও যুক্ত করিতে চাই। 'বিসর্জন' নামটি খুবই ইঙ্গিতপুর্ণ। ইহার বহিরঙ্গে প্রতিমা-বিসর্জন, অন্তরঙ্গে জয়সিংহের মহত্তর প্রাণবিসর্জন। এই নাটকেও রঘুপতি প্রথার প্রতীক, আর অপর্ণা প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ। 'রাজা ও রানী'র অন্যতম প্রধান ত্রুটি ছিল তাহার অতি-কাব্যিকতা। কিন্তু বিসর্জনে 'লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি' থাকিলেও তাহা কখনও অতিকথন হইয়া নাট্যগতিকে শ্লথ করে নাই। 'বিসর্জন'-এর ঘটনাবিন্যাসের মধ্যে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাটকের পক্ষে সম্পূর্ণ অভূতপুর্ব একটি সংহতি দেখা যায়। ভাবকল্পনা বা চরিত্রাবেগের দিক হইতে লক্ষ্য করিলেও দেখা যায়, 'রাজা ও রানী'র তুলনায় 'বিসর্জন' উন্নততর সৃষ্টি।

'মালিনী'

'মালিনী' নাটকে ধর্মীয় প্রথা বা সংস্কারের সহিত হৃদয়ধর্ম বা মানবিক ধর্মের দ্বন্দ্ব দেখানো হইয়াছে। রাজকন্যা মালিনীর ধর্ম শাস্ত্রবর্ণিত কোনো বিশুষ্ক নিশ্চল আচার মাত্র নহে, আপন অন্তরের করুণাই তাহাকে নবধর্ম প্রবর্তিকা দেবীরূপে মানবলোকের দিকে অগ্রসর করিয়া নিয়াছে। মালিনীর এই নবধর্মের শত্রু বিপ্র ক্ষেমংকর, কিন্তু ক্ষেমংকরের আবাল্য সুহৃদ সুপ্রিয় মালিনীর ধর্মমতে বিশ্বাসী। অবশেষে সুপ্রিয়ের করুণ মৃত্যুর মধ্য দিয়া মালিনীর করুণাধর্মের চরম পরীক্ষা ও তাহার জয় হইয়াছে। 'ভাবের দিক হইতে "মালিনী" 'বিসর্জন'-এরই সমধর্মী এবং বেদনার মধ্য দিয়া সত্যোপলব্ধির বিষয়ে পুর্ববর্তী ও পরবর্তী অন্যান্য নাটকের অনুরূপ।' 'মালিনী'র কাহিনী ও গঠনে গ্রীক নাটকের সংহতি দেখা যায়।

'প্রায়শ্চিত্ত' রবীন্দ্রনাথেরই 'বৌঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসের নাট্যকৃত রূপ। ইহাতেও কোনো চরিত্রের ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করিয়া নাটকের ঘটনাস্রোত প্রবাহিত হয় নাই, একটা মহৎ আদর্শের জন্য দুঃখভোগের প্রায়শ্চিত্তই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। রাজা শক্তিমদে মত্ত হইয়া পাপ করে, আর একজন দুঃখভোগ দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করে। উদয়াদিত্য ও ধনঞ্জয় দরিদ্র মূক নির্যাতিত প্রজাদের হইয়া সেই দুঃখভোগ করিয়াছেন। আবার অন্যদিকে বিভাও স্বামীর নীচতারূপ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন জীবনের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থলকে ত্যাগ করিয়া এবং সর্বসুখকে জলাঞ্জলি দিয়া। চরিত্রসৃষ্টির অভাবে এবং তত্ত্বপ্রাধান্যে ইহার নাটকীয় রস অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই নাটকটিই পরবর্তীকালে 'পরিত্রাণ' নামে রূপান্তরিত হয়। 'পরিত্রাণ'-এ তত্ত্বই প্রধান হওয়ায় 'প্রায়শ্চিত্ত' অপেক্ষা ইহার নাটকীয় গতি অধিকতর ব্যাহত হইয়াছে।

'প্রায়শ্চিত্ত' : 'পরিত্রাণ'

'গৃহপ্রবেশ' ও 'শোধবোধ' পারিবারিক নাটক। 'গৃহপ্রবেশ' রবীন্দ্রনাথেরই 'শেষের রাত্রি' নামক একটি ছোট গল্পের নাট্যরূপ। ভাবপ্রবণ ও কল্পনা-বিলাসী যতীন তাহার যথাসর্বস্বের বিনিময়ে গৃহ নির্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু গৃহপ্রবেশের পূর্বেই সে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়। স্বামীর অসুখ সত্ত্বেও স্ত্রী মণি পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিল। যতীনের মাসী ও ভগিনী হিমি এই সংবাদ সযত্নে গোপন রাখিয়াছিল। কিন্তু যেদিন সে এই সংবাদ জানিতে পারিল, সেদিনই মণি আসিয়া তাহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল, কিন্তু যে-স্ত্রীর মন সে এতদিন পায় নাই সেই স্ত্রীর এই আত্মসমর্পণের কথা যতীন আর জানিতে পারিল না। কারণ তখন সে ওপারের যাত্রী। এই নাটকেও অন্তর-গৃহপ্রবেশকে বাহিরের গৃহপ্রবেশের সাংকেতিকতায় পরিস্ফুট করা হইয়াছে। নাটকটি পেশাদারী মঞ্চে অভিনীত হইলেও জনসমাদর লাভ করে নাই। কিন্তু 'কর্মফল' গল্পের নাট্যরূপ 'শোধবোধ' নিতান্তই গতানুগতিক প্রথায় লিখিত বলিয়া পেশাদারী মঞ্চে উহার অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। প্রথানুগ রীতিতে লিখিত এই একটি মাত্র নাটকেই (রঙ্গনাট্য 'চিরকুমার সভা' ও 'শেষরক্ষা' বাদে) রবীন্দ্রসুলভ কাব্যধর্মিতা বা সাংকেতিকতা নাই।

'গৃহপ্রবেশ' ও শোধবোধ

প্রশ্ন ৪। রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা কর।

উত্তর। বিজাতীয় দুইটি বস্তুর মধ্যে অভেদ-কল্পনার মাধ্যমেই রূপক-নাটকের সৃষ্টি। এইরূপ নাটকে বিষয়ের প্রাধান্য থাকে না, প্রাধান্য থাকে বিষয়াতীতের। ইহাতে দৃশ্যত একটি আখ্যানভাগ থাকে বটে; কিন্তু উহার অন্তরালে আরও একটি নিগূঢ়ার্থ আখ্যান নিহিত থাকে। 'দুইটি কাহিনী সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়। একটি কাহিনী যাহা বর্ণনা করে বা দেখায়, তাহার অন্তরালবর্তী আখ্যানটি রূপকের আসল অর্থ। রূপকে একটি বিশিষ্ট ভাবজগৎ প্রত্যক্ষবৎ চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে।'

রূপক-সাংকেতিক নাটক

রূপক হইতে সংকেত বিলক্ষণ। "সাংকেতিক সাহিত্যে শুধু অপরূপ-রহস্যকেই আরও রহস্যময় করিয়া তোলা হয়; সৃষ্টির চরম তত্ত্ব ও চূড়ান্ত রূপ-কে রূপকের সীমাবদ্ধ সংস্কারের মধ্য দিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই সংকেত, আভাস, ইঙ্গিতের সাহায্যে শুধু রহস্যই ঘনীভূত হইয়া উঠে।" সংকেত-নাটক সম্বন্ধে আর-একটি বক্তব্য এই যে, উহাতে দুর্জ্ঞেয় রহস্য রহস্যই থাকিয়া যায়, উহার অবসান আর ঘটে না। এইরূপ রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলিই রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর বহন করিতেছে। তাঁহার এই শ্রেণীর নাটকগুলি প্রধানত রূপক হইলেও উহাদের সঙ্গে সাংকেতিকতার প্রচুর মিশ্রণ রহিয়াছে। সংকেত দ্বারা তিনি ভাবকে পরিস্ফুট করিয়াছেন, ইঙ্গিতের সহায়তায় যাহা ইন্দ্রিয়াতীত, যাহা অনাদি, অনন্ত, অপার্থিব, যাহা দৃষ্টির অতীত, সেই অমূর্ত ভাব সম্বন্ধে

ভাবধর্মী নাটকাবলী

কবি আমাদিগের বিস্ময় ও চিত্তচমৎকার উৎপাদন করিয়াছেন। তাই তাঁহার নাটকগুলিকে রূপক-সাংকেতিক নাটকই বলিতে হয়, বিশুদ্ধ রূপক নহে। 'শারদোৎসব' (১৯০৮), 'রাজা' (১৯১০), 'অচলায়তন' (১৯১২), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'ফাল্গুনী' (১৯১৬), 'মুক্তধারা' (১৯২৪), 'রক্তকরবী' (১৯২৬), 'কালের যাত্রা' (১৯৩২), 'তাসের দেশ' (১৯৩৩) প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক।

'শারদোৎসব'-এর ব্যাখ্যায় কবি নিজেই বলিয়াছেন, "বিশেষ বিশেষ ফুলে-ফলে হাওয়ায় আলোকে আকাশে পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ ঋতুর উৎসব

চলিতেছে। সেই উৎসব মানুষ যদি অন্যমনস্ক হইয়া অন্তরের মধ্যে গ্রহণ না করে; তবে সে পার্থিব জীবনের একটি বিশুদ্ধ এবং মহৎ আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়।" অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে যোগের মধ্য দিয়াই সত্যের সাধনায় মানবজীবনের সার্থকতা—ইহাই নাটকটির নিগূঢ়ার্থ। 'শারদোৎসব'-এর উপনন্দ তাই দুঃখের সাধনার মধ্যদিয়াই প্রকৃতির নিকট হইতে লব্ধ অসীম আনন্দরসের ঋণ শোধ করিয়াছে। এই নাটকটিই পরে 'ঋণশোধ' (১৯২২) নামে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

'শারদোৎসব': 'ঋণশোধ'

বৌদ্ধ কুশজাতক-এর একটি কাহিনীর ছায়াবলম্বনে রচিত 'রাজা' নাটকে রূপ ও অরূপের দ্বন্দ্ব অপরূপ ব্যঞ্জনায় আভাসিত। রূপতৃষাতুরা রানী সুদর্শনা রাজাকে চাহিয়াছিলেন রূপের মধ্যেই ভোগ করিতে। তাই মেকী রাজা সুবর্ণের বাহ্য রূপ তাঁহার চোখ ধাঁধাইয়া দিয়াছিল, তিনি সেই রাজাকেই মালা দিয়াছিলেন। এই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাকে করিতে হইল। দুঃখের দাহনে পুড়িয়া যখন তিনি শুদ্ধ হইলেন, যখন তাঁহার মোহ অপসৃত হইল, তখনই আসল রাজার সঙ্গে তাঁহার মিলন হইল, তাঁহার কালো-রূপে দুই চোখ জুড়াইয়া গেল, পরিপুর্ণ আত্মদানের ভিতর দিয়াই তিনি অরূপরতনকে উপলব্ধি করিলেন। 'মধুর ভাবের সাধনার দৃষ্টিকোণ হইতে মানবাত্মার (সুদর্শনার) সহিত রাজার বা বিশ্বাত্মার সম্পর্ক-পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে এই নাটকটিতে। বিশেষরূপে নয়, নির্বিশেষের মধ্যেই ভগবদনুভূতি লাভ করিতে হইবে—এবং উহা লাভ করিতে হইবে সকল অহংকার ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের সুমহৎ তপস্যা দ্বারা—সুদর্শনার কাহিনীতে উহারই ইঙ্গিত।' ১৯২০ সালে এই নাটকটিকেই 'অভিনয়যোগ্য' ও সংক্ষিপ্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথ আর-একটি নাটক প্রকাশ করেন, উহার নাম 'অরূপ-রতন'।

'রাজা': অরূপরতন'

'জগৎ সচল। এই সচলতার মধ্যে যে বা যাহা অচল হইয়া থাকিতে চায়, তাহাই একদিন অকস্মাৎ গুরুর আগমনে ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হয়, এবং তখন অনড়কে বাধ্য হইয়া নড়িতে হয়।'—ইহাই 'অচলায়তন' নাটকের মূল কথা। এই নাটকে জ্ঞানমার্গী মহাপঞ্চক, কর্মমার্গী শোণপাংশু ও ভক্তিমার্গী দর্ভক-এরূ দল সাধনার একমুখী

'অচলায়তন': 'গুরু'

ধারার প্রাচীনতার মধ্যেই অচলায়তন গড়িয়া তুলে। উহাকে ভাঙিয়া সমন্বয়ের সাধনার ভিতর দিয়াই জীবনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'যে-বোধে আমাদের আত্মা আপনাকে জানে সে-বোধের অভ্যুদয় হয় বিরোধ অতিক্রম ক'রে, আমাদের অভ্যাসের এবং আরামের প্রাচীরকে ভেঙে ফেলে।···অচলায়তনে এই কথাটাই আছে।' ১৯১৮ সালে ইহার একটি অভিনয়যোগ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়, নাম—'গুরু'।

সংকেতের সার্থক ব্যঞ্জনায় 'ডাকঘর' রবীন্দ্রনাথের অনুপম নাট্যসৃষ্টি। মানবাত্মার সহিত বিশ্বাত্মার সম্পর্ককে কেন্দ্র করিয়া নাটকটি রচিত হইলেও ইহাতে অনির্দেশ সুদূরের প্রতি একটি সুতীব্র উৎকণ্ঠা ও পিপাসাও ব্যঞ্জিত হইয়াছে। গৃহবদ্ধ রোগার্ত অমল সেই সুদূরের ডাক শুনিয়াছিল এবং মৃত্যুর ভিতর দিয়া সেই অজানা সুদূরের সহিত একাত্ম হইয়াছিল। সাংকেতিকতার দিক হইতে অমল মানবাত্মারই প্রতীক, এবং রাজা বিশ্বাত্মার। 'ডাকঘর' বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতির, 'চিঠি' সকল সৌন্দর্যরূপ ও আনন্দরূপের এবং 'ডাকহরকরা' ঋতুসৌন্দর্যের প্রতীক। বিশ্বরাজ বিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া মানবাত্মাকে মিলনসংকেত জানাইতেছেন, আর মানবাত্মা অহরহ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। অমলের ঘুম মৃত্যুর প্রতীক হইলেও ইহা নবজীবনলাভের মাধ্যমমাত্র। নাটকে সুধা নাম্নী একটি চরিত্র আছে। সুধা সৌন্দর্যের প্রতীক। নাটকের শেষ দৃশ্যে সুধার হাতের ফুল প্রেমের প্রতীক। "পরমাত্মা ও মানবাত্মার সম্পর্ক-ব্যঞ্জিত নাটকে শেষ মুহূর্তে" অমলকে দিবার জন্য ফুল লইয়া সুধার প্রবেশ ও অনুরোধ জ্ঞাপনের মধ্যে "মানবীয় প্রেমের করুণ সজল স্পর্শ দ্বারা কবি তাঁহার শিল্পসৃষ্টিকে একটি ট্র্যাজিক মাধুর্য দান করিয়াছেন।"

'ডাকঘর'

শীতের ভিতর দিয়া বসন্ত যেমন নূতন করিয়া ফিরিয়া আসে, জরাকে অতিক্রম করিয়া যৌবন যেমন বারেবারে নূতন হইয়া দেখা দেয়, মৃত্যুর ভিতর দিয়াও তেমনি জীবনের জয়গীতি ঝংকৃত হয়,—'ফাল্গুনী' নাটকের ইহাই তত্ত্ব। এই নাটকের 'সর্দার' প্রাণশক্তির প্রতীক, 'চন্দ্রহাস' প্রেমের প্রতীক, এবং অন্ধ বাউল প্রজ্ঞা বা বিশ্বানুভূতির প্রতীক। গুহাদ্বার মৃত্যুর প্রতীক। এইখানেই বসন্ত-উৎসবমগ্ন যুবকদলের সঙ্গে সর্দারের নূতন করিয়া সাক্ষাৎ হয় অর্থাৎ মৃত্যুর ভিতর দিয়াই উন্মোচিত

'ফাল্গুনী'

হয় জীবনরহস্য। 'ফাল্গুনী' নাটকে "নাট্যবস্তুর বিশেষ কিছুই নাই—কবির অনুভূত জীবন-সত্যকে কয়েকটি ভাব-বিগ্রহরূপী মানুষের গান ও সংলাপের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হইয়াছে।"

আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের শক্তিগর্ব ও যন্ত্রশক্তির সংকটের বিরুদ্ধে প্রাণের বিদ্রোহঘোষণায় প্রাণকেই জয়ী করা হইয়াছে 'মুক্ত-ধারা' নাটকে। যন্ত্রশক্তি সহজ জীবনধারার বাধা, উহা রাষ্ট্রীয় পীড়নেরও পরিপোষক। উত্তরকূটের রাজার মধ্যে ছিল সংকীর্ণ জাতীয়তা—যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া বিজিত জাতিকে—শিবতরাইয়ের লোকদের তিনি দমন করিতে চাহিয়াছিলেন। বিরাটাকায় লৌহযন্ত্রের বাঁধ দিয়া ঝরনার মুক্তধারাকে অবরুদ্ধ করিয়া শিবতরাইয়ের লোকদের পিপাসার জল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু রাজকুমার অভিজিৎ প্রাণ দিয়া সেই বাধা অপসৃত করিয়াছিলেন। ইহাতে যন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষের প্রাণশক্তিকেই বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে। অভিজিৎ পীড়িত ও বিদ্রোহী মানবাত্মার প্রতীক।

'মুক্তধারা'

'রক্তকরবী' নাটকে প্রাণ ও প্রেমের সহিত যন্ত্রের দ্বন্দ্ব এবং পরিণামে প্রেমের জয় সূচিত হইয়াছে। মাটির তলার রাজ্য যক্ষপুরীর রাজা অসীম ক্ষমতাধর যন্ত্রসভ্যতার প্রতীক, লোভ আর সঞ্চয়েই তাঁহার আনন্দ। তিনি সেখানে দুশ্ছেদ্য জালের আড়ালে আবৃত, বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের পথ তাঁহার রুদ্ধ। সহজ আনন্দ হইতে বঞ্চিত সেখানকার মানুষেরাও কেবল সোনা তুলিবার যন্ত্রস্বরূপ। সেই প্রাণহীন গানহীন আনন্দহীন রাজ্যে অফুরন্ত প্রাণ ও প্রেমের ঐশ্বর্য লইয়া আসিল নন্দিনী। দ্বন্দ্ব বাধিল প্রেমে আর যন্ত্রে। শেষ পর্যন্ত প্রেমই হইল জয়ী, রাজা নিজের লৌহজালকে চূর্ণ করিয়া প্রেমের মধ্যে মুক্তির আনন্দকে উপলব্ধি করিলেন। এই কাহিনীর পশ্চাতে বস্তুসর্বস্ব জড়বাদী সভ্যতার কদর্য রূপের আভাস রহিয়াছে। যন্ত্রসভ্যতা যে মনুষ্যত্বের বিলোপ ঘটায়, কল্যাণের পথ রোধ করে, সেই ইঙ্গিত 'রক্তকরবী'তে ব্যঞ্জিত। নাটকের 'রক্তকরবী' অপরাজেয় প্রাণ ও সৌন্দর্যের প্রতীক। কবির ভাষায়—"ঐ রক্তকরবী ফুলের রক্ত-আভায় একটা ভয়লাগানো রহস্য আছে, শুধু মাধুর্য নয়। ঐ রক্তকরবী সুন্দরের হাতে বিধাতার দান—রক্তের তুলিকা।" রাজা লোভ ও শক্তির তথা ধনিকতন্ত্র ও যান্ত্রিকতার প্রতীক। সর্দার শোষণ ও পীড়নের, অধ্যাপক জড়বাদ ও

'রক্তকরবী'

বস্তুবাদের, বিশু অসীম অপরিতৃপ্তি ও বিরহ-বেদনার, রঞ্জন যৌবনের প্রাণশক্তির, কিশোর সৌন্দর্য-সাধকের, গোসাঁই ও পুরাণবাগীশ সনাতনতার ও অন্ধ সংস্কারের, লৌহজাল অনিয়ন্ত্রিত বাসনার ও যন্ত্রবদ্ধতার, নীলকণ্ঠ পাখীর পালক অনন্তের ইঙ্গিতের এবং ধ্বজা জয়শক্তির প্রতীক।

'রথের রশি', 'তাসের দেশ'

মানবতার অপমানে যে মহাকালের রথ অচল হইয়া পড়ে, এই তত্ত্বই 'কালের যাত্রা'র 'রথের রশি'তে আভাসিত। রবীন্দ্রনাথেরই 'একটি আষাঢ়ে গল্প' নামক একটি ছোটগল্পের নাট্যরূপ 'তাসের দেশ'। নিয়মের নিগড়ে বদ্ধ প্রাণহীন সনাতন দেশে বাহির হইতে যখন প্রাণবান আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন কিভাবে জড়তার রাজ্যে মুক্ত হাওয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, বাঁধা কাজের ভিতর শুরু হয় আনন্দের আয়োজন, তাহাই রূপকের মাধ্যমে নাটকটিতে প্রকাশিত।

৫। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও কাব্যনাট্যের পরিচয় দাও।

উত্তর। রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি। তাঁহার রচিত প্রথম কয়েকটি নাটকেও গীতিরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ তিনটি নাটক হইল—'বাল্মীকি-প্রতিভা' (১৮৮১), 'কালমৃগয়া' (১৮৮২) ও 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮)।

'বাল্মীকি-প্রতিভা,' কাল-মৃগয়া', 'মায়ার-খেলা'

দস্যু রত্নাকর কিভাবে দেবী সরস্বতীর বর লাভ করিয়া আদিকবি হইলেন, 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। কবির মতে "ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সঙ্গীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র।" দশরথ কর্তৃক অন্ধমুনির পুত্রবধ 'কাল-মৃগয়া' নাট্যের বিষয়। ইহাও 'সুরে নাটিকা'। কবি নিজেই লিখিয়াছেন—'বাল্মীকি-প্রতিভা ও কাল-মৃগয়া…গানের সূত্রে নাট্যের মালা। ঐ দুটি গ্রন্থে…একটা সঙ্গীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে।" অর্থাৎ এই দুইটি নাটকে ঘটনা যাহা সামান্যকিছু আছে তাহাও গীতপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া রূপ পাইয়াছে। 'মায়ার খেলা' সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন, "…মায়ার খেলা নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের পরে তাহা নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ।" এই নাট্যের বক্তব্য—'সুখকামী প্রেমের পশ্চাতে যে-বাসনা আছে, তাহাই প্রেমকে নিরন্তর ব্যর্থতার মরীচিকায় ছুটাইয়া মারে। দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়া বাসনাময় প্রেমকে যদি পরিশুদ্ধ করিয়া লওয়া যায়, তবেই

মায়ার বন্ধন কাটাইয়া উঠিয়া প্রেমের মুক্ত স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।' তিনটি নাটক সম্বন্ধে শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন—"গানের জালে প্রেমের ফাঁদ পাতিয়া নাটক-হরিণকে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা এখানে দেখি।"

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য বা কাব্যনাট্যগুলির সংলাপ কাব্যধর্মী। উহাদের মধ্যে চরিত্র-দ্বন্দ্বের অভাব, যাহা আছে তাহা ভাব-দ্বন্দ্ব। অধিকন্তু কোথাও কোথাও কোন-না-কোনপ্রকার তত্ত্ব আভাসিত। তাঁহার এই শ্রেণীর নাটক হইল—'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২), 'বিদায়-অভিশাপ' (১৮৯৩), 'কাহিনী'র অন্তর্গত 'গান্ধারীর আবেদন' (১৮৯৭), 'সতী' (১৮৯৭), 'নরকবাস' (১৮৯৭), 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' (১৮৯৭) এবং 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' (১৯০০)।

নাট্যকাব্য

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ-ই প্রথম রবীন্দ্রমানস ও রবীন্দ্রজীবনদৃষ্টির সত্য পরিচয়টি ধরা পড়িয়াছে এবং উত্তরজীবনে এই উপলব্ধিই কাব্যে নাটকে নানা রূপে নানা ভঙ্গিতে বারবার প্রকাশিত হইয়াছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' সম্বন্ধে কবির উক্তিই নাটকটিকে বুঝিবার শ্রেষ্ঠ সহায়ক—"নাট্যকাব্যের নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধ-ভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল। অনন্ত যেন সবকিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সন্ন্যাসী ইহাই দেখিল—ক্ষুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ; সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখন পাই তখনি যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই।"

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'

'চিত্রাঙ্গদা'র আখ্যানবস্তু মহাভারত হইতে গৃহীত হইলেও কবি সেই কাহিনীর উপর নূতন কল্পনার আলোকপাত করিয়াছেন। কুরূপা চিত্রাঙ্গদা মদনদেবের বরে বর্ষকালের জন্য অসামান্য রূপলাবণ্য লাভ করিয়া উহা দ্বারা অর্জুনকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে সেই ঋণ-লওয়া রূপের জন্য তাঁহার মনে অতৃপ্তি ও ধিক্কার জন্মিল। অর্জুনের মধ্যেও ক্রমে দেখা দিল অলস ভোগের অবসন্নতা। বর্ষকাল পরে চিত্রাঙ্গদার যথার্থ স্বরূপের ভিতর দিয়াই অর্জুন নর্মসহচরীর মধ্যে মর্মসহচরীকে লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। এই কাহিনীর মধ্য দিয়া যে তত্ত্বটি ফুটিয়া

'চিত্রাঙ্গদা'

উঠিয়াছে তাহা এই : 'সম্ভোগের আনন্দই দাম্পত্যজীবনের সবখানি নহে। কেবল দেহমাত্রে পর্যবসিত যে-মিলন তাহা অল্পদিনেই অতৃপ্তি ও অবসাদ আনয়ন করে, তখন চিত্ত চায় অন্তরের এবং আত্মার পরিচয় পাইয়া প্রেমাস্পদকে সম্পূর্ণভাবে জানিতে। মানুষের সম্পূর্ণ পরিচয় তাহার দেহ মন চিত্ত অন্তর ও আত্মা লইয়া।" চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্য হইলেও ইহা গীতিকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। পাত্রপাত্রীর নাটকীয় সংলাপের অন্তরালে যে-ভাবতত্ত্ব আছে তাহাই কাব্য-সৌন্দর্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছে।

'বিদায়-অভিশাপ'

দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ ও দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর প্রণয় ও বিদায় ব্যাপার অবলম্বনে 'বিদায়-অভিশাপ' রচিত। ইহার মধ্যে তপোবনের বর্ণনা ও দেবযানীর প্রণয়-নিবেদন আশ্চর্য-সুন্দর কাব্যশ্রী লাভ করিয়াছে। প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্বে কর্তব্যই এখানে মহত্তর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কবি 'বিদায়-অভিশাপ'-এ "পুরুষের কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠ জীবনের আদর্শকে মহীয়ান্ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।"

'গান্ধারীর আবেদন'-এ উগ্র স্বার্থপরতার সহিত নিত্য-মানবধর্মের সংঘাতের মধ্যদিয়া মানবধর্মকেই জয়ী করা হইয়াছে। এই নাট্যকাব্যে ভাবই প্রধান। ইহার একমুখী চরিত্রগুলিতে (গান্ধারী, দুর্যোধন ও ভানুমতী) নাটকীয় দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত। কেবল ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রে কিছুটা দ্বন্দ্ব আছে। একদিকে ধর্ম, অন্যদিকে পুত্রস্নেহ—এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে চরিত্রটিতে নাটকীয় সংঘাততরঙ্গ সৃষ্ট হইয়াছে। 'সতী', 'নরকবাস' ও 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অনুল্লেখ্য রচনা। 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ'-এ কর্ণ-চরিত্র এক অপরূপ নাটকীয় দ্বন্দ্বে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। মাতৃস্নেহ ও কর্তব্যের দোটানার মধ্যে পড়িয়া কর্ণ শেষ পর্যন্ত কর্তব্যকেই বরণ করিয়া বীরের সদ্‌গতিকে প্রার্থনা করিয়াছেন। "এই রচনাটিতেই রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও নাট্যধর্মের সার্থকতম সমন্বয় ঘটিয়াছে।"

কাহিনী-কাব্যনাট্য

৬। রবীন্দ্রনাথের প্রহসন বা কৌতুকনাট্যগুলির পরিচয় প্রদান কর।

উত্তর। রবীন্দ্রনাথের কৌতুকনাট্য বা প্রহসন-জাতীয় নাটকগুলির মধ্যে 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২—পরবর্তী অভিনয়যোগ্য সংস্করণ 'শেষরক্ষা' [১৮২৮]), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭), 'হাস্যকৌতুক' (১৯০৭) 'ব্যঙ্গকৌতুক' (১৯০৭) ও

'প্রজাপতির নির্বন্ধ'-এর নাট্যরূপ 'চিরকুমার সভা'ই (১৯২৬) উল্লেখযোগ্য। 'স্ফূর্তির হিল্লোলে ভরা, বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে মনোরম, নানা ভ্রান্তি, কৌতুককর ঘটনা ও খেয়ালী চরিত্রের সমাবেশে অফুরন্ত হাসির নির্ঝর এই নাটকগুলি আমাদের মনে একটি অবিমিশ্র হর্ষলোকের সৃষ্টি করে।'

রবীন্দ্রনাথের রঙ্গনাট্যগুলির মধ্যে 'গোড়ায় গলদ' বা 'শেষরক্ষা'ই সম্ভবত শ্রেষ্ঠ। গদাই নামক এক কল্পনাপ্রবণ যুবক ছদ্মবেশিনী ইন্দুমতীকে জনৈকা কাদম্বিনী বলিয়া ভুল করে এবং যৌবনসুলভ প্রমত্ততাবশত সেই কাল্পনিক নারীর সন্ধানে পথে পথে হা হুতাশ করিয়া বেড়ায়। পরে নানা হাস্যকর অবস্থার ভিতর দিয়া তাহার সেই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয় ও ইন্দুমতীকেই সে বিবাহ করে। পেশাদারী মঞ্চে এই নাটকটির অভিনয় বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

'গোড়ায় গলদ' : 'শেষরক্ষা'

'বৈকুণ্ঠের খাতা'র কাহিনীটি সংক্ষেপে এই : বৈকুণ্ঠ ও অবিনাশ দুই ভাই। বৈকুণ্ঠের নেশা ছিল সাহিত্য। তাঁহার একটি খাতা ছিল উহাতেই নিবদ্ধ ছিল তাঁহার সাহিত্যিক মনের প্রকাশ। অবিনাশকে বিবাহ দিবার পর অবিনাশের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁহার বাড়িতে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে, ও তাঁহার উপর দৌরাত্ম্য করে এবং বৈকুণ্ঠ বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতে চাহেন। তখন অবিনাশ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বৈকুণ্ঠ থাকিয়া যান। এই নাটকে 'একজন সরল ও উদারহৃদয় বৃদ্ধের সাহিত্যিক দুরাকাঙ্ক্ষা, তাহার নিকট যে আসে তাহাকেই তাহার খাতা পড়িয়া শুনাইবার দুর্দম খেয়াল নানা কৌতুককর অবস্থার সহিত স্থানে স্থানে করুণ পরিস্থিতিরও সৃষ্টি করিয়াছে। প্রভুভক্ত দুর্মুখ ভৃত্য ঈশান ও অন্তরালবর্তিনী অশ্রুমুখী বিধবা কন্যা নীরু ইহার হাস্যরসের মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত গভীর সুরের প্রবর্তন করিয়াছে।' এই নাটকের বিপিন নামক একটি পার্শ্বচরিত্র বড়ই উপভোগ্য। 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক' পূর্ণাঙ্গ নাটক নহে, ঐ দুইটি গ্রন্থে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র কতকগুলি নাট্যদৃশ্যের সমাবেশ আছে, অবশ্য প্রত্যেকটি এককভাবে সম্পূর্ণ।

'বৈকুণ্ঠের খাতা'

'চিরকুমার সভা'য় চিরকৌমার্য-ব্রতের অন্তঃসারশূন্যতার প্রতি ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। ইহার সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি এইরূপ : "পূর্ণ, শ্রীশ ও বিপিন চিরকুমার-

সভার সদস্য। তাঁহারা বিবাহ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। চিরকুমার বৃদ্ধ চন্দ্রবাবু ছিলেন এই সভার সভাপতি। সভার ভূতপূর্ব সদস্য অক্ষয়ের দুই শালিকা ছিল—নীরবালা ও নৃপবালা। চন্দ্রবাবুর এক ভাগিনেয়ী ছিল, তাহার নাম নির্মলা। কিছুকাল পরে সভার সদস্যত্রয় পঞ্চশরে বিদ্ধ হইয়া এই তিনটি কুমারী কন্যার পাণিগ্রহণ না করিয়া পারিলেন না। চিরকুমার সভা ভাঙিয়া গেল।"

'চিরকুমার সভা'

রবীন্দ্রনাথের প্রহসন বা কৌতুকনাট্য সম্বন্ধে শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন: "রবীন্দ্রনাথের রঙ্গনাট্যগুলিতে একটা ভদ্র মার্জিত রুচির উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ হাস্যকৌতুক প্রাধান্য পাইল। অবশ্য শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক নাটকের গৌরব নির্ভর করে ঘটনা ও চরিত্রের উপর। বিশেষত ঘটনাসংস্থানের সকৌতুক বয়নকৌশল এই-জাতীয় নাটকের প্রাণস্বরূপ।" রবীন্দ্রনাথের প্রহসন-জাতীয় রচনায় ঘটনা ও চরিত্রগত অসংগতির তুলনায় সংলাপচাতুর্যই বেশী। "তিনি ঘটনা ও চরিত্রের বক্রতা বাদ দিয়া সংলাপের কৌতুকজনক পরিস্থিতিকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছেন; কাজেই তাঁহার রঙ্গনাট্যে কথা বা 'উইট'এর মারপ্যাঁচ অধিক। হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি, কৌতুকজনক কাহিনী নির্বাচন বা ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল চরিত্রসৃষ্টিতে তিনি ততদূর সফলকাম হন নাই।"

৭। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রচনা কর।

উত্তর। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাসের স্রষ্টা হইলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহার উপন্যাসে বিস্তৃত কাহিনীপটে মানব-জীবনালেখ্যের সকল বর্ণবৈভব গভীরতম ব্যঞ্জনায় প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। অবশ্য তাঁহার উপন্যাসগুলি ছিল প্রধানত ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স। ইহার কারণ, বাঙালীর নিশ্চিন্ত জীবনধারার মধ্যে সেদিন যে-বিপুল প্রাণবন্যার বেগ সঞ্চারিত হইয়াছিল, উহার আবেগ তৎকালীন অতি সাধারণ জীবনযাত্রাপ্রণালীর মাধ্যমে পরিস্ফুট হইতে পারিত না বলিয়াই বঙ্কিমের ধারণা ছিল। 'এইজন্যই প্রয়োজন হইয়াছিল এমন একটা অর্ধ-কাল্পনিক সমাজের—জীবন যেখানে প্রবল তরঙ্গভঙ্গে প্রবহমান। বিদ্যুৎচমকদীপ্ত দুর্যোগের মধ্যে জগৎসিংহের অশ্বক্ষুরধ্বনি দ্বারাই বঙ্কিম যুগসন্ধিকালীন বাঙালীর হৃদয়চাঞ্চল্যকে ধ্বনিত করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন অন্য পথ ছিল না।'

বঙ্কিমের সমসময়ে তাঁহারি অনুসরণে বাংলায় রোমান্সধর্মী উপন্যাস রচিত

হইতেছিল। উপন্যাস রচনায় ব্রতী হইয়া রবীন্দ্রনাথও উহার প্রভাব সম্পূর্ণ এড়াইতে পারেন নাই। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত তাঁহার প্রথম অনুল্লেখ্য উপন্যাস 'করুণা'কে (১৮৭৭-৭৭) বাদ দিলে পরবর্তী দুইটি উপন্যাস—'বউঠাকুরানীর হাট' (১৮৮২) ও 'রাজর্ষি' (১৮৮৫) রোমান্টিক ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শেই রচিত। কিন্তু পার্থক্যও রহিয়াছে বিস্তর। ইতিহাসের পটভূমিকায় দ্বন্দ্ব-সংঘাতমুখর জীবন অপেক্ষা শান্ত আনন্দরসের প্রতিই লেখকের প্রবণতা সেখানে অধিকতর পরিস্ফুট। বস্তুত জীবনবাদ অপেক্ষা জীবনের উপর একটা উচ্চ আদর্শের আলোকপাত করাই তাঁহার শিল্পধর্ম।' 'বউঠাকুরানীর হাট'-এর

'বৌঠাকুরাণীর হাট'

অবলম্বন যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের কাহিনী। কিন্তু উপন্যাসটিতে কাহিনী প্রায়শই শিথিলবদ্ধ। দ্বন্দ্বহীন চরিত্রগুলির অধিকাংশই জীবনধর্মী না হইয়া ভাবের রূপবিগ্রহে পরিণত হইয়াছে। প্রতাপাদিত্য মানবধর্মহীন নিষ্ঠুরতার প্রতিরূপ। বসন্তরায় সংসারবিরাগী উদাস গীতিকবিতার সুর। উদয়াদিত্য ও বিভা যেন এই ভীষণতা ও কোমলতার দুই তটে আহত ব্যর্থতার করুণ কলধ্বনি।

'রাজর্ষি' ত্রিপুরার রাজবংশের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই উপন্যাসের ইতিহাসের অংশ খুবই কম। প্রেম আর প্রতাপ এই দুই ভাববিগ্রহের দ্বন্দ্বই কাহিনীতে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। রাজা গোবিন্দমাণিক্য অচঞ্চল স্থির আদর্শবাদের এবং রাজপুরোহিত রঘুপতি ব্রাহ্মণ্যগর্ব ও সনাতনঅন্ধ আচারনিষ্ঠার মূর্ত প্রতীক। অন্ধ হিংসা অপেক্ষা-যে ভ্রাতৃপ্রেম মানবপ্রেম অধিকতর মহীয়ান, এই তত্ত্বপ্রাধান্যের জন্যই উপন্যাসটি বস্তুতন্ত্রী না হইয়া ভাবতন্ত্রী হইয়াছে এবং ইহাতে উপন্যাস-ধর্মই লঙ্ঘিত

'রাজর্ষি'

হইয়াছে। অবশ্য এই উপন্যাসে জয়সিংহের মধ্যেই কিছুটা অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে এবং এই কারণেই চরিত্রটির মধ্যে সজীবতার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপন্যাস দুইটির চরিত্রগুলি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন: "এই চরিত্রগুলি যেন প্রত্যেকে এক একটি মানসপ্রবণতার মূর্ত প্রকাশ; বাস্তব জীবনে যে-পরস্পরবিরোধী জটিল ভাবের সংমিশ্রণ দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে সে-জটিলতার একান্ত অভাব। কবিকল্পনার একমুখীনতা, একটি বিদেহী ভাবকে রূপ দিবার উদ্দেশ্যে উহার জন্য রক্ত-মাংসের রূপক-রচনা এই চরিত্রসমূহের প্রাণস্পন্দনের মূল

উৎস।...এই নরনারীগুলি সব বিশুদ্ধ ভাবরাজ্যের (Idea) অধিবাসী; ইতিহাস ইহাদের পাদপীঠ ও জীবন ইহাদের নেপথ্যগৃহ। আসলে ইহারা ইতিহাসের সিঁড়ি বাহিয়া ভাবলোকের গুহা হইতে জীবনের আলোকে প্রকাশিত হইয়াছে ও রহস্যের আঁধারের সহিত আলোক-চূর্ণের কল্পিত রশ্মি মাখিয়া জীবনের সহিত সাধর্ম্যের অভিনয় করিয়াছে।"

দীর্ঘ বিরতির পর রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি' (১৯০২) নামে যে উপন্যাসটি রচনা করিলেন তাহাতে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হইল। বাঙালী-জীবনে যে রোমান্সের স্থান নিতান্তই নগণ্য এবং সেখানে অসাধারণত্ব আরোপ দ্বারা উপন্যাস রচনা করা চলে না, ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ হয়তো তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাই 'চোখের বালি'র উপজীব্য হইল সাধারণ ঘরোয়া জীবন। রোমান্সের অভাবটা তিনি পূরণ করিলেন পাত্রপাত্রীর সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দ্বারা। বাংলা উপন্যাস রচনায় এখন যে-পদ্ধতি চলিতেছে—অর্থাৎ সামাজিক সংস্কারনিরপেক্ষভাবে পাত্রপাত্রীর মানসলোকের বিবর্তন ও বিশ্লেষণ—তাহার সূত্রপাত হইল 'চোখের বালি'তে। বঙ্কিম-উপন্যাসেও চরিত্র-বিশ্লেষণ ছিল, কিন্তু উহা ছিল সরল ও সংক্ষিপ্ত। কিন্তু 'চোখের বালি'তে আছে 'প্রতিদিনকার ঘটনার মাধ্যমে অহরহ পরিবর্তিত মনোলোকের দ্বন্দ্ব ও বিরোধের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা।' সমাজনীতিবিগর্হিত প্রেম উপন্যাসটির বিষয়বস্তু হইলেও বঙ্কিমের মতো রবীন্দ্রনাথ ন্যায়নীতির দণ্ড লইয়া চরিত্রগুলিকে তাড়া করেন নাই, তিনি শুধু হৃদয়ের গুহায়িত জটিলতাকে বহির্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। এই উপন্যাসে মহেন্দ্র ও বিহারীর দুর্নিবার বাসনার আবর্তে বিধবা বিনোদিনীর জীবন যেভাবে পাক খাইয়াছে, অতৃপ্তির অন্তর্দাহে যেভাবে জ্বলিয়াছে, এবং উহার মধ্যে রাজলক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা ও আশা যেভাবে সেই দ্বন্দ্বকে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর রোহিণী-গোবিন্দলাল-ভ্রমরের কাহিনীতে ততখানি জটিলতা নাই। বরং পরবর্তী ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র-রচিত অভয়া, কিরণময়ী ও কমলকে বিনোদিনীর নবতর সংস্করণ বলা যাইতে পারে।

মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণমূলক উপন্যাসের সৃষ্টি: 'চোখের বালি'

পরবর্তী উপন্যাস 'নৌকাডুবি'তে (১৯০৬) আছে ঘটনার ঘনঘটা। নায়ক রমেশের সামান্য একটি ভুলকে লেখক এখানে কৃত্রিম উপায়ে দীর্ঘায়ত করিয়াছেন,

এই কারণে কাহিনী নিতান্তই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। অধিকন্তু গোটা উপন্যাসটাই একটা মতবাদের রূপবিগ্রহে পরিণত হইয়াছে।

'নৌকাডুবি'

'ভারতীয় নারীর নিকট স্বামী-নামক ব্যক্তিটির চেয়ে স্বামী-নামক আইডিয়াটাই যে অধিকতর বরণীয়, "নৌকাডুবি"তে এই ভাবটিই কাহিনী ও চরিত্রকে অতিক্রম করিয়া প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।' চরিত্র হিসাবে হেমনলিনী এই কারণেই উল্লেখযোগ্য যে, "লেখকের নিজের মনে নারীমহিমার যে-ভাবকল্পনা ছিল, হেমনলিনী তাহার প্রথম সার্থক মূর্ত বিকাশ" এবং রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের কয়েকটি উপন্যাসে ঐরূপ নারীচরিত্র যেমন—সুচরিতা, লাবণ্য, কুমুদিনী নব নব রূপে দেখা দিয়াছে।

পটভূমিকার বিশালতায় ও ভাবসত্তায় 'গোরা' উপন্যাসটি (১৯০৯) মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে-বিক্ষোভ ও আলোড়ন, দেশাত্মবোধের যে-চাঞ্চল্য, ধর্মবিপ্লবের যে-উদ্দীপনা দেখা গিয়াছিল, 'গোরা'য় তাহা বৃহৎ মানবধর্মের প্রতিষ্ঠায় সার্থকতা লাভ করিয়াছে। 'গোরা'-চরিত্রে আছে চিরন্তন ভারত-বর্ষের আত্মবোধের প্রকাশ। সমাজের আদর্শ যে পরিবর্তনশীল, নানা সংঘাতের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ এই সত্যেরই ইঙ্গিত করিয়াছেন। উপন্যাসে নানা চরিত্রের ভিড়ের মধ্যে সুচরিতার লালিত্য ও তেজস্বিতা, পরেশবাবুর, অন্তর্মুখী শান্ত প্রসন্নতা, আনন্দময়ীর উদার আদর্শবাদ কাহিনীকে একটি বিশেষ মর্যাদা দান করিয়াছে। "গোরা-তে রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মতো একটা সমগ্র সমাজের, দেশব্যাপী নানা আন্দোলনের ব্যাপক চিত্র আঁকিয়াছেন। চরিত্রগুলি এই উন্মথিত জীবন প্রতিবেশ হইতেই তাহাদের ব্যক্তিসত্তার পুষ্টির জন্য রস আহরণ করিয়াছে। ব্যক্তিজীবনের সহিত বৃহত্তর রাজনীতি ও ধর্মাদর্শের এমন নিবিড় সুসমঞ্জস মিলন, ব্যক্তিমানসের শাখা-প্রশাখায় সমস্ত সমাজদেহে প্রবাহিত প্রাণধারায় এরূপ স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণের দৃষ্টান্ত 'গোরা'র পর বাংলা উপন্যাসে দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে (শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।"

'গোরা'

'গোরা'র পর রবীন্দ্রনাথ যে সাতটি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন জীবনচিত্র ও আত্মকেন্দ্রিকতাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। নূতন ধরনের শিল্পরীতিভিত্তিক ঐ উপন্যাসগুলি হইল—'ঘরে বাইরে' (১৯১৬),

'চতুরঙ্গ' (১৯১৬), 'যোগাযোগ' (১৯২৯), 'শেষের কবিতা' (১৯২৯), 'দুইবোন' (১৯৩৩), মালঞ্চ' (১৯৩৪) ও 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪)। এই উপন্যাসগুলি সম্পর্কে শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন: "লেখক এগুলিতে এক-একটি স্বল্পপরিধি, অথচ উত্তেজনাময় ও সংঘাত-জড়িত প্রতিবেশে কয়েকটি চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মনোভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা তীক্ষ্ণব্যঞ্জনাপূর্ণ, সংক্ষিপ্ত ও শাণিত—সর্বদা যেন সঙীন উঁচাইয়া শ্লেষাত্মক বিশ্লেষণে উন্মুখ। তাঁহার কাহিনী-বিন্যাস ধারাবাহিক নহে, কয়েকটি সুনির্বাচিত বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদের সমষ্টি; ইহাদের মধ্যে ফাঁকগুলি লেখক প্রত্যক্ষ বর্ণনার পরিবর্তে পরোক্ষ উল্লেখে ও আভাস-ইঙ্গিতে পূরণ করিয়াছেন। চরিত্রগুলির বেশির ভাগই সমাজনিরপেক্ষ, অত্যুগ্রব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সাধারণ জীবনযাত্রার সহিত সংযোগহীন; তাহাদের মুখে চরিত্র ও অবস্থানুযায়ী সংলাপের পরিবর্তে epigram-কণ্টকিত তির্যক ভাষণ। কোনো কোনো চরিত্রে সুকুমার কাব্যানুভূতি প্রধান রূপে বর্তমান থাকিলেও মোটের উপর চরিত্র-কল্পনায় ও জীবন-বিশ্লেষণে মনন-প্রাধান্য।"

শেষ সাতটি উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য

বিশ শতকের প্রথম দশকে বাঙলাদেশে যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দেখা দিয়াছিল, উহার মধ্যকার বিকৃত আদর্শের প্রতি রবীন্দ্রনাথ বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন না। সেই বিরূপ মনোভাবেরই পটভূমিকায় স্বামী-স্ত্রীর সামাজিক অধিকারমূলক একটি সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছে 'ঘরে বাইরে'। 'চলিত ভাষায় প্রত্যক্ষ উক্তির ঢঙে লেখা' এই উপন্যাসের নিখিলেশ উদার আদর্শবাদী স্বামী। বিমলা সাধারণ পতিব্রতা স্ত্রী। তাহাদের স্বচ্ছন্দ জীবনের মধ্যে উপস্থিত হইল নৈরাজ্যবাদী ও আত্মকেন্দ্রিক অন্ধকারবাসী এক সরীসৃপ—সন্দীপ। তাহার চোখে বাসনার আবিলতা, মুখে পিচ্ছিল কামনার লালা। মোহগ্রস্ত বিমলা সাময়িকভাবে সেই সরীসৃপের দৃষ্টির কাছে মোহাচ্ছন্ন হইল, কিন্তু পরে সুস্থ দৃষ্টি লাভ করিল। এই উপন্যাসে বিমলার চরিত্রই একমাত্র জীবন্ত, অপর চরিত্রগুলি বিশিষ্ট মতবাদের প্রতিনিধি মাত্র। অধিকন্তু আমাদের মনে হয়, সন্দীপকে সামগ্রিক সন্ত্রাসবাদী আদর্শের প্রতিভূ করিয়া রবীন্দ্রনাথ অবিচারই করিয়াছেন। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসটি আরও অনেক পরে রচিত

'ঘরে বাইরে': 'চার অধ্যায়'

হইলেও 'ঘরে বাইরে'র সঙ্গেই আলোচিত হইবার যোগ্য। কারণ, ইহাও সন্ত্রাসবাদেরই পটভূমিকায় রচিত অবাস্তব জীবনচিত্র মাত্র। এখানে সন্দীপের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে অতীন্দ্র। নায়িকা এলা অবশ্য কুমারী এবং সন্ত্রাসবাদী দলেরই সভ্যা। 'এখানেও প্রেমের সঙ্গে বিপ্লববাদের সংঘর্ষ। প্রেমই নরনারীর সুস্থ বিকাশের প্রেরণা, সন্ত্রাসবাদ তাহাদের ব্যক্তিত্বকে গ্রাস করিয়া তাহাদের যন্ত্রে পরিণত করে, ইহাই লেখকের অভিমত।' অভিমত যাহাই হোক, উপন্যাসটির বন্ধন শিথিল এবং পরিণতি অতি-নাটকীয় ও বাস্তবভাবর্জিত।

জ্যেঠামহাশয়, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস এই চারিটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন গল্পকে এক অঙ্গে গ্রথিত করিয়া 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি রচিত। 'ঘরে বাইরে' ও 'চার অধ্যায়' যেমন সন্ত্রাসবাদের পটভূমিকায় রচিত, 'চতুরঙ্গ' তেমনি গুরুবাদের পটভূমিতে লিখিত। সর্ব-সংস্কারমুক্ত জ্যেঠামহাশয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত শচীশও সেই গুরুবাদের শিকার হইয়াছে, এবং দামিনীও। এই গ্রন্থে শচীশ-দামিনীর জটিল মানব-সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাত তীক্ষ্ণ সাংকেতিকতায় প্রকাশিত হইলেও উপন্যাস-শিল্পের দিক হইতে 'চতুরঙ্গ' আকর্ষণহীন।

'চতুরঙ্গ'

বরং সেই তুলনায় 'যোগাযোগ' "রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি ঔপন্যাসিক লক্ষণসম্পন্ন—ইহার ঘাত-প্রতিঘাত ও ঘটনাবিন্যাস অনেকটা ঔপন্যাসিক-আদর্শ-প্রভাবিত।" অবশ্য এ কথাও সত্য যে, উপন্যাসটির পরিণতি কিছুটা অসংলগ্ন এবং আকস্মিক। হঠাৎ-ধনী মধুসূদনের উদ্ধত অহংকার ও অমার্জিত রুচির সঙ্গে সুকুমার অভিজাত্যের মধ্যে লালিত ললিতরুচি কুমুদিনীর দাম্পত্য-জীবনের সংঘাত এবং কুমুদিনীর সন্তানসম্ভাবনার মধ্যে উহার অবসান 'যোগাযোগ'-এর বিষয়বস্তু। দম্পতির দ্বন্দ্বে যে-মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আছে তাহা খুবই বাস্তবসম্মত হইয়াছে।

'যোগাযোগ'

'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রনাথের এক অনবদ্য সৃষ্টি। ইহাতে প্রাত্যহিক জীবনের সংকীর্ণতার উর্ধ্বে প্রেমের যে বিচিত্র লীলা কবিত্বের সুকোমল বেদনা-রাগে রঞ্জিত হইয়াছে, বাংলা সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। তদুপরি ইহার সংলাপে ও বর্ণনায় বুদ্ধির যে-চমকপ্রদ ঔজ্জ্বল্য আছে, উহা শাণিত ইস্পাত-

ফলার ন্যায় উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ। ইহাতে অমিট রে ও কেটি মিটারেং কবি ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের যে-শ্লেষাত্মক চিত্র আঁকিয়াছেন তাহার বাস্তবতা আশ্চ. বিস্ময় উৎপাদন করে। তথাপি ইহাই গ্রন্থটির সব নহে। বিবাহসিদ্ধ প্রাত্যহিক মিলন অপেক্ষা মনোলোকে বিচ্ছেদ-বেদনাপূর্ণ স্বপ্নাভিসারী মিলনই যে সত্যতর, এই তত্ত্বটিই 'শেষের কবিতা'র মূল বক্তব্য। অমিত ও লাবণ্য তাই তাহাদের 'কল্পলোকবিহারী প্রেমকে ধূলি-স্পর্শ হইতে বাঁচাইবার জন্যই' উভয়ে যথাক্রমে কেতকী মিত্র ও শোভনলালকে সমাজসিদ্ধ প্রথায় বিবাহ করিয়াছে। "ইহার তত্ত্ব যাহাই হউক না কেন, এরূপ অপূর্ব কাব্যধর্মী বর্ণনা, তির্যক বাগ্‌বিন্যাসের বিস্ময়কর নিপুণতা, প্রেম ও সৌন্দর্যের স্বর্গলোক রচনা এবং তাহা হইতে স্বেচ্ছানির্বাসনের সকরুণ বেদনা রবীন্দ্রপ্রতিভার বিপুলপ্রসারী শক্তিকেই প্রমাণিত করিয়াছে। (শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।"

'শেষের কবিতা'

নারীর দুই রূপ—মোহিনী আর কল্যাণী, প্রিয়া ও জননী। এই দুই রূপেই সে পুরুষকে আকর্ষণ করে। এই তত্ত্বটিই অনেকটা বড়-গল্পধর্মী 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ'-এ রূপায়িত হইয়াছে। এই তত্ত্ব "কবি-কল্পনায় অনুভব-বেদ্য, উপন্যাসের সম্প্রসারণে এই তত্ত্বের যথাযোগ্য রূপায়ণ হয় নাই।" কেবল উজ্জ্বল তির্যক বাগ্‌ভঙ্গি ও মধুর কাব্যসুরভিই ঐ উপন্যাস দুইটির যাহা কিছু আকর্ষণ।

'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ'

ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এই কথা বলা চলে যে, বঙ্কিমের পরে তিনি বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক নূতন ধারার প্রবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবে ঐতিহাসিক উপন্যাসের অবসান, আর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক বস্তুনিষ্ঠ উপন্যাসের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু এই বস্তুনিষ্ঠা ক্ষণে ক্ষণে কাব্য ও তত্ত্বের আকাশেই ঊর্ধ্বচারণ করিয়াছে। রবীন্দ্র-উপন্যাসে কবির ব্যক্তি-মনের প্রজ্ঞাশীলতাই প্রত্যক্ষভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রাবলী যেন এক-একটি মানবায়িত ভাব। পরস্পরবিরোধী ভাব-সংঘর্ষ হইতে তাঁহার উপন্যাসে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জন্ম নেয়, তাহা বস্তুসংসারের সধর্মসঞ্জাত নয়, তাহা তাত্ত্বিক গ্রন্থিমোচনেরই ক্রমানুবৃত্তি।" একমাত্র 'চোখের বালি' ইহার ব্যতিক্রম।

রবীন্দ্র-উপন্যাসের মূল্যায়ণ

প্রশ্ন ৮। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিষয়বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর। উপন্যাসের মতো ছোটগল্পও বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবেই জন্মলাভ করিয়াছে। কিন্তু আকারে ছোট হইলেই উহা ছোটগল্প হয় না, উহার form বা বাঁধুনির রীতি স্বতন্ত্র। "উহা এক ধরনের কথাশিল্প যাহাতে নাটক, উপন্যাস বা মহাকাব্যের পটবিস্তার, কালবিস্তার, বা দীর্ঘ ঘটনাজাল নাই ; বরং তাহারই একটা খণ্ড রূপকে কোনো একটি বিশেষ সংস্থানে, বিশেষ ঘটনায় ও বিশেষ চরিত্রে এমন ইঙ্গিতময় করিয়া তোলে যে, তাহাতেই একপ্রকার রসোপলব্ধি হয় ; যেন জীবনের বিরাট প্রাঙ্গণে যে সকল স্বল্পালোকিত, অনাবিষ্কৃত, অবজ্ঞাত কোণ রহিয়াছে, সেইগুলার উপরে তীব্র ও চকিত আলোকপাত করে ; কোথাও কৌতুক, কোথাও বিস্ময়, কোথাও-বা আমাদের হৃদয়ের একটা সুপ্ত তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া ক্ষণিক ভাববিহ্বলতা সৃষ্টি করে (মোহিতলাল)।" ইহা যেন নববধূর মুখ দেখানো—চকিতে অবগুণ্ঠন অপসৃত করিয়া চকিতেই আবার তাহা টানিয়া দেওয়া হয়, সেই ক্ষণিক দেখার মধ্যেই একটা সৌন্দর্য বিদ্যুৎবৎ স্ফুরিত হইয়া উঠে। এইজন্য ছোটগল্পের পরিণতিতে থাকে একটি নাটকীয় উপাদান এবং কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রের সহায়তায় প্রধান চরিত্রটি সেই রসপরিণতির অভিমুখেই ছুটিয়া চলে।

ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই সার্থক ছোটগল্পের আদি স্রষ্টা। কেবল তাহাই নহে, তিনি এই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ তো বটেই, বিশ্বসাহিত্যেরও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার। রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি ধারায় সুখদুঃখবিরহ মিলনপূর্ণ মানব-সংসারে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা বর্তমান। তাঁহার ছোট-গল্পগুলি এই আকাঙ্ক্ষারই ফল। ইহাই তাঁহাকে শহুরে জীবন হইতে পল্লীর শান্তিময় কোলে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। তাই তাঁহার ছোটগল্পে পল্লী ও পল্লীজীবনের এবং পল্লীর সহিত অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িত প্রকৃতির প্রভাব এত বেশী। ছোটগল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী' কাব্যের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় বলিয়াছেন—

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে পল্লীজীবনের প্রভাব

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখকথা,
নিতান্তই সহজ সরল,

সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে,
শেষ হয়ে হইল না শেষ।

ছোটগল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রমানস বুঝিয়া লইবার পক্ষে উদ্ধৃতিটি বিশেষ মূল্যবান। 'ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখকথা'ই তাঁহার গল্পের উপজীব্য'। অবশ্য কিছু গল্পে ইহার ব্যতিক্রম আছে। বিশেষত 'সবুজপত্র'-এর যুগ হইতে 'রবীন্দ্র গল্প তির্যক ভঙ্গি ও তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়াছে, গল্পে সমাজ-সচেতনতার মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছে, চলিত ভাষার সংক্ষিপ্ততা ও এপিগ্রামের বিদ্যুৎ-দীপ্তিতে তাঁহার গল্প তখন হইতে খুবই ব্যঞ্জনাগর্ভ হইয়া উঠিয়াছে।'

ছোটগল্পরচনা ও শ্রেণীবিভাগ

রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প 'ভিখারিণী' ১২৮৪ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহার পর আরও তিনটি গল্প তিনি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ১২৯৮ সালে 'হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত 'দেনাপাওনা' গল্পই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সার্থক ছোটগল্প। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের ইতিহাসেরও এইখানেই আরম্ভ। 'হিতবাদী'তে রবীন্দ্রনাথের ছয়টি গল্প প্রকাশিত হয়। ইহার পর 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ছত্রিশটি গল্প। অতঃপর 'ভারতী', নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন', 'সবুজপত্র,' 'প্রবাসী', শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি সাময়িকীতে তাঁহার বহু গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। এই গল্পগুলির নানা সংকলন দেখা যায়। তন্মধ্যে 'বিশ্বভারতী'-প্রকাশিত তিন খণ্ড 'গল্পগুচ্ছ'ই প্রধান। ইহা ছাড়া 'তিন সঙ্গী' নামক গল্প-সংকলনটিও উল্লেখ্য। বিষয়বৈচিত্র্যের দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলিকে মোটামুটিভাবে আমরা চারি শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি—সামাজিক জীবনে সম্পর্ক-বৈচিত্র্য, প্রেম, প্রকৃতির সহিত মানব-মনের নিগূঢ় অন্তরঙ্গ যোগ ও অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ।

'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'দান-প্রতিদান,' 'রাসমণির ছেলে,' 'ব্যবধান,' 'দিদি', 'পণরক্ষা', 'শাস্তি', 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', 'ঠাকুর্দা', 'পুত্রযজ্ঞ', 'ফেল্', 'ছুটি', 'সদর ও অন্দর', 'দুর্বুদ্ধি', 'কর্মফল', 'সম্পত্তি-সমর্পণ', 'হালদার-গোষ্ঠী', 'স্বর্ণমৃগ',

'গুপ্তধন', 'অনধিকার প্রবেশ', 'হৈমন্তী', 'স্ত্রীর পত্র', 'পয়লা নম্বর', 'নামঞ্জুর গল্প', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'পোস্টমাস্টার', 'কাবুলিওয়ালা, প্রভৃতি গল্প বিচিত্র সমাজসম্পর্ককে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'পোস্টমাস্টার' ও 'কাবুলিওয়ালা' গল্প তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য এইজন্যই যে. ঐ গল্পগুলিতে সাধারণ সামাজিক সম্পর্ককে অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর সমাজের স্পর্শ লাগিয়াছে। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'-এ প্রভু-ভৃত্যের একটি মানবিক সম্পর্ক করুণ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'পোস্ট-মাস্টার' গল্পটি রক্তসম্পর্কহীন অসমবয়স্ক এক পুরুষ ও এক বালিকার হৃদয়সঞ্জাত স্নেহের ভিতর দিয়া বেদনাবিমথিত দীর্ঘশ্বাসের মতো বিষণ্ণ গীতিমূর্ছনা লাভ করিয়াছে। 'কাবুলিওয়ালা'তে 'এই স্নেহবন্ধন দেশকালপাত্রের গতি অতিক্রম করিয়া উহাকে বিশ্বজনীন কাব্যমহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে।' 'হৈমন্তী', 'স্ত্রীর পত্র' 'ভাইফোঁটা', 'পয়লা নম্বর', 'পাত্র ও পাত্রী', 'নামঞ্জুর গল্প' সবুজপত্র যুগের লেখা। এইগুলিতে সমাজ-সমালোচনার উগ্র ঝাঁজ যতখানি আছে, রসসৃষ্টির প্রয়াস ততখানি নাই।

সামাজিক জীবন সম্পর্ক-বৈচিত্র্যের গল্প

'একরাত্রি', 'মহামায়া', 'মধ্যবর্তিনী', 'মাল্যদান', প্রায়শ্চিত্ত', 'মানভঞ্জন', 'অধ্যাপক', 'সমাপ্তি', 'দৃষ্টিদান', 'দুরাশা', নষ্টনীড়', 'স্ত্রীর পত্র', 'রবিবার', 'শেষ কথা,' 'ল্যাবরেটরি' প্রভৃতি গল্পে আছে প্রেমের লীলাবৈচিত্র্য। প্রথম-উল্লিখিত এগারোটি গল্পে প্রেমের কোমল মধুর দিকটিই কাব্যধর্মী ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত। একরাত্রি গল্পটিতে একটি ইঙ্গিতগর্ভ পরম মুহূর্তের মধ্যে দেহাতীত প্রেমের ভাবসম্মিলনকে আশ্চর্য কাব্যরূপ দান করা হইয়াছে।' 'মধ্যবর্তিনী', 'সমাপ্তি' 'দৃষ্টিদান' প্রভৃতিতে আছে সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের সঙ্গে কাব্যানুভূতির মিশ্রণ। নিবারণ ও হরসুন্দরী এই দুই প্রৌঢ় দম্পতির পুনর্মিলনের মাঝখানে অকালমৃতা স্ত্রী শৈলবালার স্মৃতি যে ব্যবধান রচনা করিয়াছে, উহাই 'মধ্যবর্তিনী' গল্পটিকে এক বিষণ্ণ চেতনায় ভরিয়া তুলিয়াছে। 'দুরাশা' গল্পে 'এক সংস্কার বিড়ম্বিত মিলন-বুভুক্ষু মানবাত্মার ব্যর্থ প্রণয়ের বেদনা-নিবিড়, পরিহাস-মর্মান্তিক কাহিনী রূপ পাইয়াছে। কিন্তু যে-পরিবেশে কাহিনীটি কথিত উহা রোমান্সের রস—কাব্যের পেয়ালায় পরিবেশিত।' 'দালিয়া' এবং 'জয়-পরাজয়' গল্প দুইটি

প্রেমের গল্প

এইরূপ রোমান্স-রসে পরিপূর্ণ। 'নষ্টনীড়'-এ অমল ও চারুর অন্তর্দ্বন্দ্ব আশ্চর্য শিল্পকৌশলের মাধ্যমে রূপায়িত হইয়াছে। কিন্তু সেই দ্বন্দ্ব-পরিণতির সময় কিছুটা দীর্ঘ বলিয়া এবং স্বামী-অবহেলিতা স্ত্রীর অন্য পুরুষ সম্পর্কের সমস্যা বিশেষ গভীর বলিয়া উহাকে ছোটগল্প বলা চলে কি না তাহা বিবেচনার বিষয়। শেষোক্ত চারিটি—বিশেষত তিনটি—গল্পের সুর সম্পূর্ণ পৃথক। ঐগুলিতে মননের ও বাগ্‌ভঙ্গির যে শাণিত দীপ্তি আছে তাহা বুদ্ধিকে বিস্ময়ে আন্দোলিত করে, কিন্তু হৃদয়কে রসে তৃপ্ত করে না। বিষয় ও উপস্থাপনার দিক হইতে গল্পগুলি অভিনব বটে। 'স্ত্রীর পত্র'-গল্পটিতেই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম নিপীড়িত নারীত্বের ব্যক্তিসত্তাকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিয়াছেন। নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় যে নারীত্বেই, রৌদ্রদীপ্ত ছুরিকার মতো উহার আভাস ঝলকিয়া উঠিয়াছে 'ল্যাবরেটরি'র 'সোহিনী'-চরিত্রে।

প্রকৃতির সহিত মানবমনের নিগূঢ় যোগের কথা গীতিমূর্ছনায় ঝংকৃত হইয়াছে 'শুভা', 'অতিথি', 'আপদ' প্রভৃতি গল্পে। 'শুভা গল্পের শুভা-চরিত্রটি প্রকৃতির সঙ্গে এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে উহাকে বোবা প্রকৃতির মূর্ত বিগ্রহ বলিয়া মনে হয়। 'অতিথি' গল্পের তারাপদও প্রকৃতির প্রাণচাঞ্চল্যের সঙ্গে গভীরভাবে একাত্ম। তাই সে সংসারের বন্ধনে ধরা দেয় না, রহস্যময়ী প্রকৃতির আহ্বানে অজানা সুদূরের যাত্রী হয়। রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত ও প্রেমের গল্পগুলির মধ্যেও প্রকৃতির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। প্রকৃতির মধ্যে তিনি প্রাণচৈতন্য সঞ্চার করিয়া প্রকৃতিকে মানুষের হৃদয়ের বড় কাছাকাছি আনিয়াছেন।

প্রকৃতির সহিত মানবমনের নিগূঢ় অন্তরঙ্গ যোগের গল্প

অতিপ্রাকৃতের স্পর্শে রঞ্জিত গল্পগুলির মধ্যে 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা', 'নিশীথে', 'কঙ্কাল'; 'জীবিত ও মৃত' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অবশ্য শেষোক্ত দুইটি গল্পে আলৌকিকতার রহস্যময় স্পর্শ তেমন অনুভূত হয় না। কিন্তু 'মণিহারা' ও 'নিশীথে' গল্প দুইটিতে গার্হস্থ্য প্রতিবেশের উপর এমন একটা অতীন্দ্রিয় জগতের রোমাঞ্চ সৃষ্টি করা হইয়াছে যাহা আমাদের মধ্যে এক হিমানীশীতল শিহরণ জাগাইয়া তুলে। 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে সুদূর অতীতের বাসনাতপ্ত জীবনতৃষাকে এমন এক দীর্ঘশ্বাসবাহী রহস্যরূপ দান করা হইয়াছে যাহাতে স্টেশনের ওয়েটিং রুমের

অতিপ্রাকৃত রসের গল্প

অতিবাস্তব প্রতিবেশ ও অবাস্তব বায়ব পরিমণ্ডল একাকার হইয়া গিয়াছে। নাটকীয় সমাপ্তিপূর্ণ শিল্পরসসমৃদ্ধ বর্ণাঢ্য এই গল্পটির তুলনা বিশ্বসাহিত্যেও আছে কি না সন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছোটগল্পের অজস্র সম্পদে বাংলা সাহিত্যকে অপূর্ব সমৃদ্ধি দান করিয়াছেন। তাঁহার ছোটগল্পগুলি "প্রস্তাবনা, উপস্থাপনা, পরিণতি ও উপসংহার কলাকৌশলের দিক দিয়াও যেমন, বিষয় ও রসস্ফুরণের দিক দিয়াও সেইরূপ বিচিত্র। এই রচনারীতির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে যে-নূতন ধারা প্রবর্তন করিলেন, তাহার অনুশীলন সম্প্রসারণের দ্বারাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যিক রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরাধিকারিরূপে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভা এই ছোটগল্পের ক্ষেত্রেই বাংলা সাহিত্যে এখনও সজীব আছে ও প্রতিভার স্বধর্ম-অনুযায়ী নব নব প্রকাশের প্রেরণা যোগাইয়াছে (শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।"

রবীন্দ্র-ছোটগল্পের মূল্যায়ণ

৯। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।

উত্তর। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকেই বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী বলিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই গদ্যেই অধিকতর কলানৈপুণ্যের সৃষ্টি করিলেন। রবীন্দ্রনাথে আসিয়া বঙ্কিমী গদ্য পরম ঐশ্বর্যবান হইয়া উঠিল। তাঁহার উপন্যাস ও ছোটগল্পের গদ্যের কথা বাদ দিলেও প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসর ধরিয়া তিনি যে-সকল প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন উহাদের সংখ্যা যেমন প্রচুর, পরিধিও সুবিস্তৃত। ধর্ম, শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ ইতিহাস, বিজ্ঞান—কোন্ বিষয়ে না তিনি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন? তাঁহার ঐ বিপুল প্রবন্ধ-সাহিত্য একদিকে যেমন কাব্যশ্রীমণ্ডিত, অপরদিকে ঐগুলি তেমনি রবীন্দ্রনাথের গভীর মননশীলতা এবং স্থির প্রজ্ঞারও স্বাক্ষরবাহী। বাংলা গদ্যের রীতি-প্রকৃতিকে তিনি যে কত দিক দিয়া প্রকাশকলানৈপুণ্যে লাবণ্যপূর্ণ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। "রবীন্দ্র-প্রবন্ধাবলীর এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, ঐগুলিতে লেখকের চিন্তাশক্তির পরিধি কত বিস্তৃত, কত উচ্চ, তাহা বহুভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। কবি বলিয়া তিনি-যে কেবল আকাশমার্গেই বিহার করিতেন তাহা

রবীন্দ্র-প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য ও ব্যাপকতা

নহে, দেশের সঙ্গে, দেশবাসীর সঙ্গে তাঁহার নাড়ীর নিবিড়তম যোগ ছিল। দেশের যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু বরণীয়, তাহার প্রতি যেমন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনি যেখানে দেশের দীনতা ও হীনতা, সেখানে তাঁহার তিরস্কারের তীক্ষ্ণবাণ বর্ষিত হইয়াছে। প্রসঙ্গত ইহাও লক্ষণীয় যে, দেশের অভাবকে, শূন্যতাকে, প্রগতির বিঘ্নস্বরূপ জীর্ণ কুসংস্কারকে তিনি যে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহার অন্তরালে রহিয়াছে দেশবাসীর প্রতি তাঁহার গভীর প্রীতি। এই কারণেই তিনি কেবল দোষটুকু দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, উহার কারণও সহৃদয়তার সহিত বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-রচনায় লেখকের মননশীলতা, সহৃদয়তা, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও নিবিড় দেশপ্রীতির সঙ্গে মিলিত হইয়াছে সূক্ষ্মতম সৌন্দর্যবোধ ও উচ্চতম প্রকাশমহিমা।”

প্রবন্ধের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলীকে আমরা বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া লইতে পারি। সেই হিসাবে ‘প্রাচীন সাহিত্য’ (১৯০৭), ‘সাহিত্য’ (১৯০৭) ‘আধুনিক সাহিত্য’ (১৯০৭), ‘লোকসাহিত্য’ (১৯০৭,) ‘শব্দতত্ত্ব’, (১৯০৯), ‘সাহিত্যের পথে’ (১৯৩৬), ‘ছন্দ’ (১৯৩৬), ‘বাংলাভাষা পরিচয়’ (১৯৩৮), এবং ‘সাহিত্যের স্বরূপ’ (১৯৪৩) প্রভৃতি সমালোচনা, সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য-প্রসঙ্গ বিষয়ক প্রবন্ধ-গ্রন্থ। ‘আত্মশক্তি’ (১৯০৫), ‘ভারতবর্ষ’ (১৯০৬), ‘শিক্ষা’ (১৯০৮), ‘রাজাপ্রজা’ (১৯০৮), ‘সমাজ’ (১৯০৮) ‘পরিচয়’ (১৯১৬), ‘কালান্তর’ (১৯৩৭), ‘সভ্যতার সংকট, (১৯৪১) প্রভৃতি শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি বিষয়ক প্রবন্ধ-গ্রন্থ। ‘ধর্ম’ (১৯০৯), ‘শান্তিনিকেতন’ (১৯০৯-১৯১৬), ‘মানুষের ধর্ম’ (১৯৩৩) প্রভৃতি ধর্ম, দর্শন ও অধ্যাত্মবিষয়ক প্রবন্ধ-গ্রন্থ। ‘য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র’ (১৮৮১), ‘য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরি’ (১৮৯১-১৮৯৩), ‘জাপানযাত্রী’ (১৯১৯), ‘যাত্রী’ (১৯২৯), ‘রাশিয়ার চিঠি’ (১৯৩১), ‘জাপানে-পারস্যে’ (১৯৩৬), ‘পথের সঞ্চয়’ (১৯৩৯) প্রভৃতি ভ্রমণকথাবিষয়ক প্রবন্ধ-গ্রন্থ। ‘ছিন্নপত্র’ (১৯৬২), ‘ভানুসিংহের পত্রাবলী’ (১৯৩০), ‘পথ ও পথের প্রান্তে’, ‘পত্রধারা’ (১৯৩৮), ‘চিঠিপত্র’ (সাত খণ্ড) প্রভৃতি পত্রসাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ। ‘জীবনস্মৃতি’ (১৯১২), ‘চারিত্র-পূজা’, ‘বিদ্যাসাগরচরিত’, ‘ছেলেবেলা’ (১৯৪০) প্রভৃতি আত্মকথা ও জীবনকথা বিষয়ক গ্রন্থ। ‘পঞ্চভূত’ (১৮৯৭), ‘বিচিত্র প্রবন্ধ’ (১৯০৭,) ‘লিপিকা’ প্রভৃতি আবেগধর্মী প্রবন্ধের গ্রন্থ।

'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে,' 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রভৃতি গ্রন্থে সাহিত্যতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাঁহার শিল্পতত্ত্ব সৌন্দর্যানুভূতি ও আনন্দ-উপলব্ধি-ভিত্তিক। সাহিত্যের বহিরঙ্গ রূপকে স্বীকার করিয়াও তিনি উহাকে 'অকারণের আনন্দ' বলিয়াছেন। শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "তিনিই (রবীন্দ্রনাথ) বোধ হয় শেষ সমালোচক, যিনি বস্তুজগতের সর্বগ্রাসী অভিভবের অব্যবহিত পূর্বে, আদর্শ কল্পনা ও আনন্দানুভূতি হইতে জাত কাব্যসৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করিয়াছেন।" 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য' ও 'লোকসাহিত্য সমালোচনামূলক গ্রন্থ। এই প্রবন্ধগুলি কেবল অধীত সাহিত্যের বিশ্লেষণ মাত্রই নহে, উহারা অধীত সাহিত্যের নবায়ন—creation within creation. কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, কাদম্বরী প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্য যে দেহকেন্দ্রিক সৌন্দর্যভোগের উর্ধ্বে সংযম ও তপস্যাপূত কল্যাণধর্মকেই মহত্তর করিয়া দেখাইয়াছে, 'প্রাচীন সাহিত্য' সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন জীবনদর্শনের এই চেতনাটিকেই কাব্যশ্রীপূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন। ঐ গ্রন্থের 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে তিনি রামায়ণের উর্মিলা, কাদম্বরীর পত্রলেখা ও অভিজ্ঞান-শকুন্তলার অনসূয়া-প্রিয়ংবদা চরিত্রের উপর যে নতুন আলোকপাত করিয়াছেন তাহাতে রবীন্দ্রমানসের সহৃদয়তা ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতাই প্রকাশমান। 'লোক-সাহিত্য'-এর আলোচনাতেও রবীন্দ্রনাথ উহার মর্মমূলে প্রবেশ করিয়া প্রতিভার স্বর্ণকুঞ্চিকা দ্বারা এমন একটি গুপ্ত ভাণ্ডারের কক্ষদ্বার খুলিয়া দিয়াছেন যাহার অনাদৃত ঐশ্বর্যের দিকে চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। ঐ গ্রন্থের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' একটি অপূর্বসুন্দর রচনা। 'আধুনিক সাহিত্য'-এ বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল প্রভৃতি আধুনিক যুগের সাহিত্যরথীদের যে-মূল্যায়ণ তিনি করিয়াছেন তাহা রবীন্দ্রনাথের গভীর অন্তর্দৃষ্টিরই পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথ যে বাংলা কাব্যের ধ্বনি এবং বাংলা ভাষার শব্দাবলী সম্বন্ধে কত গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন, 'ছন্দ' ও 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থদ্বয় উহার বিশিষ্ট প্রমাণ। রবীন্দ্র-প্রতিভায় নীরস বিষয়ও এখানে সরস হইয়া উঠিয়াছে।

সমালোচনা, সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যপ্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষ বর্ষণ করিয়াছেন। প্রকৃতির সাযুজ্যে মানবমনের

সর্বতোমুখী বিকাশকেই তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় প্রবন্ধে 'জাতীয় মনের সাধারণ অসন্তোষকেই তাঁহার নিজস্ব কবিত্বপূর্ণ ভাষায় ও পূর্ণতা-কামী কবি-মনের গূঢ় অতৃপ্তিবোধের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন; সমস্যার রূপ যতটা পরিস্ফুট করিয়াছেন, সে পরিমাণে সমাধানের ইঙ্গিত দেন নাই।' তাঁহার সমাজবিষয়ক প্রবন্ধাবলী ভারতীয় সমাজের মর্ম-বাণীরই মার্জিত ও বিস্তৃত রূপায়ণ। তাঁহার কবিমানসে বিশ্ববোধের যে-উপলব্ধি ছিল, রাজনীতিবিষয়ক প্রবন্ধাবলীতে উহাই আন্তর্জাতিকতা-বোধে পরিণত হইয়াছে। উগ্র জাতীয়তাবাদকে তিনি জাতি ও বিশ্বের অভিশাপ বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন এবং সাম্রাজ্যবাদের বর্বর লোভ ও হিংস্রতাকে তীব্র ধিক্কার হানিয়াছেন। অথচ ঐ প্রবন্ধগুলি প্রচারসাহিত্য হয় নাই, রসসাহিত্যই হইয়াছে,—এইখানেই রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য।

শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। তাঁহার ধর্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলীতে ঔপনিষদিক ধর্মের ব্যাখ্যা থাকিলেও, বৃহত্তর মানবধর্মের ও সত্যধর্মের মিশ্রণে রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ এক উদারতার মহিমায় ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার দার্শনিকতা ও অধ্যাত্মবোধের মধ্যে 'উপনিষদের আনন্দবাদ, হিন্দুপুরাণের লীলাবাদ এবং বৈষ্ণব ও বাউলের প্রেমতত্ত্ব' আশ্চর্য সমন্বয় লাভ করিয়াছে। চৌদ্দ খণ্ডে সংকলিত 'শান্তিনিকেতন'-এ আচার্যরূপে তাঁহার প্রদত্ত ভাষণগুলি তাঁহার বিপুলপ্রসারী চিন্তাধারা ও আত্মোপলব্ধির পরিচয় বহন করিতেছে। "ঐশ স্পর্শলাভের জন্য লেখকের আবেগময় আকৃতি, লৌকিক উৎসব-অনুষ্ঠানের পিছনকার মূল ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও কাব্যসৌন্দর্যময় প্রকাশ-রীতি ইহাদিগকে একাধারে সাহিত্যরসিক ও ধর্মপিপাসু উভয় শ্রেণীর পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছে।"

ধর্ম, দর্শন ও অধ্যাত্মবিষয়ক প্রবন্ধাবলী

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণকথাবিষয়ক প্রবন্ধাবলী বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি স্তরভেদ লক্ষ্য করা যায়। 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরি'তে আছে তথ্যপ্রাধান্য। পরবর্তী ভ্রমণকথাগুলিতে বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে ভ্রমণরত দেশের জাতীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটনেরও প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'রাশিয়ার চিঠি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভ্রমণকথা

এই গ্রন্থে বিপ্লবের রক্তস্নাত নব্য রাশিয়ার সংগঠনমূলক অত্যাশ্চর্য কর্মকাণ্ড এবং সর্বপ্রকার অসাম্য দূর করিবার নির্ভীক প্রয়াসের কথাই সপ্রশংস বিস্ময়ে উল্লিখিত হইয়াছে। 'রাশিয়ার চিঠিতে আমরা লেখকের কবিসুলভ অন্তর্দৃষ্টির পরিবর্তে পাই অপক্ষপাত সংস্কারমুক্ত ন্যায়বোধ।'

পত্রসাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যের বিপুলতাও বিস্ময়কর। তবে তাঁহার পত্রসাহিত্যে ব্যক্তিজীবনের লৌকিক দিকটি বহুলাংশেই অনুপস্থিত। যে ঘরোয়া পরিবেশের অন্তরঙ্গতার সহজ সুর পত্রসাহিত্যের আদর্শ, তাহার চেয়ে কাব্যিক অনুভাবনাই ঐগুলিতে প্রবলতর। উহা কোথাও কল্পনাসৌন্দর্যে ভরপুর, কোথাও নানাবিধ তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে নিযুক্ত। কয়েকটি চিঠির নির্বাচিত অংশের গ্রন্থনে 'ছিন্নপত্র' নামক যে সংকলনটি রচিত উহাতেও রোমান্টিক কবিচেতনাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রসঙ্গত শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য উল্লেখ্য। তিনি বলিয়াছেন, "দুইটি ছোট মেয়েকে লেখা 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' এবং ছাপার উদ্দেশ্যে লেখা নয় এমন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের নিকট লেখা পত্রসমূহই হয়তো তাঁহার ঘরোয়া রূপটি আরও স্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তোলে।...তাঁহার ব্যক্তিজীবন কাব্যজীবনের দিব্যজ্যোতিতে এতটা আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, ঘরোয়া কথা অপেক্ষা কাব্যরহস্যমূলক অসীমতত্ত্বজিজ্ঞাসাই তাঁহার জীবনের সত্যকার পরিচয় বহন করে।"

জীবন ও আত্মকথা

তাঁহার জীবনকথাবিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে 'চারিত্রপূজা' ও 'বিদ্যাসাগরচরিত' উল্লেখ্য। শেষোক্ত গ্রন্থটিতে লেখকের অন্তর্দৃষ্টি বিদ্যাসাগর-চরিত্রের উপর নূতন আলোকপাত করিয়াছে। আত্মকথাবিষয়ক 'জীবন-স্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা'য় বাহিরের ঘটনার স্থান ততটুকুই হইয়াছে যতটুকু কবির প্রথম কাব্যজীবন ও অন্তর্লোকের রহস্য বুঝিবার পক্ষে অনুকূল। ইহাদিগকে ঠিক ব্যক্তিগত বাস্তব জীবনকাহিনী বলা চলে না।

আবেগধর্মী প্রবন্ধ

'পঞ্চভূত', 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ও 'লিপিকা' আবেগধর্মী প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত। 'পঞ্চভূত'-এ পাঁচটি 'ভূত'-এর উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া এবং তাহাদের সঙ্গে কাল্পনিক বিতর্কসভায় যোগদান করিয়া প্রচুর কৌতুকরসের মাধ্যমে কবি নানা বিষয়ে তাঁহার উপলব্ধ অনুভূতিকে যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সাহিত্যরস পরম আস্বাদ্য হইয়া

উঠিয়াছে। 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর 'নববর্ষা', 'কেকাধ্বনি', 'শ্রাবণসন্ধ্যা', 'পাগল' প্রভৃতি কবিমানসরাগরঞ্জিত প্রবন্ধে "যুক্তিবাদ ও তথ্যালোচনার পরিবর্তে কবির একটি বিশেষ ভাবানুভূতি, ধ্যান-দৃষ্টির একটি অতর্কিত উৎক্ষেপ, স্বপ্নাতুর কল্পনার একটি বর্ণাঢ্য চিত্রকল্প অপরূপ কাব্যসৌন্দর্যের মাধ্যমে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।" এই প্রবন্ধগুলিতে বিষয় গৌণ, বলিবার ভঙ্গিটাই মুখ্য। এক কথায়, গদ্য তাহার স্বভাবধর্মকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া কাব্যিক অনুরঞ্জনে সামান্যকে যে অসামান্য করিয়া তুলিতে পারে, এই প্রবন্ধগুলিতে উহার কালজয়ী স্বাক্ষর বর্তমান। চেনা জগৎকে অচেনার রহস্যে মণ্ডিত করিয়া 'লিপিকা'র প্রবন্ধসমূহ রচিত। ইহার গদ্যভঙ্গি উচ্ছ্বসিত কল্পনালীলায় কবিতার সীমান্ত স্পর্শ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার প্রথম সূচনা 'লিপিকা'তেই হয়।

প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় কবি রবীন্দ্রনাথের পরিচয় অপেক্ষা বিন্দুমাত্র ন্যূন নহে। এক্ষেত্রেও বাংলা সাহিত্যে তিনি ভাস্বর ভাস্করের মতো একক মহিমায় বিরাজমান। কবিতার ক্ষেত্রে যেমন, গদ্যের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন চির আনন্দবাদী ও আশাবাদী। জীবনপ্রান্তে আসিয়া আশি বৎসর বয়সেও 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর এক দিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতীকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ বলে মনে করি।" অপরাজেয় মানুষের কথাই রবীন্দ্রনাথের সকল রচনায় বার বার ধ্বনিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ মানবতার মহত্তম শিল্পী।

উপসংহার

প্রশ্নাবলী

১। রবীন্দ্র-সমালোচনার সূক্ষ্মদর্শিতা ও উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ। (65 B.A.)

২। বাংলা ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে আলোচনা কর। (64 B.A.)

৩। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া একটি নিবন্ধ রচনা কর। (64 alt. B.A.)

৪। বাংলা নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান সম্বন্ধে একটি অনতিদীর্ঘ নিবন্ধ রচনা কর। (65 M. A.)

৫। রবীন্দ্রকাব্যধারার আবির্ভাবের সহিত উনবিংশ শতকের বাংলা গীতিকবিতাধারার যোগাযোগ নির্ণয় করিতে চেষ্টা কর। (64 M.A.)

৬। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের তুলনামূলক বিচার কর। (63 M.A.)

৭। রবীন্দ্রপ্রতিভার স্পর্শে বাংলা নাট্যসাহিত্যের যে বিকাশ ঘটিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (63 M.A.)

৮। রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাঙ্কেতিক নাট্যগুলির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল্যায়ণ কর।

৯। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিষয়বৈচিত্র্য ও রসোৎকর্ষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (66 B.A.)

১০। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দানের পরিমাণ ও গুণগত মূল্য নিরূপণ কর।

১১। "বাংলা সমালোচনা সাহিত্য রবীন্দ্র-প্রতিভার আলোকে সমুজ্জ্বল।" —উক্তিটি উপযুক্ত তথ্য সহ আলোচনা কর।

১২। টীকা লেখ :—

ভানুসিংহের পদাবলী (63, 64 Hons. 66 U.U.), চতুরঙ্গ (62 B.A.), তাসের দেশ (66 M.A.), প্রজাপতির নিবন্ধ (65 M.A.), প্রায়শ্চিত্ত (64 M.A.), ডাকঘর (67 U.U.), আকাশ-প্রদীপ, শ্যামলী, চোখের বালি, কালান্তর, অচলায়তন, উপন্যাস, মুক্তধারা, লিপিকা।